জগদীশচন্দ্র বসু

( বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে রক্ষিত ব্রোঞ্জ মূর্তি )

# আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

(প্রথম খণ্ড)

শ্রীমনোজ রায়

ও

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

বসু বিজ্ঞান মন্দির

কলিকাতা-৯

প্রকাশক : আচার্য জগদীশচন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী প্রকাশনী সংস্থা
৯৩।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনা :

বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষা এবং গবেষণা উন্নয়ন।
উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকুল্যে
এই পুস্তকের সুলভ মূল্য ধার্য করা সম্ভব হইল।

মুদ্রাকর : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯

# প্রকাশনী-সংস্থার নিবেদন

১৯৫৮ সালের নভেম্বরের শেষভাগে আচার্য জগদীশচন্দ্রের জন্ম-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সময় আচার্য জন্ম-শতবার্ষিকী সমিতি বাংলা ভাষায় জগদীশচন্দ্রের একখানি প্রামাণ্য জীবনী-গ্রন্থ প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তদনুযায়ী প্রকাশনী-সংস্থা নামে একটি উপসমিতি গঠিত হয় এবং তাঁহারা শ্রীমনোজ রায়কে উক্ত জীবনী-গ্রন্থের প্রথম ভাগ রচনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। ১৯৬০ সালের মাঝামাঝি শ্রীযুক্ত রায় গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি প্রকাশনী-সংস্থার নিকট প্রেরণ করিয়া বিদেশে চলিয়া যান। প্রকাশনী-সংস্থা তখন পাণ্ডুলিপিখানিতে তথ্যাদি যথাযথভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে কিনা, তাহা বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য কয়েকজন বিশেষজ্ঞ সদস্যের উপর দায়িত্বভার অর্পণ করেন। তাঁহারা পাণ্ডুলিপিতে কিছু কিছু অসঙ্গতি রহিয়া গিয়াছে দেখিতে পান এবং ঐ সকল সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। পরে প্রকাশনী-সংস্থা পাণ্ডুলিপিখানির চূড়ান্ত সংশোধন ও মুদ্রণ কার্যাদির ব্যবস্থার দায়িত্ব শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের উপর ন্যস্ত করেন। গোপালবাবু কর্তৃক যথাসম্ভব সংশোধন, পরিবর্তন ও সংযোজনের পর মুদ্রণের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসকে পাণ্ডুলিপি দেওয়া হয়। ইহার পরেও নানাবিধ অসুবিধার মধ্য দিয়া গ্রন্থখানি মুদ্রণের কাজ চলে এবং সে জন্য প্রকাশে বহু বিলম্ব ঘটে। এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্য আমরা গ্রাহক ও সাধারণ পাঠকবর্গের নিকট আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছি।

পুস্তকখানি প্রকাশের ব্যাপারে সর্ববিষয়ে উপদেশ ও পরামর্শ দিয়া ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত এই পুস্তক প্রকাশ করা সম্ভব হইত না। এই জন্য প্রকাশনী-সংস্থা তাঁহার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

পুস্তকখানির নির্ঘণ্ট ইত্যাদি প্রণয়নে শ্রীপ্রফুল্লকুমার চক্রবর্তীর সহায়তার জন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

নিবেদক

আচার্য জগদীশচন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী
প্রকাশনী-সংস্থা

বসু-বিজ্ঞান-মন্দির
কলিকাতা-৯
জুলাই, ১৯৬৩.

# ভূমিকা

আচার্য জগদীশচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত নানা পর্যায়ের ও বিভিন্ন রূপের ঘটনায় সমৃদ্ধ। তাঁহার প্রতিভা বহুমুখী ছিল এবং সেই কারণে তাঁহার জীবন বিভিন্ন বর্ণের আলোকে দীর্ঘকাল ধরিয়া উদ্ভাসিত ছিল। এহেন জীবনের পূর্ণ বিবরণ দেওয়া সহজসাধ্য নয়, কেন না একদিকে যেমন তাহা অবিশ্রাম বিদ্যার্জন, বিজ্ঞান অনুশীলন এবং পাশ্চাত্য প্রথানুযায়ী অতি সূক্ষ্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণায় সজাগ ও সচঞ্চল ছিল, অন্যদিকে তাহা ছিল অশেষ বাধাবিঘ্ন ও সংঘাতে কণ্টকিত। বিজ্ঞান-জগতে তিনি ছিলেন একজন পথিকৃৎ এবং সেই পথে চলিবার কালে তাঁহাকে প্রতিপদে নিত্য নূতন বিরোধ ও প্রতিকূল অবস্থাকে অতিক্রম করিতে হইয়াছে। উপরন্তু ছিল বিদেশী সভ্যতার দর্পে যাঁহারা পরাধীন ভারতীয় মাত্রকেই অজ্ঞ ও অসমর্থ বলিয়া বিচার করিতেন, সেই “রাজার জাতের” অধিকারীবর্গের নিকট নিজের আত্মমর্যাদা অটুট রাখিয়া এই অজানা বিজ্ঞান-জগৎ পরিক্রমার পাথেয় সংগ্রহের প্রয়াস ও পরিশ্রম। যে অসীম ধৈর্য, অদম্য অধ্যবসায় এবং অনন্যসাধারণ মনীষার প্রভাবে তাঁহার এই বিজ্ঞান-রাজ্যে অভিযান সফলকাম হইয়াছিল, তাহারও পরিচয় দেওয়া সহজ নয়।

এই বাস্তব সম্পর্কিত কর্মস্রোতের বাহিরেও আচার্য জগদীশচন্দ্রের জীবনের অন্য একদিক ছিল, যাহার জ্যোতির্ময় প্রকাশ সাধারণ জনে কালে-ভদ্রে ক্ষণিকের জন্য পাইত। তাঁহার অতি অল্প সংখ্যক অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ সেই উজ্জ্বল জ্যোতির স্ফুরণ যেভাবে দেখিয়াছেন, তাহার পরিচয় আছে তাঁহার ও তাঁহাদের লিখিত পত্রাবলীর মধ্যে।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আচার্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার ও গবেষণার মূল্য এবং পরিসর নিরূপণ ও প্রদর্শন সাধারণ জীবনবৃত্তান্তের মধ্যে দেওয়া

সুকঠিন। তাঁহার সেই বিজ্ঞানময় কর্মজীবনের বিবরণের এই অংশ সাধারণের পক্ষে সহজবোধ্যও নয়। এই কারণে আচার্যদেবের জীবনী দুই খণ্ডে প্রকাশ করা হইতেছে।

এই পুস্তকটিতে তাঁহার জীবনের প্রধান ঘটনাবলী সময়ের গতি অনুযায়ী সাজাইয়া পাঠকের সম্মুখে রাখা হইয়াছে। লেখকেরা চেষ্টা করিয়াছেন, যাহাতে আচার্যদেবের জীবন এই ধারাবাহিক ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং তাহার আংশিক বিচার ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে চিত্রিত হয়। বলা বাহুল্য, যে সুদীর্ঘ জীবনের মূল সূত্র ছিল "সময় অল্প, কাজ অশেষ" এবং কর্মপদ্ধতি ছিল যুদ্ধযাত্রার মত বিরাম-বিশ্রাম-হীন ও অফুরন্ত ঘটনাসঙ্কুল, সেই জীবনের পূর্ণ আলেখ্য সম্যকভাবে ফুটাইয়া তোলা দুঃসাধ্য ব্যাপার। অন্যদিকে লেখকেরা তাহার বিবরণ নির্ভুল করিতে চেষ্টিত ও সক্ষম হইয়াছেন।

এতদিন আচার্য জগদীশচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্তের বিভিন্ন অধ্যায় পৃথক পৃথকভাবে নানা জায়গায় ছড়ানো ভাবে বিবৃত ছিল। সে সকল খুঁজিয়া বাহির করিতে এবং এক ক্রমবিকশিত জীবনীসূত্রের ধারায় গাঁথিতে লেখকদের অনেক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। সেই চেষ্টার ফলে পুস্তকখানিতে এই অত্যাশ্চর্য জীবনের পূর্ণ বৃত্তান্ত সংক্ষেপে দেওয়া হইয়াছে। লেখকদের তথ্য নির্ণয়ের প্রয়াস এবং সেই তথ্যকে নির্ভুল ও প্রামাণ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার যত্ন প্রশংসনীয়।

এই ক্ষণজন্মা কৃতী পুরুষের যে দেশাত্মবোধ ছিল, ভারতীয়তা ও প্রাচীন পিতৃগণের আদর্শবাদের জন্য যে আত্মশ্লাঘা ছিল, তাহারও পরিচয় দিতে লেখকেরা চেষ্টিত হইয়াছেন এবং সেই সঙ্গে আচার্য জগদীশচন্দ্রের রূপ-রস জ্ঞানের বিষয়ও তাঁহারা লিখিয়াছেন এবং তাঁহার জীবনের নানা দিক দেখাইয়া এই আলেখ্যের চিত্রণ পূর্ণ করিবার জন্য যত্নের ক্রটি করেন নাই।

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

# সূচীপত্র

## প্রথম অধ্যায়



## দ্বিতীয় অধ্যায়



## তৃতীয় অধ্যায়

## চতুর্থ অধ্যায়



## পঞ্চম অধ্যায়



## ষষ্ঠ অধ্যায়



## সপ্তম অধ্যায়

## অষ্টম অধ্যায়



## নবম অধ্যায়



## দশম অধ্যায়

## একাদশ অধ্যায়



## দ্বাদশ অধ্যায়

## ত্রয়োদশ অধ্যায়



## চতুর্দশ অধ্যায়

## পঞ্চদশ অধ্যায়



## ষোড়শ অধ্যায়



## সপ্তদশ অধ্যায়

## চিত্রসূচী

সপরিবারে জগদীশচন্দ্র (১৮৯৩)

বাম দিক থেকে ডান দিকে—

দণ্ডায়মান—১। সুধাংশুমোহন বসু, ২। জগদীশচন্দ্র বসু, ৩। লাবণ্যপ্রভা সরকার, ৪। চারুপ্রভা বসু, ৫। হেমপ্রভা বসু, ৬। অবলা বসু (কোলে ৬-এ অরবিন্দ), ৭। সুবর্ণপ্রভা বসু।

চেয়ারে উপবিষ্ট—৮। মোহিনীমোহন বসু, ৯। নলিনী নাগ, ১০। আনন্দমোহন বসু, (কোলে ১০-এ সুলেখা বসু), ১১। স্বর্ণপ্রভা বসু, ১২। সরযূবালা বসু।

ভূমিতে উপবিষ্ট—১৩। দেবেন্দ্রমোহন বসু, ১৪। অজিতমোহন বসু, ১৫। সরোজমোহন বসু, ১৬। সুরেশমোহন বসু, ১৭। হিমাংশুমোহন বসু, ১৮। অশোকমোহন বসু, ১৯। ইন্দুলেখা দত্ত।

পরিচিতি—৩, ৪, ৫, ৭, ১১—জগদীশচন্দ্রের ভগ্নিগণ।

১, ৬-এ, ১৫, ১৭, ১৮ ও ৯, ১০-এ, ১২, ১৯ } আনন্দমোহন ও স্বর্ণপ্রভার পুত্র ও কন্যা।

১৩, ১৪, ১৬—মোহিনীমোহন ও সুবর্ণপ্রভার পুত্র।

### প্রথম অধ্যায়

# পিতৃপরিচয়

সিপাহী-বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে ভারতের যে প্রথম গণজাগরণ, তার উন্মাদনা স্তিমিত হয়ে এসেছে। মহারাণী ভিক্টোরিয়া ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে এই উপমহাদেশের শাসনভার গ্রহণ করেছেন ; লর্ড ক্যানিং তাঁর প্রতিনিধি। ভারতবর্ষের এই রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের অব্যবহিত পরে বাংলাদেশে এক ঋষিকল্প বিজ্ঞানীর আবির্ভাব হয়। তখন বাংলাদেশের মনীষিবৃন্দের নেতৃত্বে ভারতবর্ষে সর্বতোমুখী নবজাগৃতির সূচনা দেখা দিয়েছে। সেই ব্রতসাধনের অন্যতম ঋত্বিক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু।

প্রাচীন ভারতবর্ষীয়গণ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যে প্রাণবন্ত সাধনা করেছিলেন, পুঁথিপত্রে তার স্বাক্ষর ছড়িয়ে আছে। দেশীয় ও ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গের অক্লান্ত গবেষণায় বহু শতাব্দী আগেকার সেই সমৃদ্ধ অধ্যায়ের উপর যথেষ্ট আলোকপাত হয়েছে। হিন্দু রাজত্বের অবসানের পর অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় ইতিহাসের যে সুদীর্ঘ অধ্যায় তা রাজনৈতিক উত্থান-পতনের কাহিনীতে মুখরিত। এই অধ্যায়ে মুষ্টিমেয় রাজন্যবর্গের আগ্রহাতিশয্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্প, সঙ্গীত ও সাহিত্যের স্বচ্ছন্দ বিকাশ সম্ভব হলেও বিজ্ঞান অনুশীলনের ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য প্রয়াস দেখা যায় নি। ভারতবর্ষে বিজ্ঞান-সাধনার ইতিহাসে যখন পূর্বের ধারা ক্ষীণ হয়ে আসে, তখন ইউরোপে নব্যবিজ্ঞানের অভ্যুদয় ঘটেছে। আচার্য জগদীশচন্দ্র ভারতবর্ষের সেই মহান ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করে এদেশে নব্য-বিজ্ঞান চর্চার উদ্‌বোধন করেন।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ নভেম্বর পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ শহরে জগদীশ-

চন্দ্রের জন্ম হয়। পিতা ভগবানচন্দ্র বসু সরকারী কর্মোপলক্ষে তখন ময়মনসিংহে বাস করতেন। পিতৃপুরুষগণের আদি বাসভূমি ছিল বিক্রমপুর পরগণার রাঢ়িখাল গ্রামে। হিন্দু রাজত্বের চরম উন্নতির সময় সমৃদ্ধিশালী জনপদ এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে সারা ভারতবর্ষে তখন বিক্রমপুরের খ্যাতি। খ্যাতনামা বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ্ দীপঙ্কর অতীশ শ্রীজ্ঞান ছিলেন বিক্রমপুরের এক রাজকুমার। বর্তমান যুগেও এখানে বহু মনীষীর জন্ম হয়েছে।

এক অভিজাত পরিবারে ভগবানচন্দ্রের জন্ম। পরিবারের আর্থিক সঙ্গতি তেমন ছিল না। তাই শৈশবে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে ভগবানচন্দ্রকে সংগ্রাম করতে হয়। স্বীয় প্রতিভা ও কর্ম-নিষ্ঠার বলে তিনি জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি ঢাকা কলেজের প্রথম যুগের কৃতী ছাত্রমণ্ডলীর অন্যতম। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ময়মনসিংহ শহরে সরকারী অর্থানুকূল্যে যখন প্রথম ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হয়, তখন কর্তৃপক্ষ ভগবানচন্দ্রকে সেখানকার প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করেন।

পুণ্যশ্লোক রাজা রামমোহন রায় প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মের প্রবল আন্দোলনে বাংলাদেশ তখন মুখর। শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় একটা অভূতপূর্ব উন্মাদনা নিয়ে সে আন্দোলনে যোগ দিচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই উত্তরজীবনে দেশনেতারূপে বরেণ্য হয়েছেন। তরুণ ভগবানচন্দ্রও ব্রাহ্মধর্মের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পূর্ববঙ্গে সমাজ-সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই নতুন মতবাদ ও আদর্শের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা অবিচল ছিল। নতুনের প্রতি একটা মোহের বশেই ভগবানচন্দ্র ব্রাহ্ম-আন্দোলনে যোগ দেন নি, তাঁর সব কিছু কর্মধারাকে সঞ্জীবিত করেছে তাঁর দেশপ্রেম, মহান জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ, আর সবার উপরে সমাজ ও মানবমুখী চিন্তাধারা। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা তাঁর মনে অন্ধ অনুকরণের মোহ সঞ্চার করে নি, বরং বৃদ্ধিই করেছিল তাঁর মানসিক শক্তিকে।

পশ্চিমী সভ্যতার যা কিছু মহৎ, পাশ্চাত্য সমাজ-জীবনে যা কিছু গতিশীল, তা তিনি নিজের প্রজ্ঞাবলে আত্মসাৎ করেছিলেন। ব্রাহ্ম-আন্দোলনের যে নতুন ভাবধারায় তিনি উদ্‌বুদ্ধ হয়ে উঠলেন, তার সঙ্গে এই প্রবল মানসিক শক্তির সমন্বয় দেশের পক্ষে কল্যাণকর হয়েছিল। শিক্ষা-বিস্তার, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প ও কারিগরি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সর্বতোমুখী গঠনমূলক কার্যে ভগবানচন্দ্রের প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না এবং এই কল্যাণব্রত সাধনের জন্যে তিনি সর্বপ্রকার সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়েছিলেন।

কর্মজীবনের প্রথম থেকেই আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে ভগবানচন্দ্রের সংস্কার ও গঠনমূলক কাজ সুরু হয়। স্থানীয় ইংরেজী স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ নিয়ে তিনি ময়মনসিংহে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে সংস্কারমূলক কার্যে নতুন উদ্দীপনা জেগে ওঠে। তাঁরই মত প্রগতিশীল ভাবধারাসম্পন্ন কয়েকজন উৎসাহী কর্মীর সহযোগিতায় ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এক সাপ্তাহিক প্রার্থনা-সভার প্রতিষ্ঠা করেন। এই সামান্য প্রার্থনা-সভাই ভবিষ্যতে একদিন সংস্কারমূলক কর্মধারার বৃহত্তর কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

কয়েক বছর পরে ভগবানচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ গ্রহণ করে ময়মনসিংহ থেকে ফরিদপুরে চলে আসেন। এই নতুন কর্মক্ষেত্রে জনকল্যাণ তাঁর জীবনের মহত্তর লক্ষ্য হয়ে ওঠে। জাতীয় সংস্কৃতি ও উৎসবের পুনরুজ্জীবনের মধ্য দিয়ে তিনি দেশের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মান উন্নত করবার চেষ্টা করেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, দেশে এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক দুর্গতি আসন্ন। কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করা এই আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা পাবার অন্যতম উপায়। জনসাধারণের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা সঞ্চার করবার জন্যে, তাদের স্বদেশীভাবে উদ্‌বুদ্ধ করবার জন্যে তিনি নানা আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করেন। এরূপ জাতীয় প্রমোদ-উৎসবের অঙ্গ ছিল যাত্রা, গ্রাম্য কবিদের গান, ক্রীড়াকৌতুক, দৈহিক শক্তি প্রদর্শনী ইত্যাদি।

সীমায়। সেদিনও তিনি অমিত উৎসাহ ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে দুর্গত জনগণের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন। অমানুষিক পরিশ্রমে তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়ে এবং তিনি সরকারী দায়িত্ব থেকে সাময়িকভাবে অবসর গ্রহণে বাধ্য হন। কিন্তু দেহ অবসন্ন হলেও মনের ক্লান্তি ছিল না। দেশের কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্যে তিনি নানাবিধ পরিকল্পনা তৈরী করতে থাকেন। এই সময় সমাজ-সংস্কারক দুর্গামোহন দাশ ও জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম নায়ক প্রখ্যাত ব্যারিস্টার আনন্দমোহন বসুর সহযোগিতায় তিনি 'ন্যাশন্যাল টি কোম্পানি' নাম দিয়ে আসামে এক চা-শিল্প গড়ে তোলবার চেষ্টা করেন। এই নতুন শিল্প সংস্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, দেশীয় যুবকগণকে চা-শিল্পে অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ দান করা। তখনকার দিনে এই শিল্প ইউরোপীয়দের এক-চেটিয়া; সুতরাং চা-শিল্প ও বাণিজ্যে এইটিই হলো প্রথম ভারতীয় উদ্যম। তখন শ্রীনাথ দত্ত নামে এক তরুণ বাঙালী সাইরেনসেস্টার কলেজ থেকে হাতেকলমে কৃষিবিদ্যায় শিক্ষালাভ করে সবেমাত্র দেশে ফিরেছেন। তাঁকে নিয়োগ করা হলো এই নতুন শিল্প-সংগঠনের কাজে। ভগবানচন্দ্র এই শিল্পসংস্থার উন্নতিকল্পে নিজের যথাসর্বস্ব বিনিয়োগ করেছিলেন; কিন্তুতাঁর জীবদ্দশায় এই পরিকল্পনা আশানুরূপ সার্থকতা লাভ করে নি। এমনি আরো অনেক শিল্প-সংগঠনের কাজে তিনি নিজের অর্থ ও সামর্থ্য নিঃশেষে ব্যয় করেছেন। জন-কল্যাণের জন্যে তাঁর এই নিঃস্বার্থ উদ্যমে তিনি প্রচুর ঋণভারে জর্জরিত হয়ে পড়েন। ভগবানচন্দ্রের বহুমুখী কর্ম-প্রয়াস সম্পর্কে জগদীশচন্দ্র স্মৃতিকথায় বলেছেন—"এক বিফল জীবনের কথা শোন—ইহা অর্ধ শতাব্দীর পূর্বের কথা। যাঁহার কথা বলিতেছি তিনি অতদিন পূর্বেও দিব্যচক্ষে দেখিয়াছিলেন যে, শিল্প, বাণিজ্য এবং কৃষির উদ্ধার না করিলে দেশের আর কোন উপায় নাই। দেশে যখন কাপড়ের কল প্রথম স্থাপিত হয় তাহার জন্য তিনি জীবনের প্রায় সমস্ত অর্জন দিয়াছিলেন। যাঁহারা প্রথম পথপ্রদর্শক হন তাঁহাদের যে গতি হয়, তাঁহার তাহাই হইয়াছিল। বিবিধ নূতন উদ্যমে তিনি

বহু ক্ষতিগ্রস্ত হন। কৃষকদের সুবিধার জন্য তাঁহারই প্রযত্নে সর্বপ্রথমে ফরিদপুরে লোন্ অফিস স্থাপিত হয়। এখানে তাঁহার সমস্ত স্বত্ব পরকে দিয়াছিলেন। এখন তাহাতে শতগুণ লাভ হইতেছে। তাঁহারই প্রযত্নে কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য ফরিদপুরে মেলা স্থাপিত হয়। তিনিই আসামে স্বদেশী চা-বাগান স্থাপন করেন। তাহাতেও তাঁহার অনেক ক্ষতি হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার অংশীদারগণ এখন বহুগুণ লাভ করিতেছেন। তিনিই প্রথমে নিজ ব্যয়ে টেক্‌নিক্যাল স্কুল স্থাপন করেন এবং তাহার পরিচালনে সর্বস্বান্ত হন।"[১]

পরিকল্পনার ধারাবাহিক ব্যর্থতা ও আর্থিক দুর্গতি ভগবানচন্দ্রের মনোবল কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি। রোগমুক্তির পর তিনি আবার সরকারী কাজে যোগ দেন। নতুন কর্মক্ষেত্র পাবনা। এখানে বছর পাঁচেক থাকবার পর তিনি অবসর গ্রহণ করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি দেশের কল্যাণ সাধনের জন্যে নিরলস কর্মধারায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে এই নিঃস্বার্থ কর্মিপুরুষের জীবনান্ত হয়। মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে একমাত্র পুত্র জগদীশচন্দ্র ইংল্যাণ্ড-প্রবাস থেকে স্বদেশে ফিরে আসেন, নব্যবিজ্ঞানে দীক্ষা নিয়ে। জীবনসংগ্রামের প্রাথমিক প্রস্তুতি-পর্ব শেষ হয়েছে। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার সামান্য আয় থেকে আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি পিতার ঋণ কড়াক্রান্তিতে পরিশোধ করেছেন। এবার মহত্তর জীবনের পথে উত্তরণ। ভগবানচন্দ্র নিজের সারা জীবনের ব্যর্থ সাধনার শেষে পূর্ণ তৃপ্তি ও সান্ত্বনা নিয়ে গেলেন—জগদীশচন্দ্রকে অনুপ্রাণিত করে গেলেন ত্যাগ ও স্বদেশসেবার আদর্শে। পিতার বলিষ্ঠ চরিত্র, কর্তব্য-নিষ্ঠা ও ব্যর্থতার মুহূর্তে অপরিসীম মানসিক স্থৈর্য, এই সব কিছু স্মৃতি জগদীশচন্দ্রের ভবিষ্যৎ কর্মধারাকে প্রতিনিয়ত উৎসাহিত করেছে। মহত্তর ব্রতসাধনের সার্থকতায় ভগবানচন্দ্রের যে জীবন প্রোজ্জ্বল হয়ে

---

১। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে বিক্রমপুর সম্মিলনীতে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ; 'অব্যক্ত' গ্রন্থের অন্তর্গত 'বোধন' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

উঠতে পারতো, তা জনস্বার্থের ক্ষুদ্রতর পরিধিতে অনেক দুঃখভোগ ও ব্যর্থতার মধ্যে নিঃশেষিত হয়। পিতার এই আপাত-ব্যর্থ জীবনের মধ্যে জগদীশচন্দ্র মহাভারতে চিত্রিত কর্ণের ব্যর্থ ও বিড়ম্বিত জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি বলতেন—"দেশবাসীর কল্যাণের জন্যে পিতৃদেব নিজেকে নিঃশেষে দান করে জীবনের শেষভাগে দেখতে পেলেন, তাঁর সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের এই ব্যর্থতা বৃহত্তর সমাজজীবনের পক্ষে শুভঙ্কর হয়েছিল। এই থেকেই সার্থকতা ও ব্যর্থতার প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়। আমি উপলব্ধি করেছি, অনেক ক্ষেত্রে জয়ের চেয়ে পরাজয়ই মহত্তর। পিতার মত আরো অসংখ্য জীবনের এমনি ক্ষয় ও ব্যর্থতার মধ্য দিয়েই মহত্তর ভারত গড়ে উঠবে।"

স্নেহময়ী মায়ের স্মৃতি, তাঁর পবিত্র জীবন, দৃঢ় সঙ্কল্প ও মধুর ব্যক্তিত্ব জগদীশচন্দ্রের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। তাঁর মা বামাসুন্দরী দেবীর জন্ম হয় রাঢ়িখালের নিকটবর্তী এক অভিজাত বংশে। এই মহিলার স্নেহধারায় জগদীশচন্দ্রের সহপাঠী, সমাজের তথাকথিত অস্পৃশ্য ছেলেরা অভিষিঞ্চিত হয়েছে। ভগবানচন্দ্রের মৃত্যুর দু-বছর পরে বামাসুন্দরী দেবী দেহত্যাগ করেন।

ভগবানচন্দ্র বসু

বামাসুন্দরী দেবী

### দ্বিতীয় অধ্যায়

# শৈশব ও শিক্ষা

জগদীশচন্দ্রের শৈশব অতিবাহিত হয় ফরিদপুরে। বিশাল, দুরন্ত পদ্মার অপর তীরে পিতৃপুরুষের আদি বাসভূমি বিক্রমপুর। সদর রাস্তার ধারে বাংলো, সঙ্গে প্রশস্ত বাগান। খানিক দূরে বয়ে চলেছে পদ্মার একটি শাখা। রাস্তার পাশে চওড়া নালা ; তার উপর এক সংকীর্ণ সেতু সদর রাস্তার সঙ্গে যুক্ত করেছে বাংলোকে। বালক জগদীশচন্দ্র সেতুর উপর দাঁড়িয়ে মুগ্ধ ও কৌতূহলী দৃষ্টিতে জলস্রোত লক্ষ্য করতেন। জীবনের প্রান্তসীমায় পৌঁছেও জগদীশচন্দ্রের মনে সে স্মৃতি স্পষ্ট ছিল। প্রাণিজীবন সম্বন্ধেও তাঁর কৌতূহল কম ছিল না। ভগবানচন্দ্র ছেলেমেয়েদের প্রকৃতির রহস্য সম্পর্কে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে বাংলোতে নানারকম পাখী ও জন্তু-জানোয়ার পুষতেন। এই অভ্যাস তাঁর পুত্রকন্যাদের মধ্যেও অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। পরবর্তী জীবনে বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হবার পর জগদীশচন্দ্র সেখানে পশু ও পক্ষিশালা তৈরী করেছিলেন। রাস্তাসংলগ্ন পুলের উপর মাছ ধরবার ফাঁদ, পোকামাকড় ও পোষা প্রাণীগুলিকে নিয়ে তিনি সারাক্ষণ মেতে থাকতেন। জল থেকে জ্যান্ত সাপ ধরে এনে জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে ভয় দেখিয়ে তিনি বেশ আনন্দ পেতেন। এসব ক্রীড়াকৌতুকে তিনি বাবার কাছ থেকে সর্বক্ষণ উৎসাহ পেয়েছেন। সাহস ও শক্তির দরকার হয়, এমন খেলাধূলাতেও তিনি পিছিয়ে ছিলেন না। জগদীশচন্দ্রের বয়স তখন পাঁচ বছর। একটা টাট্টু ঘোড়া কিনে দেওয়া হলো তাঁকে। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি একজন সুদক্ষ ঘোড়সওয়ার হয়ে ওঠেন। ঘোড়ায় চেপে বীরদর্পে তিনি যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এমনি সময় ফরিদপুরে এক ঘোড়দৌড়ের

আয়োজন করা হয়। অনেক প্রতিযোগী এল, জগদীশচন্দ্রও গেলেন ঘোড়দৌড় দেখতে তাঁর টাট্টু নিয়ে। জনৈক দর্শকের সকৌতুক প্রস্তাব—খোকা, তুমিও দৌড়োবে? বালক জগদীশচন্দ্র সে আহ্বান গম্ভীরভাবে গ্রহণ করে নিজের টাট্টু ছুটিয়ে চললেন অভিজ্ঞ ঘোড়সওয়ারদের সঙ্গে। বিপুল জনতার উচ্ছ্বসিত অভিনন্দনের মধ্যে বালক অশ্বারোহী একাকী ফিরে এলেন সকলের পশ্চাতে। শরীর ক্ষতবিক্ষত, সেদিকে দৃষ্টি নেই—মনের মধ্যে শুধু বিশ্বজয়ের আনন্দ, বাইরে তার দৃপ্ত প্রকাশ।

জেলফেরৎ এক ডাকাত-সর্দার এখন জগদীশচন্দ্রের অষ্টপ্রহরের সঙ্গী। একাগ্রচিত্তে তিনি এই সর্দারের কাছে তার বিগত জীবনের ইতিহাস শোনেন—দস্যুবৃত্তির রোমাঞ্চকর কাহিনী। রাত্রির অন্ধকারে মশাল হাতে নিয়ে ঘুমন্ত গ্রামবাসীদের উপর অতর্কিত আক্রমণ, কখনও কখনও সজাগ প্রহরীদলের সশস্ত্র বাধা—এসব কথা শুনতে শুনতে বালক জগদীশচন্দ্র তন্ময় হয়ে যেতেন, আর মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন সর্দারের দস্যুজীবনের মূক স্বাক্ষর, ক্ষতচিহ্নগুলির দিকে।

## ফরিদপুরের বাংলা স্কুলে শিক্ষাসূচনা

আত্মীয়-স্বজনের প্রীতিস্নিগ্ধ মধুর পরিবেশে শৈশবের অবাধ চপলতার দিনগুলি শেষ হয়ে এল। অল্প বয়সেই ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানো প্রচলিত রীতি। ভগবানচন্দ্র এবার বালক জগদীশচন্দ্রকে স্কুলে পাঠাবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন। ফরিদপুর শহরে তখন দুটি স্কুল—একটি সরকারী স্কুল, সেখানে ইংরেজী পড়ানো হতো। দ্বিতীয়টি সাধারণ লোকের ছেলেদের শিক্ষার জন্যে বাংলা স্কুল—ভগবানচন্দ্র তার প্রতিষ্ঠাতা। উচ্চতর শিক্ষা যাদের লক্ষ্য তারা ভর্তি হতো ইংরেজী স্কুলে। ভগবানচন্দ্রের বন্ধুবান্ধব,

এমন কি, তাঁর কাছারির আমলাদের ছেলেরাও পড়তো এই স্কুলে। কিন্তু জগদীশচন্দ্রকে ভর্তি করে দেওয়া হলো সেই বাংলা স্কুলে। এই অপ্রত্যাশিত ব্যতিক্রমে সেদিন সবাই বিস্মিত হয়েছিল। শিক্ষার ব্যাপারে ভগবানচন্দ্রের স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষণীয়। দেশের তৎকালীন অবস্থায় জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের পক্ষে ইংরেজী শিক্ষা ছিল প্রশস্ত পথ; বর্তমানেও সে অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয় নি। কিন্তু ভগবানচন্দ্র মনে করতেন—জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় সাধন ও দেশের জনমনের সঙ্গে আপন মনের সংযোগ যদি কাম্য হয়, তবে মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষার উদ্‌বোধন হওয়া উচিত। এই রকম বাংলা স্কুলে পড়বার আর একটা শুভফলের কথাও দূরদর্শী ভগবানচন্দ্র ভেবে দেখেছিলেন—এখানে সাধারণ স্তরের ছেলেদের সংস্পর্শে আসবার যে সুযোগ হয়, তাতে সমাজের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষকে অবজ্ঞা করবার মিথ্যা অভিমান মনে জাগতে পারে না। পিতার এই উদ্দেশ্য জগদীশচন্দ্রের জীবনে সার্থক হয়েছিল।

পারিবারিক জীবনের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে থেকেও বালক জগদীশচন্দ্র ধীরে ধীরে প্রকৃতিমুখী হয়ে উঠেছিলেন। বাংলা স্কুলে ভর্তি হবার পর তিনি বাইরের সমাজ-জীবনের প্রথম স্পর্শ লাভ করেন। অনুসন্ধিৎসু বালকের কোমল মনের উপর মানুষ, প্রকৃতি ও পরিবেশ সেদিন যে প্রভাব বিস্তার করেছিল, ভবিষ্যতের জগদীশচন্দ্র তারই সার্থক সৃষ্টি। এই বাংলা স্কুলে বাল্যজীবনের যে অধ্যায় অতিবাহিত হয়েছে, জগদীশচন্দ্রের মানসিক বিকাশের দিক থেকে তার একটা বিশেষ সার্থকতা আছে। নদী-নালায় মাছ ধরে জেলে, রুক্ষ মাটির বুকে সোনার ফসল ফলায় চাষী। সে সব সাধারণ মানুষের ছেলেপিলেরা ছিল জগদীশচন্দ্রের সহপাঠী। এদের কাছে তিনি উৎকর্ণ হয়ে শুনতেন বিচিত্র জীবজন্তু ও গাছপালার কথা। এদের নিবিড় সান্নিধ্যেই তিনি প্রথম দেখেছিলেন সত্যিকারের মনুষ্যত্বের

রূপ, শিখেছিলেন প্রকৃতিকে ভালবাসতে।[১] জগদীশচন্দ্র সহপাঠীদের মাঝে মাঝে বাড়ীতে ডেকে নিয়ে আসতেন। স্নেহময়ী মা বসে থাকতেন তাদের প্রতীক্ষায় এবং সব সংস্কার বিসর্জন দিয়ে তিনি সমাজের এই অবহেলিত বালকদের গ্রহণ করতেন তাঁর স্নেহসিক্ত অন্তরে।

## গ্রামীণ সংস্কৃতি ও উৎসব

ভগবানচন্দ্র ফরিদপুরে-যে মেলার প্রবর্তন করেন, তাতে লোক-শিক্ষা ও লোকরঞ্জনের নানাবিধ ব্যবস্থা থাকতো ; যেমন—কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী, গ্রাম্য সংস্কৃতির নানারকম অনুষ্ঠান ইত্যাদি। যাত্রা ও কথকতার মধ্য দিয়ে রূপায়িত মহাকাব্যের কাহিনী থেকে জগদীশচন্দ্র যে নৈতিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন, সে সম্বন্ধে তিনি পরিণত বয়সে বলেছেন—"বর্তমানকালে স্কুলকলেজের পাঠ্যসূচীর মধ্য দিয়ে নৈতিক শিক্ষাদানের নীরস চেষ্টা আশানুরূপ সার্থকতা লাভ করে নি বলে অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। আমাদের শৈশবে নীতিশিক্ষার প্রণালীটা ছিল অন্যরূপ। কথকদের মুখে রামায়ণ-মহাভারতের নানারকম কাহিনীর সরস ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ নৈতিক শিক্ষা লাভ করতো। জীবনের প্রাথমিক অধ্যায়ে আমাদের হৃদয়ানুভূতির উপর সে কথকতার আবেদন আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। তফাৎ শুধু এই যে, তখন যা নিছক ঐতিহাসিক ঘটনার ক্রমবিবরণী বলে মনে করেছিলাম,

---

১। 'স্কুলে দক্ষিণ দিকে আমার পিতার মুসলমান চাপরাশীর পুত্র এবং বামে এক ধীবর পুত্র আমার সহপাঠী ছিল। তাহাদের নিকট আমি পশুপক্ষী ও জলজন্তুর জীবনবৃত্তান্ত স্তব্ধ হইয়া শুনিতাম। সম্ভবতঃ প্রকৃতির কার্য্য অনুসন্ধানে অনুরাগ্ এই সব ঘটনা হইতেই আমার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল।...ছেলেবেলায় সখ্যতাহেতু ছোট জাতি বলিয়া যে এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর প্রাণী আছে এবং হিন্দুমুসলমানের মধ্যে যে এক সমস্যা আছে, তাহা বুঝিতে পারি নাই।"—১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে বিক্রমপুর সম্মিলনীতে সভাপতিরূপে প্রদত্ত জগদীশচন্দ্রের ভাষণ—'অব্যক্ত' গ্রন্থের অন্তর্গত 'বোধন' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

আজ তা চিরকালের সত্য হয়ে ধরা পড়েছে। পার্থিব ও অপার্থিব জগতের স্বরূপ নির্ণয়ের জন্যে মানুষের যে অন্তহীন প্রয়াস, এ-সব কাহিনী যেন তারই রূপক।"

## জীবনাদর্শের উপর পৌরাণিক উপাখ্যানের প্রভাব

এ-সব যাত্রা ও কথকতা শুনে ভারতের প্রাচীন মহাকাব্যের প্রতি জগদীশচন্দ্রের মনে গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মায়। রামায়ণের প্রধান নায়ক রামের চরিত্র অপেক্ষা পার্শ্বনায়ক লক্ষ্মণ-চরিত্র তাঁকে বেশী মুগ্ধ করেছিল। তবে এই উভয় চরিত্রেই মহত্ত্বকে যেন কিছুটা অতিরঞ্জিত করা হয়েছে, কোথাও কোন মালিন্য নেই। তাই এই সব অমর্ত্য চরিত্রের চেয়ে দোষগুণসমন্বিত মহাভারতের নায়কগণ জগদীশচন্দ্রের কল্পনাকে বেশী উজ্জীবিত করেছিল; তাঁর জীবনাদর্শ ও চরিত্রের উপর তাদের প্রভাব হয়েছিল গভীরতর। এর মধ্যে কর্ণচরিত্র তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশী মর্মস্পর্শী মনে হয়েছে। নিয়তি ও পুরুষকারের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত কর্ণের জীবন জগদীশচন্দ্রের মনে প্রতিনিয়ত প্রেরণা সঞ্চার করেছে। মহাভারতের উপাখ্যান ও তার নায়কগণের জীবনাদর্শ, বিশেষ করে কর্ণের প্রতি অনুরাগের কথা তিনি একাধিকবার ব্যক্ত করেছেন। নিজের জীবনাদর্শের উপর এ-সব পৌরাণিক নায়কদের প্রভাব সম্পর্কে তিনি বলেছেন—"বাল্যকালে মহাভারত পাঠ করিয়াই জীবনের আদর্শ উপলব্ধি করিয়াছিলাম। যে রীতিনীতি মহাভারতে প্রচারিত হইয়াছিল, সেই নীতি যেন বর্তমান কালেও জীবন্তভাবে প্রচারিত হয়। তদনুসারে যদি কেহ কোন বৃহৎ কার্যে জীবন উৎসর্গ করিতে উন্মুখ হন, তিনি যেন ফলাফল-নিরপেক্ষ হইতে পারেন। তাহা হইলে বিশ্বাস-নয়নে কোনদিন দেখিতে পাইবেন যে, বারবার পরাজিত হইয়া যে পরাঙ্মুখ হয় নাই, সেই একদিন বিজয়ী হইবে।"[১]

১। 'অব্যক্ত' (১৩২৮) পৃঃ ১৭৪।

রবীন্দ্রনাথ ১৩০৬ সালে পৌরাণিক কাহিনী-নির্ভর কতকগুলি কবিতা ও নাটক রচনা করেন। সেই নাট্য-কাব্যগুলি পাণ্ডুলিপি অবস্থায় তিনি জগদীশচন্দ্রকে পড়ে শোনান। এই প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন (২০ মে, ১৮৯৯)—"আপনার পৌরাণিক কবিতাগুলি সর্বাংশে সুন্দর হইয়াছে। এগুলি কবে সম্পূর্ণ করিবেন?...মহাভারত হইতে আরও অনেকগুলি লিখিবেন। একবার কর্ণ সম্বন্ধে লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। ভীষ্মের দেবচরিত্রে আমরা অভিভূত হই; কিন্তু কর্ণের দোষগুণমিশ্রিত অপরিপূর্ণ জীবনের সহিত আমাদের অনেকটা সহানুভূতি হয়। ঘটনাচক্রে যাহার জীবন পূর্ণ হইতে পারে নাই, যাহার জীবনে ক্ষুদ্রতা ও মহৎভাবের সংগ্রাম সর্বদা প্রজ্জ্বলিত ছিল, যে এক সময়ে মানুষ হইয়াও দেবতা হইতে পারিত এবং যাহার পরাজয় জয় অপেক্ষাও মহত্তর, তাহার দিকে মন সহজে আকৃষ্ট হয়।" বিজ্ঞানী বন্ধুর অনুরোধক্রমে রবীন্দ্রনাথ 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ' রচনা করেন। এই জাতীয় পৌরাণিক কবিতার সংকলন 'কাহিনী' গ্রন্থ ত্রিপুরাধিপতি রাধাকিশোর দেবমাণিক্যকে উৎসর্গীকৃত হয়। 'কাহিনী' কাব্যখণ্ড মুদ্রণের প্রায় শেষ মুহূর্তে 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ' রচিত হয়।

## অনুসন্ধিৎসু কিশোর

যাঁরা বাইরের হাজার কাজে ব্যাপৃত থাকেন, পুত্রকন্যাদের পড়াশুনার ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের স্বভাবতঃই নির্লিপ্ত দেখা যায়। অন্যের উপর সে দায়িত্ব দিয়েই তাঁরা পরম নিশ্চিন্ত। কিন্তু ভগবানচন্দ্র ছিলেন তার ব্যতিক্রম। সারাদিনের কর্মব্যস্ততার পর তিনি যখন ক্লান্ত হয়ে বাড়ী ফিরতেন, কৌতূহলী পুত্র তাঁকে নানা প্রশ্নে বিব্রত করে তুলতো। অসীম ধৈর্যের সঙ্গে তিনি এসব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে পুত্রের অনুসন্ধিৎসু মনকে তৃপ্ত করতেন। মাঝে মাঝে জগদীশচন্দ্রের পিতামহী কৃত্রিম রোষে বলতেন—"আমার ক্লান্ত

ছেলেকে যদি এমনি ভাবে বিরক্ত কর তবে মার খাবে।” কিন্তু নাতি সেদিকে ভ্রুক্ষেপই করতো না।

## নগর-সভ্যতার প্রথম পরিচয়—ইংরেজী শিক্ষার সূত্রপাত

ফরিদপুরে কয়েক বছর কেটে গেল। এখানকার পল্লীপ্রকৃতি, বিচিত্র মানুষ ও গ্রামীণ সংস্কৃতির নিবিড় সংস্পর্শে জগদীশচন্দ্রের যে মানসিক বিকাশ হলো, তার তুলনায় বাংলা স্কুলের পুঁথিগত শিক্ষার কোন স্বতন্ত্র মূল্য নেই। শৈশবের লীলানিকেতনের মধুর স্মৃতি আর বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঞ্চয় নিয়ে জগদীশচন্দ্র ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরিদপুর ছেড়ে আসেন বাংলার নবজাগৃতির প্রাণকেন্দ্র কলকাতায়। তাঁর বয়স তখন দশ, বাল্য আর কৈশোরের সন্ধিস্থল। অপেক্ষাকৃত শান্ত, স্তিমিত গ্রাম্য জীবন ছেড়ে এখানে এসে গতিশীল নগর-সভ্যতার সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের প্রথম পরিচয় হলো। ভগবানচন্দ্র বদ্‌লি হয়েছেন বর্ধমানে। মাতৃভাষার মাধ্যমে জগদীশচন্দ্রের প্রাথমিক শিক্ষার বুনিয়াদ তৈরী হয়েছে—এবার তাঁকে দেওয়া হবে ইংরেজী স্কুলে। সে সময় কলকাতার হেয়ার স্কুলের খুব নাম। স্থির হলো, জগদীশচন্দ্র সেখানে পড়বেন।

## সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুল ও কলেজ

হেয়ার স্কুলে মাত্র তিন মাস অতিক্রান্ত হবার পর জগদীশচন্দ্র সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে যোগ দেন। জেস্যুট পাদ্রীদের পরিচালিত এই স্কুলের তখন বেশ সুনাম। ফরিদপুরের বাংলা স্কুল থেকে এই নতুন পরিবেশে এসে জগদীশচন্দ্র প্রথমদিকে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করেছিলেন। ইংরেজী ভাষার সঙ্গে কিছুমাত্র পরিচয় নেই,• অথচ সহপাঠী ও শিক্ষকদের অধিকাংশই শ্বেতাঙ্গ। তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করা, তাছাড়া ক্লাসের পড়াশুনা অনুধাবন করবার পক্ষে ভাষার দৈন্য বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু আন্তরিক

অভিনিবেশের ফলে জগদীশচন্দ্র বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করেন এবং পড়াশুনাতেও কৃতিত্ব দেখিয়ে শিক্ষকগণের প্রশংসাভাজন হন।

সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে অধ্যয়নের প্রথম দিনেই একটা মজার ঘটনা ঘটে। জগদীশচন্দ্রের ব্যক্তিচরিত্রের দিক থেকে তার বিশেষ তাৎপর্য আছে বলেই এখানে সে কথা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। স্কুলের ছুটি হয়ে গেছে, এমন সময় নবাগত নিরীহ গ্রাম্য ছেলেটির কাছে আহ্বান এল—ক্লাসের সেরা মুষ্টিযোদ্ধার সঙ্গে তাঁকে লড়তে হবে। এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের রীতিনীতি জগদীশচন্দ্র কিছুই জানেন না। কিন্তু কোন অবস্থায়ই নিজের দৈন্যকে মাথা নীচু করে প্রকাশ করবার ছেলে যে তিনি নন, সে পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল ফরিদপুরে ঘোড়দৌড়ের মাঠে। তিনি সানন্দে সহপাঠীদের প্রস্তাবে সম্মত হলেন। এই দুঃসাহসিকতার জন্যে কিছু মূল্য দিতে হলেও প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে তিনি শেষ পর্যন্ত জাঁদরেল প্রতিদ্বন্দ্বীকে পর্যুদস্ত করেছিলেন। চরম দুর্দৈবের কাছে সহজে আত্মসমর্পণ না করবার এই যে মনোবৃত্তি, ভবিষ্যৎ জীবনে অনেকবার তার পরিচয় পাওয়া গেছে।

## মির্জাপুরের ব্রাহ্ম-ছাত্রাবাস

কলকাতার শিক্ষাজীবনে মির্জাপুর স্ট্রীটে এক ব্রাহ্ম-ছাত্রাবাসে জগদীশচন্দ্রের থাকবার ব্যবস্থা হয়। আনন্দমোহন বসুর ছোট ভাই মোহিনীমোহন বসু তাঁর দেখাশুনা করতেন। হস্টেলের অন্য সবাই বয়সে ও পড়াশুনায় অপেক্ষাকৃত প্রবীণ; সুতরাং মেলামেশাটা তেমন অবাধ ছিল না। নিঃসঙ্গ বালক উঠানের এক কোণে বাগান তৈরী করলেন এবং কয়েকটি প্রাণীও পুষতে আরম্ভ করলেন। বাগানের মধ্যে কৃত্রিম স্রোতস্বিনী, তার উপর সাঁকো—এমনি আরও অনেক কিছু ছিল। জগদীশচন্দ্র তাঁর শিশুকল্পনার এই সৃষ্টিকর্ম ও লেখাপড়া নিয়ে ব্যাপৃত থাকতেন। ছুটিতে তিনি ফিরে আসতেন

পিতার কর্মস্থলে, আত্মীয়-পরিজনের প্রীতিস্নিগ্ধ সাহচর্যের মধ্যে। এখানে তিনি সহোদরাদের নিয়ে পোষা পায়রা, খরগোস ইত্যাদির পরিচর্যা ও তাদের বাসগৃহ নির্মাণে ব্যস্ত থাকতেন।

উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত ও প্রগতিমূলক ভাবধারায় উদ্‌বুদ্ধ ছাত্রসমাজের অনেক প্রতিভূ থাকতেন মির্জাপুর স্ট্রীটের এই ছাত্রাবাসে। জীবনের নানাক্ষেত্রে তাঁরা নিজেদের কর্মকুশলতায় দেশব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এঁদের সংসর্গে তরুণ জগদীশচন্দ্রের ব্যক্তিমানস যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হয়।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ষোল বছর বয়সে জগদীশচন্দ্র সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং একটি বৃত্তি লাভ করেন। এর পর উচ্চতর শিক্ষার উদ্দেশ্যে এখানকার কলেজ-বিভাগে যোগ দেন এবং বিজ্ঞান-বিষয় অধ্যয়ন করবেন বলে স্থির করেন। সে সময় ফাদার লাফোঁ পদার্থ-বিজ্ঞানের একজন প্রখ্যাত অধ্যাপক। পরীক্ষা-সহযোগে দুরূহ বৈজ্ঞানিক তথ্যের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যার জন্যে এই প্রবীণ অধ্যাপকের ক্লাস কলেজের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল। শুধু তাই নয়, তরুণ ছাত্রগণ তাঁর বক্তৃতায় যথেষ্ট অনুপ্রেরণা লাভ করতো। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রতি জগদীশচন্দ্রের মনে যে অনুরাগ জন্মেছিল, তা ফাদার লাফোঁর অধ্যাপনা-মাধুর্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবেরই ফল। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় অধ্যাপক লাফোঁর কুশলতার কথা শুধু কলেজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি সাধারণ জনমণ্ডলীর সামনেও পরীক্ষা-সহযোগে বিজ্ঞান-বিষয়ে বক্তৃতা করতেন। মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্সের প্রথম দিকের কথা। জনসাধারণকে বিজ্ঞান-সচেতন করবার উদ্দেশ্যে সেখানে তখন যে নিয়মিত বক্তৃতার ব্যবস্থা ছিল, তাতে অধ্যাপক লাফোঁ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতেন। ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের অধ্যাপকরূপে জগদীশচন্দ্র যে সাফল্য লাভ করেছিলেন, ফাদার

লাফোঁর স্বকীয় অধ্যাপনারীতি অনুসরণের ফলেই তা সম্ভব হয়েছিল। নিজের কৃতিত্বে জগদীশচন্দ্র সহজেই এই প্রখ্যাত অধ্যাপকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

১৮৭৭ ও ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্র যথাক্রমে এফ. এ. ও বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।[১] বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব পরীক্ষায় জগদীশচন্দ্র আশানুরূপ কৃতিত্ব দেখাতে না পারলেও অধ্যাপক লাফোঁ তাঁর এই প্রিয়তম ছাত্রের মধ্যে এক সার্থক বিজ্ঞানীর পূর্বাভাস লক্ষ্য করেছিলেন।

**আরণ্য প্রকৃতির আকর্ষণ**

অধ্যাপক লাফোঁর এই প্রত্যাশা থেকে স্বভাবতঃই মনে হয়, পরীক্ষায় আশানুরূপ সাফল্যলাভ না করবার পিছনে কোন সঙ্গত কারণ ছিল। সে ইতিহাস পর্যালোচনা করবার পূর্বে জগদীশচন্দ্রের মেধা সম্পর্কে কোন রকম সংশয় প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত হবে না। প্রকৃতি ও পোষা জীবজন্তুর প্রতি শৈশবের আকর্ষণ যৌবনে খানিকটা উদ্দাম হয়ে ওঠে। তখন দুর্গম আরণ্য প্রকৃতির বুকে রোমাঞ্চকর অভিযানের জন্যে জগদীশচন্দ্রের মন চঞ্চল হয়ে উঠতো। ভগবানচন্দ্রের অধীনে এক বৃদ্ধ রাজপুত সিপাহী কাজ করতো। জগদীশচন্দ্র তার কাছে বন্দুক চালানো শিখেছিলেন। উনিশ বছর বয়সে কলেজের এক ছুটিতে তিনি তরাই অঞ্চলে গিয়েছিলেন শিকার করতে। কয়েকমাস পরেই এক জমিদার বন্ধুর কাছ থেকে আমন্ত্রণ আসে আসামে এক শিকার পর্বে যোগ দেবার জন্যে। বন্ধুটি ছিলেন একজন পাকা শিকারী। আসামের জঙ্গল থেকে কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়ে

১। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের তৎকালীন রেক্টর ফাদার ডি. ভ্যান ইস্পে'র প্রদত্ত সার্টিফিকেটে ( ১৬ জুলাই, ১৮৮০ ) বলা হয়েছে, জগদীশচন্দ্র এফ্.বি. এ. ও বি. এ যথাক্রমে ১৮৭৭ ও ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে পাশ করেন। উভয় পরীক্ষাতেই ল্যাটিন ভাষা ছিল তাঁর অন্যতম বিষয়।

জগদীশচন্দ্র কলকাতায় ফিরে আসেন। তখন কালাজ্বরের কোন প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয় নি। দীর্ঘদিন অসুখে ভুগে জগদীশচন্দ্র পড়াশুনার মধ্যে যথোপযুক্ত মনঃসংযোগ করতে পারেন নি; এই কারণেই তাঁর পরীক্ষার একটা বছর অযথা নষ্ট হয়ে যায়। এই বিষম জ্বর ইংল্যাণ্ড-যাত্রার পথে ও প্রবাসে তাঁর জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল।

তৃতীয় অধ্যায়

# লণ্ডন ও কেম্‌ব্রিজে ছাত্রজীবন

উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্যে জগদীশচন্দ্র ইংল্যাণ্ড যাত্রার সংকল্প করেন। কিন্তু সে সংকল্প সাধনের পথে নানারকম প্রতিবন্ধক দেখা দেয়। ভগবানচন্দ্র বসু তখন শারীরিক অসুস্থতার জন্যে সরকারী কাজ থেকে সাময়িকভাবে অবসর গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া দেশে শিল্প-সংগঠনের ব্যর্থ প্রচেষ্টায় তিনি নিঃস্ব ও ঋণভারে জর্জরিত। এই অবস্থায় আর্থিক দুর্গতিতে ভগ্নস্বাস্থ্য পিতাকে সাহায্য করা জগদীশচন্দ্র প্রাথমিক কর্তব্য বলে মনে করলেন। ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে শাসনবিভাগে যোগ দেওয়াই তাঁর কাছে সবচেয়ে লোভনীয় মনে হলো। কিন্তু পিতার প্রবল আপত্তি; তিনি জীবনের অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই শাসকবৃত্তি সাধারণ মানুষ আর নিজের মধ্যে একটা দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করে এবং তার ফলে জীবনের মহত্তর পরিণতির পথ রুদ্ধ হয়। জগদীশচন্দ্র তাই স্থির করলেন—ইংল্যাণ্ডের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করবেন। এই পরিকল্পনায় ভগবানচন্দ্রের পূর্ণ সমর্থন থাকলেও তা সার্থক করবার পথে একাধিক অন্তরায় দেখা দিল। প্রধান বাধা হলো, প্রবাসে ব্যয় নির্বাহ করবার মত অর্থসঙ্গতির অভাব। তাছাড়া কয়েক বছর আগে জগদীশচন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদরের মৃত্যু হয়। স্নেহময়ী মা একমাত্র পুত্রকে বিপদসঙ্কুল দূর বিদেশে ছেড়ে দিতে অনিচ্ছুক। মাতৃহৃদয়ের এই স্বাভাবিক শঙ্কা উপেক্ষা করা জগদীশচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব নয়; সুতরাং ইংল্যাণ্ড যাত্রার সংকল্প পরিত্যক্ত হলো। পরিবারের কথা ভেবে জগদীশচন্দ্র স্বদেশেই কোন অর্থকরী কাজের সন্ধান করা শ্রেয় মনে করলেন।

এমন সময় মায়ের মনোভাবের অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনে জগদীশচন্দ্রের উচ্চাশা পরিপূরণের পথ বাধামুক্ত হলো। তিনি উপলব্ধি করলেন—স্নেহবন্ধনের সঙ্কীর্ণ পরিধি থেকে মুক্তিই পুত্রের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের পথ। সেই পথকে নির্বিঘ্ন করাই তাঁর কর্তব্য। তাই তিনি তাঁর সব অলঙ্কার বিক্রয় করে প্রবাসে পুত্রের অধ্যয়নের ব্যয় নির্বাহের প্রস্তাব করলেন। কিছুদিন পরে ভগবানচন্দ্র অপেক্ষাকৃত সুস্থ হয়ে চাকরিতে যোগ দিলেন। অলঙ্কার বিক্রয় করবার আর প্রয়োজন হলো না—তা ভবিষ্যতের জন্যে সংরক্ষিত রইলো। জগদীশচন্দ্রের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন এমনিভাবে সাময়িক বাধাবিঘ্নের পর সফল হতে চললো।

## ইউরোপ যাত্রা

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্র প্রথম সমুদ্র-যাত্রা করেন। কিন্তু এই ভ্রমণ তাঁর পক্ষে বিশেষ উপভোগ্য হয় নি। আসামের শিকারপর্বে যোগ দিতে গিয়ে তিনি যে জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলেন, তার প্রকোপ তখন কিছুটা বৃদ্ধি পায়। একদিন তো তিনি জাহাজের মধ্যেই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। সহযাত্রীদের মনে সে দিন আশঙ্কা হয়েছিল যে, এই উচ্চাকাঙ্খী তরুণের ভাগ্যে বোধ হয় ইংল্যাণ্ড দেখা আর হয়ে উঠবে না। শরীরের এই অবস্থায় তিনি শেষ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডে এসে পৌঁছান এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্যে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এক হাসপাতালে ভর্তি হন। ভর্তি হবার পক্ষে প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান বিষয়ক প্রাথমিক পরীক্ষায় তিনি সহজেই উত্তীর্ণ হন। পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন তাঁর ভাল করেই পড়া ছিল। প্রাণী ও উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের পরীক্ষায়ও তিনি যথারীতি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এবার আরম্ভ হলো শারীরবিজ্ঞানের ক্লাস। শব-ব্যবচ্ছেদ কক্ষের পূতিগন্ধময় পরিবেশ জগদীশচন্দ্রের সহ্য হলো না। জ্বরের বিরামহীন আক্রমণে শরীরের অবস্থা ক্রমশঃই খারাপের দিকে চললো। শারীরবিজ্ঞানের অধ্যাপক

জগদীশচন্দ্রকে বললেন—হাসপাতালের পরিশ্রম তাঁর রুগ্ন শরীরে সইবে না। তিনি পরামর্শ দিলেন অন্য কোন বিষয় অধ্যয়ন করতে। হাসপাতালের প্রথিতযশা চিকিৎসাবিদ্ ডক্টর রিঙ্গার জগদীশচন্দ্রের উপর অনেক ওষুধপত্র প্রয়োগ করেছেন, কিন্তু তাতে কোন ফল হয় নি। তিনিও সেই একই পরামর্শ দিলেন। জগদীশচন্দ্র গভীর সমস্যায় পড়লেন। কিন্তু সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে চরম সার্থকতার পথ যে তাঁকে সন্ধান করে নিতে হবে! তাই তিনি নিরুৎসাহ না হয়ে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান অধ্যয়নের কথা ভাবতে লাগলেন। এই সময়ে তিনি প্রকৃতি-বিজ্ঞানে একটি বৃত্তিলাভ করেন, যার ফলে বিকল্প পাঠগ্রহণের আনুষঙ্গিক বাধা দূর হয়। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ক্রাইস্ট কলেজে যোগ দেন। কেম্‌ব্রিজে এসে তিনি ওষুধপত্র ছেড়ে দিয়ে একটু একটু শরীরচর্চা করতে থাকেন, ফলে স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি হয়। নতুন পরিবেশে তাঁর মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যও ফিরে আসে।

### কেম্‌ব্রিজে নব্যবিজ্ঞানে দীক্ষা

ক্রাইস্ট কলেজে অধ্যয়ন-পর্বের প্রথম দিকে বিজ্ঞানের কোন্ কোন্ শাখার প্রতি তাঁর আসক্তি বেশী, সে বিষয়ে জগদীশচন্দ্র নিশ্চিত হতে পারেন নি। তাই প্রথমে তিনি যতটা সম্ভব বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা শোনবার চেষ্টা করেছেন। এই সময় তিনি শারীরবৃত্তে মাইকেল ফস্টার, ভ্রূণবিদ্যায় ফ্র্যান্‌সিস ব্যাল্‌ফোর এবং ভূ-তত্ত্বে হিউজেস প্রমুখ খ্যাতনামা অধ্যাপকগণের বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। দ্বিতীয় বছরের মাঝামাঝি জগদীশচন্দ্র নিয়মিতভাবে পদার্থ, রসায়ন ও উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের অনুশীলন আরম্ভ করেন। রসায়ন-শাস্ত্রে লিভিং, উদ্ভিদ-বিদ্যায় ভাইন্‌স্ ও ফ্র্যান্‌সিস্ ডারউইনের অধ্যাপনা জগদীশচন্দ্রের খুব ভাল লাগতো। তবে লর্ড র‍্যালের অধ্যাপনাই তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল সবচেয়ে বেশী। প্রকৃতির রহস্য সম্বন্ধে কৌতূহলী

বালক জগদীশচন্দ্র থেকে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রে সার্থক পরিণতির ঘটনাবহুল পথে দু-জন অধ্যাপকের সান্নিধ্য ও প্রভাব উল্লেখযোগ্য—সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে ফাদার লাফোঁ ও কেম্‌ব্রিজে লর্ড র‍্যালে। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তখনো কোন কৃতিত্ব দেখাবার সুযোগ আসে নি; তবু লর্ড র‍্যালে জগদীশচন্দ্রের মধ্যে যে মহৎ সম্ভাবনার সুনিশ্চিত ইঙ্গিত দেখতে পেয়েছিলেন, সে কথা স্বীকার করতে তিনি দ্বিধা বোধ করেন নি। কেম্‌ব্রিজে তিন বছর অধ্যয়ন করবার পর জগদীশচন্দ্র প্রকৃতি-বিজ্ঞানে ট্রাইপোস পাশ করেন এবং অল্প কিছুদিন পরেই লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এস্‌-সি. ডিগ্রী লাভ করেন। কেম্‌ব্রিজের অধ্যাপকমণ্ডলী, বিশেষ করে লর্ড র‍্যালে ও ভাইন্‌সের সঙ্গে যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তার অম্লান মাধুর্যের পরিচয় পাওয়া যাবে পরবর্তী অধ্যায়ে। পদার্থ-বিজ্ঞান ও উদ্ভিদ-জীবন নিয়ে দীর্ঘদিনের নিরবচ্ছিন্ন গবেষণায় ও তার সিদ্ধান্তসমূহের স্বীকৃতির বাধা-বিঘ্নিত পথে এই দু-জন অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রকে অকৃপণভাবে সহায়তা করেন। প্রাক্তন শিষ্যের প্রতি তাঁদের সহানুভূতির জন্যেই উপেক্ষিত ভারতবর্ষের এই অখ্যাত নবীন প্রতিনিধি পৃথিবীর বিজ্ঞানী-সমাজের পুরোভাগে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন।

**স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ও কর্মসন্ধান**

অধ্যয়ন-পর্ব শেষ হয়েছে; এবার জগদীশচন্দ্র স্বদেশে ফিরে আসবেন। আত্মীয়-পরিজনকে দেখবার জন্যে মন স্বভাবতঃই ব্যাকুল। ইংল্যাণ্ড পরিত্যাগের ঠিক পূর্বমুহূর্তে অধ্যাপক ফসেটের সঙ্গে দেখা। খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ও ইংল্যাণ্ডের তৎকালীন পোস্টমাস্টার-জেনারেল ফসেট ছিলেন আনন্দমোহন বসুর অকৃত্রিম বন্ধু। পত্রালাপের মধ্য দিয়ে দু-জনের আত্মিক সম্পর্ক তখনো অক্ষুণ্ণ ছিল। সেই সূত্রে ফসেট ছিলেন নিঃসঙ্গ প্রবাসী জগদীশচন্দ্রের অন্যতম শুভানুধ্যায়ী। ফসেট তাঁর সহকর্মী ও তৎকালীন ভারতসচিব লর্ড

কিম্‌বার্লিকে জিজ্ঞাসা করলেন—ভারতবর্ষে শিক্ষাবিভাগে তরুণ জগদীশচন্দ্রকে নিয়োগ করা যাবে কি না। কিন্তু কোন উপযুক্ত শূন্যপদের সন্ধান লর্ড কিম্‌বার্লির জানা ছিল না। তাই ফসেট জগদীশচন্দ্রকে পরামর্শ দিলেন, ভারতবর্ষে ফিরে গিয়ে তদানীন্তন ভাইস্‌রয় লর্ড রিপনের সঙ্গে দেখা করতে। একখানি পরিচয়-পত্রও তিনি লিখে দিলেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্র ভারতবর্ষে ফিরে আসেন এবং অনতিবিলম্বে ফসেটের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর পরিচয়-পত্র নিয়ে সিমলায় লর্ড রিপনের সঙ্গে দেখা করেন। এই সাক্ষাৎকার খুবই আন্তরিকতাপূর্ণ হয়েছিল। লর্ড রিপনের কাছ থেকে সহানুভূতি ও শিক্ষাবিভাগে নিয়োগের প্রতিশ্রুতি নিয়ে জগদীশচন্দ্র কলকাতায় ফিরে আসেন।

### প্রাদেশিক শিক্ষা-দপ্তরের প্রতিকূলতা

জগদীশচন্দ্রকে নিয়োগ করবার নির্দেশ দিয়ে ভাইস্‌রয় এক চিঠি লিখে পাঠালেন বাংলা সরকারের শিক্ষা-দপ্তরে। খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্ স্যার আলফ্রেড ক্রফ্‌ট্ তখন শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা। লর্ড রিপনের কাছ থেকে এই রকম নির্দেশ পেয়ে তিনি যে মনে মনে বেশ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তা প্রকাশ পেয়েছিল। সে জন্যে জগদীশচন্দ্র বেশ বিব্রত বোধ করেছিলেন। বিজ্ঞান-অধ্যাপনায় উচ্চতম পদে কোন ভারতীয় নিয়োগের একান্ত বিরোধী ছিলেন আলফ্রেড্‌ ক্রফ্‌ট্। তাঁর এই অনুদার মনোবৃত্তি যে একেবারে অমূলক ছিল, তা বলা যায় না। জগদীশচন্দ্রের আগে কোন ভারতীয় নব্যবিজ্ঞানের অনুশীলনে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন নি। তাই বিদেশী শাসকবর্গ ধরে নিয়েছিলেন—আইন-কানুন, সংস্কৃত-চর্চা, বিশেষ করে আধ্যাত্মিক চিন্তাধারায় ভারতীয়গণ উৎকর্ষের পরিচয় দিলেও তাদের মানসিক সংগঠন বিজ্ঞানচর্চার একান্ত অনুপযোগী। ক্রফ্‌ট্ সাহেব

জগদীশচন্দ্রকে বললেন—তাঁকে প্রভিন্‌শিয়াল সার্ভিসে নিয়োগ করা যেতে পারে, ইম্‌পিরিয়াল সার্ভিসে কোন পদ শূন্য নেই। এই প্রস্তাবে অসম্মতি জানিয়ে জগদীশচন্দ্র ফিরে এলেন। তরুণ জগদীশচন্দ্র ছাত্রমহলে শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারবেন কি না, সে সম্বন্ধে আলফ্রেড ক্রফ্‌ট্‌ ও প্রেসিডেন্সি কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ চার্লস্‌ টনি, দু-জনেরই যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তাঁরা যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলেন, যাতে শিক্ষাবিভাগে জগদীশচন্দ্র কোন প্রবেশাধিকার না পান। কিন্তু উচ্চতর কর্তৃপক্ষ-মহলের আগ্রহাতিশয্যে তাঁদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। লর্ড রিপন গেজেটে জগদীশচন্দ্রের নিয়োগবার্তা না দেখতে পেয়ে বাংলা সরকারের কাছে এই অহেতুক বিলম্বের জন্যে কৈফিয়ৎ চেয়ে পাঠান। তখন শিক্ষা-অধিকর্তা আলফ্রেড ক্রফ্‌ট্‌ লর্ড রিপনের নির্দেশ অনুসারে জগদীশচন্দ্রকে ইম্‌পিরিয়াল সার্ভিসে নিয়োগ করেন, অবশ্য অস্থায়ীভাবে। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলো, কর্মকুশলতার পরিচয় পাওয়া গেলে তাঁকে ঐ পদে স্থায়ী করা হবে।

জগদীশচন্দ্র ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগ দেন পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপকরূপে। এখানে তিনি এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন। অধ্যাপনা ও ছাত্র পরিচালন বিষয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রমহল এবং অধ্যাপকগোষ্ঠীর মধ্যে সাময়িক বিরোধ সম্পর্কে জগদীশচন্দ্র বলেছেন—"উচ্ছৃঙ্খল ও দুর্বিনীত বলে এই কলেজের ছাত্রদের সম্বন্ধে তখন বেশ অখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। কলেজের দু-জন অধ্যাপক ও ছাত্রমহলের মধ্যে বিরোধ এতটা সাংঘাতিক হয়ে উঠেছিল যে, সরকার এক তদন্ত কমিশন বসাতে বাধ্য হয়েছিলেন। আমার ভাবী ছাত্রদের এই ছিল প্রকৃতি। বয়সের তুলনায় আমাকে তখন বেশ তরুণ দেখাতো। 'এক নিরীহ, ভীরু মেষকে হিংস্র নেকড়ে বাঘের খপ্পরে ফেলে স্যার আলফ্রেড ক্রফ্‌ট্‌ সেদিন নিশ্চয়ই বেশ কৌতুক ও আনন্দ উপভোগ করেছিলেন।"

### সরকারের বৈষম্য-নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

জগদীশচন্দ্র যখন শিক্ষাবিভাগে যোগদান করেন তখন ইম্‌পিরিয়াল সার্ভিসে একজন ইউরোপীয় অধ্যাপককে যে বেতন দেওয়া হতো, একজন ভারতীয় অধ্যাপক পেতেন তার দুই-তৃতীয়াংশ। চাকরিতে নিয়োগ স্থায়ী না হলে তারও অর্ধেক দেওয়ার রীতি ছিল। জগদীশচন্দ্র তীব্র প্রতিবাদ জানালেন, এই বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সে প্রতিবাদে নির্বিকার। সরকারী চাকরিতে ভারতীয় অধ্যাপকদের মর্যাদা বৃদ্ধি করবার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে জগদীশচন্দ্র এক নতুন অহিংস নীরব প্রতিবাদের পথ গ্রহণ করেন। তিনি কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিলেন—ইউরোপীয় ও ভারতীয় অধ্যাপকদের মধ্যে এই ইচ্ছাকৃত অন্যায় ব্যবধান দূর না হলে তিনি অধ্যাপনার জন্যে কলেজ থেকে এক কপর্দকও গ্রহণ করবেন না। সংকল্প সিদ্ধির জন্যে তিনি অসীম ধৈর্যের সঙ্গে দীর্ঘ তিন বছর অপেক্ষা করেছিলেন।

এই সময় পরিবারের আর্থিক দুর্গতির চরম অবস্থা। জগদীশচন্দ্র পিতার সব ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেন। আত্মীয়-পরিজনদের পরামর্শ উপেক্ষা করে তিনি পিতৃপুরুষের সম্পত্তি বিক্রয় করেন। সেই অর্থ ও মায়ের অলঙ্কার, সব মিলিয়ে ঋণের একটা মোটা অংশ পরিশোধ করা সম্ভব হয়। বসু-পরিবারের ঋণ শোধ করবার এই আন্তরিক নিষ্ঠা পাওনাদারদের মর্ম স্পর্শ করে। তাঁরা সানন্দে ঋণের অবশিষ্ট অংশ ছেড়ে দিতে স্বীকৃত হন। কিন্তু জগদীশচন্দ্রের সংকল্প ছিল অন্যরূপ ; তিনি তা গোপন রাখেন।

কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নীতির সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত জগদীশচন্দ্র জয়ী হন। তাঁর সংকল্পের দৃঢ়তা ও অধ্যাপন-কুশলতায় শিক্ষা-অধিকর্তার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়। সরকার এক বিশেষ নির্দেশে প্রথম নিয়োগের দিন থেকে জগদীশচন্দ্রের চাকরি স্থায়ী বলে গণ্য করেন। কিন্তু ইউরোপীয় ও ভারতীয় অধ্যাপকদের মধ্যে বেতনের অহেতুক তারতম্য তখনো থেকে যায়। অবশ্য জগদীশচন্দ্রের চেষ্টায়

দেশীয় অধ্যাপকদের এই অসম্মান একদিন দূরীভূত হয়। আপাততঃ সরকারী মনোভাবের পরিবর্তনে জগদীশচন্দ্রের পদমর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং তাঁকে পূর্ববর্তী কয়েক বছরের প্রাপ্য অর্থ একসঙ্গে দেওয়া হয়। এই অর্থ তিনি পাওনাদারদের হাতে তুলে দেন। ঋণের আর যে সামান্য অংশ বাকী থাকে, তা তিনি বছর ছয়েকের মধ্যে নিজের বেতন থেকে পরিশোধ করেন।

## বিবাহ

প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা আরম্ভ করবার কয়েক বছর পরে (জানুয়ারী, ১৮৮৭) জগদীশচন্দ্র শ্রীমতী অবলা দাশের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। দেশের কল্যাণকর প্রগতিমূলক কর্মধারায় ভগবানচন্দ্র বসুর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন দুর্গামোহন দাশ। শ্রীমতী অবলা দাশ তাঁর দ্বিতীয়া কন্যা। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম বাঙ্গালী অধ্যক্ষ ডক্টর প্রসন্নকুমার রায় এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা দ্বারকানাথ রায় অবলা দাশের দুই সহোদরাকে বিবাহ করেছিলেন। দুর্গামোহন দাশের পুত্র সতীশরঞ্জন দাশ এক সময় বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্য ছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দুর্গামোহন দাশের ভ্রাতুষ্পুত্র।

দুর্গামোহন দাশের জন্মস্থান বিক্রমপুর। তিনি ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের একজন প্রথিতযশা অ্যাডভোকেট। গত শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে তিনি তরুণ বয়সে ব্রাহ্মসমাজ-আন্দোলনে যোগদান করেন। উত্তরকালে তাঁকে ধর্ম ও সংস্কারের কাজে নেতৃত্বের স্থানে দেখা যায়। ব্রাহ্মমন্দিরে উপাসনাকে কেন্দ্র করে দুর্গামোহন দাশই আমাদের দেশীয় সমাজে নারীজাগরণের আন্দোলন নিয়ে এসেছিলেন।[১] মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র তখন ব্রাহ্মসমাজের দুই প্রধান কর্ণধার। সমাজপতিগণ তখনো ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরের মধ্যে মহিলাদের প্রকাশ্য স্থানে বসবার কোন নির্দেশ দেন নি। সেই সময় দুর্গামোহন

১ 'রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত' (১৩১৫), পৃঃ ১৯৬ দ্রষ্টব্য।

স্বীয় পত্নী ও কন্যাদের নিয়ে উপাসনার সময় পুরুষ উপাসকদের মধ্যে নিঃসঙ্কোচে আসন গ্রহণ করেন। দেশের আর্থিক উন্নয়ন ও শিল্প-সংগঠনের কাজে ভগবানচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর সহযোগিতা থেকে ক্রমে ক্রমে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। জগদীশচন্দ্র ও অবলা দাশের বিবাহবন্ধন তার সার্থক ও শুভ পরিণতি। বন্ধুত্ব নিবিড়তর হয় আত্মীয়তার মধ্যে। অবলা দাশ তখন মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা ও এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। এই বিদুষী কন্যা পিতার কাছ থেকে স্বদেশপ্রেমের যে দীক্ষা নিয়েছিলেন—তা-ই তাঁকে উত্তর জীবনে নানাপ্রকার গঠনমূলক কাজে প্রেরণা দিয়েছিল। জগদীশচন্দ্র ও তাঁর সহধর্মিণী, উভয়ের ভাবধারার দুর্লভ সঙ্গতি তাঁদের জীবনকে পূর্ণতার পথে নিয়ে গিয়েছিল। একনিষ্ঠ গবেষণা ও তার প্রচারকার্যের জন্যে বহুবার প্রতীচ্য মহাদেশ পরিভ্রমণে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞানী-জায়া স্বামীর সান্নিধ্য থেকে দূরে থেকেছেন খুবই কম। স্বামীর সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও মানসিক প্রশান্তির দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁর সাধনাকে তিনি নানাভাবে সফল করে তুলেছিলেন।

গৃহস্থালীর অভিজ্ঞতা অবলা বসুর বিশেষ ছিল না। পাঠ্যজীবন থেকে সবেমাত্র নির্বাসিত হয়ে এসেছিলেন এক নতুন অপরিচিত জগতে। ভবিষ্যতের অনিশ্চিত জীবনের জন্যে নবদম্পতিকে আত্ম-নির্ভর হয়ে চলবার শিক্ষা নিতে হবে, সঙ্গতি সাধন করতে হবে উভয়ের ভাবজগতের মধ্যে—এই উদ্দেশ্যে দুর্গামোহন দাশের নির্দেশ মত জগদীশচন্দ্র বিবাহের পরে নবোঢ়া বধূকে নিয়ে মাস ছয়েক চন্দননগরে ছিলেন, অভিভাবকগণের কাছ থেকে দূরে। গঙ্গার ধারেই বাসা। নদীর অপর তীরে নৈহাটি। শ্রীযুক্তা বসু প্রত্যহ নৌকা করে জগদীশচন্দ্রকে নৈহাটিতে পৌঁছে দিয়ে যেতেন। সেখান থেকে কলকাতা এসে তিনি অধ্যাপনা করতেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। আবার দিনান্তে জগদীশচন্দ্রের প্রত্যাগমনের জন্যে নৌকা নিয়ে অধ্যাপক-পত্নী

প্রফুল্লচন্দ্র রায়

অপেক্ষা করতেন নৈহাটিতে। গৃহস্থালীর পরীক্ষায় শ্রীযুক্তা বসু বেশ সাফল্য লাভ করেছিলেন। গৃহকর্মে তাঁর নৈপুণ্য, বিশেষ করে রন্ধনপটুতার সকৌতুক উল্লেখ আছে রবীন্দ্রনাথের পত্রে।[১] এর পর জগদীশচন্দ্রের পিতামাতা পুত্র ও পুত্রবধূর সঙ্গে চন্দননগরের বাসায় কিছুদিন ছিলেন।

চন্দননগর থেকে কলকাতায় আসবার পর জগদীশচন্দ্র খুব সম্ভব বৌবাজারে স্কট লেনে থাকতেন। শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। কলেজের অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি একদিন এই বাড়ীতে এসেছিলেন। ছাত্রমহলের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের প্রীতির সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি তা উল্লেখ করেন।[২]

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের অগাস্ট মাসে প্রফুল্লচন্দ্র ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতে প্রত্যাগমন করেন। তিনিই এদেশে নব্য-রসায়নের প্রথম আচার্য। জগদীশচন্দ্রের বছর দুয়েক পরে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-অনুশীলনের উদ্দেশ্যে প্রফুল্লচন্দ্র ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন। একই সঙ্গে গিয়েছিলেন দ্বারকানাথ রায় চিকিৎসা-বিজ্ঞান অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে। এই দুটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী বাঙ্গালী তরুণকে জগদীশচন্দ্র ও সত্যরঞ্জন দাশ (সতীশরঞ্জন দাশের জ্যেষ্ঠ সহোদর) লণ্ডনের ফেনচার্চ স্ট্রীট স্টেশনে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অব সায়েন্স উপাধি নিয়ে আসবার পরেও প্রফুল্লচন্দ্রের পক্ষে শিক্ষাবিভাগে প্রবেশাধিকার সহজলভ্য হয় নি। এই সময় কর্মহীন অবস্থায় তিনি খুবই অস্বস্তি বোধ করতেন। এ-সম্পর্কে তিনি নিজেকে কেশবর্জিত স্যামসনের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর অখণ্ড অবসরের মধ্যে বসু-দম্পতির গৃহে প্রায়ই আতিথ্য গ্রহণ করতেন।

---

১। জগদীশচন্দ্রকে লিখিত পত্র, মে ও সেপ্টেম্বর ১৯০১; 'চিঠিপত্র', ষষ্ঠ খণ্ড; বিশ্বভারতী।

২। কষ্টিপাথর, প্রবাসী; অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে জগদীশচন্দ্র ৬৪/২, মেছুয়াবাজার স্ট্রীটে একটি বড় বাড়ীতে উঠে আসেন। এই বাড়ীর এক অংশে থাকতেন তাঁর ভগ্নীপতি মোহিনীমোহন বসু। এই সময় তিনি কতকটা সখের খাতিরে ফটোগ্রাফির চর্চা ও শব্দ রেকর্ড করবার পদ্ধতি সম্পর্কে নানারকম পরীক্ষা করতেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে এডিসনের প্রথম মডেলের একটি ফনোগ্রাফ কেনা হয়েছিল। কিভাবে কণ্ঠস্বর রেকর্ডে ধরে তার অবিকল পুনরাবৃত্তি করা যায়, তাই নিয়ে তিনি নানারকম পরীক্ষা করেন। ফটোগ্রাফির সৌখীন চর্চা ভবিষ্যতে একদিন প্রগাঢ় বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসায় পরিণত হয়েছিল। এ-সম্বন্ধে তিনি গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশ করেন এবং ইংল্যাণ্ডের ফটোগ্রাফিক সোসাইটিতে বক্তৃতা দেন।

---

৩। *Life and Experiences of a Bengali Chemist*—P. C. Ray, 1932 ; পৃ ৫৩, ৮০।

চতুর্থ অধ্যায়

# বৈজ্ঞানিক গবেষণার সূচনা-পর্ব

'তপস্যাক্ষেত্র ছিল যবে নিভৃত নিরালা বাধায় বেষ্টিত রুদ্ধ'

—রবীন্দ্রনাথ

## বিজ্ঞান-মানসের পটভূমিকা

প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদানের কিছু পর থেকে জগদীশচন্দ্র মৌলিক বিজ্ঞান-অনুশীলনে মনোনিবেশ করেন। গতানুগতিক অধ্যাপনার মধ্যে তাঁর চিন্তাধারা ও কর্মপ্রয়াস সীমাবদ্ধ থাকে নি।

জগদীশচন্দ্র তাঁর গবেষক-জীবনের সূচনা-পর্বে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। এই প্রবণতার একটা সঙ্গত ইতিহাস আছে। জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-মানসের পটভূমিকা তৈরী হয়েছিল কেম্‌ব্রিজে অধ্যয়ন করবার সময়। লর্ড র‍্যালের পূর্বে সেখানে পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন ইংল্যাণ্ডের খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ক্লার্ক ম্যাক্‌স্‌ওয়েল। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ম্যাক্‌স্‌ওয়েল বিদ্যুৎ-তরঙ্গের স্বরূপ সম্পর্কে কতকগুলি গাণিতিক সিদ্ধান্তে পৌঁচেছিলেন। ক্যাভেন্‌ডিশ লেবরেটরিতে ম্যাক্‌স্‌ওয়েলের এসব তত্ত্বীয় গবেষণার নিদর্শন সংরক্ষিত ছিল। কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ স্নাতক জগদীশচন্দ্রের চিন্তা-জগৎ তাতে নিঃসন্দেহে প্রভাবান্বিত হয়। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী হার্ৎস (Heinrich Hertz) ম্যাক্‌স্‌ওয়েল-তত্ত্বের অনুসরণে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সৃষ্টি করেন। মনে হয়, জগদীশচন্দ্র প্রথম থেকেই হার্ৎসের গবেষণায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর সংগ্রহের মধ্যে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হার্ৎসের সম্পূর্ণ রচনাবলীর দ্বিতীয় সংস্করণটি পাওয়া গেছে ( Untersuchungen

Uber Die Ausbreitung Der Elektrischen Kraft, von Heinrich Hertz—Johann Ambrosius Barth, Leipzig; 1894) এবং D. E. Jones কৃত তার ইংরেজী অনুবাদটিও (Electric Waves, Macmillan & Co, London, 1893) আগেই তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। পদার্থ-বিজ্ঞানের এই নতুন অধ্যায় সূচনা করবার অল্প কিছুকাল পরেই হার্ৎসের মৃত্যু হয়। বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সম্পর্কিত গবেষণায় জগদীশচন্দ্র সর্বশেষ অনুপ্রেরণা লাভ করেন ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে, স্যার অলিভার লজ লিখিত 'Heinrich Hertz and His Successors' শীর্ষক রচনা থেকে।

জগদীশচন্দ্রের জীবন-পঞ্জীতে ১৮৯৪-এর ৩০ নভেম্বর তাঁর ষট্‌ত্রিংশৎ জন্মদিনের একটা বিশেষ সার্থকতা আছে। সেদিন তিনি সংকল্প করেন—প্রকৃতির সব রহস্য উন্মোচন করে মানুষের জ্ঞানের পরিধি প্রসারিত করাই হবে তাঁর কর্মপ্রয়াসের চরম লক্ষ্য। কিন্তু সে লক্ষ্যে পৌঁছাবার পথে প্রতিবন্ধকতা অনেক। দৈনন্দিন কর্মতালিকার একটা বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে অধ্যাপনা। সেই ক্লান্তিকর কাজের মধ্যে গবেষণা করবার মত অবকাশ খুবই কম। তাছাড়া গবেষণা করবার জন্যে যেসব যন্ত্রপাতি ও উপকরণের একান্ত প্রয়োজন, তাই বা কোথায়? জগদীশচন্দ্র যখন অধ্যাপনা আরম্ভ করেন তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে কোন পরীক্ষাগার বা যন্ত্রপাতি তৈরীর কারখানা ছিল না। থাকবার মধ্যে বাথরুম সন্নিহিত একটি ছোট ঘর, পরীক্ষাগার স্থাপন করবার পক্ষে একমাত্র প্রশস্ত জায়গা। জগদীশচন্দ্র মনে করলেন—অতীতে একদিন যে জাতি সামান্য উপকরণ থেকে বৃহৎ কর্মসাধন করেছে, আমরা তো তাদেরই বংশধর! অবশ্য অধিকাংশ ভারতীয়দের ধারণা ছিল, এদেশে মৌলিক বিজ্ঞানচর্চা সম্ভব নয়। অবস্থার বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় অভিযোগ না করে জগদীশচন্দ্র চেষ্টা করতে লাগলেন, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করবার জন্যে। গবেষণার প্রাথমিক পর্বে এই প্রতিকূল পরিবেশ সম্পর্কে তিনি বলেছেন—"ভারতবাসীরা কেবলই

ভাবপ্রবণ ও স্বপ্নাবিষ্ট, অনুসন্ধান কার্য কোন দিনই তাহাদের নহে, এই এক কথাই চিরদিন শুনিয়া আসিতাম। বিলাতের ন্যায় এদেশে পরীক্ষাগার নাই, সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্ম্মাণও এদেশে কোনদিনই হইতে পারে না, তাহাও কতবার শুনিয়াছি। তখন মনে হইল, যে ব্যক্তি পৌরুষ হারাইয়াছে, কেবল সে-ই বৃথা পরিতাপ করে। অবসাদ দূর করিতে হইবে, দুর্ব্বলতা ত্যাগ করিতে হইবে। ভারতই আমাদের কর্ম্মভূমি, সহজ পন্থা আমাদের জন্য নহে।......এই সকল কথা স্মরণ করিয়া একজন তাহার সমগ্র মন, সমগ্র প্রাণ ও সাধনা ভবিষ্যতের জন্য নিবেদন করিয়াছিল”।[১]

**দুঃসাধ্য সাধনের ব্রত—অরূপ রশ্মির অন্বেষণ**

যন্ত্রপাতি তৈরী করবার জন্যে জগদীশচন্দ্র এক মিস্ত্রীকে কাজে লাগালেন ; অসাধ্য সাধনের ব্রত আরম্ভ হলো। দু-বছরের মধ্যে—পৃথিবীর বিজ্ঞানী-সমাজ মুখর হয়ে উঠলো, এখানকার তৈরী যন্ত্রপাতি ও তার সাহায্যে সংগৃহীত বৈজ্ঞানিক তথ্যের সপ্রশংস আলোচনায়। জগদীশচন্দ্রের অধ্যাপনা-কুশলতা ও গবেষণা-প্রবণতা আগেই শিক্ষা-বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাঁর গবেষণায় ‘দৃশ্য আলোক-তরঙ্গ ও হার্ৎস-উদ্ভাবিত অদৃশ্য বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সমধর্মীতা’ প্রমাণিত হলো। তার ফলে তিনি বিশ্বের বিজ্ঞানী-সমাজে স্থানলাভ করেন। বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সম্পর্কিত গবেষণার ফলাফল লিপিবদ্ধ করে তিনি ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে তারিখে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে ‘বিদ্যুৎ-রশ্মির সমবর্তন’ (On polarisation of electric rays by double refracting crystals) শীর্ষক নিবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতিত্ব করেন ডক্টর রুডল্‌ফ্ হর্নলে (Dr. A. F. Rudolph Hoernlé)। প্রফুল্লচন্দ্র রায়

১। বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের উদ্‌বোধন উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণ ; ‘নিবেদন’ শীর্ষক প্রবন্ধ ; অব্যক্ত (১৩২৮), পৃঃ ১৭০-১৭১ দ্রষ্টব্য।

ও চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন।[১] সোসাইটির তৎকালীন সভাপতি ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক আলেকজাণ্ডার পেড্‌লার। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বার্ষিক অধিবেশনে তিনি এই নিবন্ধের উল্লেখ করে জগদীশচন্দ্রের গবেষণার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। উক্ত নিবন্ধ সোসাইটির কার্য-বিবরণীতে প্রকাশিত হয়। এর পর ইংল্যাণ্ডের কোন বিজ্ঞান-পত্রিকায় প্রকাশ করবার জন্যে জগদীশচন্দ্র লর্ড র‍্যালের কাছে আরও দুটি নিবন্ধ[২] প্রেরণ করেন। সেগুলি লর্ড র‍্যালের অনুমোদন-ক্রমে লণ্ডনের 'ইলেকট্রিশিয়ান' পত্রিকায় ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বরের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কোন মাধ্যম অতিক্রম করবার সময় বিদ্যুৎ-রশ্মির যে পথ পরিবর্তন হয়, সে সম্পর্কে জগদীশ-চন্দ্রের পরবর্তী নিবন্ধ 'The indices of electric refraction' লর্ড র‍্যালে কর্তৃক রয়াল সোসাইটিতে প্রেরিত হয়। নিবন্ধটি গৃহীত হওয়ায় সে বছর ১৩ই ডিসেম্বর সোসাইটির অধিবেশনে পঠিত হবার পর সোসাইটির মুখপত্রে প্রকাশিত হয়।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রন্‌ট্‌গেন-রশ্মি আবিষ্কৃত হবার পর জগদীশচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজের পরীক্ষাগারে তার পুনরাবৃত্তি করেন। চিকিৎসা-পদ্ধতিতেও যে তিনি সে যুগে এই নতুন রশ্মি প্রয়োগে উৎসাহ প্রদর্শন করেন, ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত এক পত্রে তার উল্লেখ আছে।[৩]

---

১। *Proceedings of the Asiatic Society of Bengal,* p. 91 (1895).

২ "On a new Electropolariscope" এবং "On double refraction of the electric ray by a strained dielectric".

৩। "যদি পারেন, তাহা হইলে সকালে ৮টার সময় প্রেসিডেন্সি কালেজ হইয়া আসিবেন। রঞ্জেন কলে একজন রোগী দেখিতে হইবে, তাহার পৃষ্ঠভঙ্গ হইয়াছে।...ডাক্তার নীলরতন সরকারের কথা এড়াইতে পারিলাম না।"

লর্ড র‍্যালে

জগদীশচন্দ্র এই সময় অদৃশ্য বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে বাহন করে সঙ্কেত-বার্তা প্রেরণের চেষ্টা করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের গবেষণাগার ছাড়াও কনভেন্ট রোডের বাসায় তিনি এ-সম্পর্কে নানা রকম পরীক্ষায় ব্যাপৃত থাকতেন। পাশ্চাত্ত্যের বিজ্ঞানী-সমাজে জগদীশচন্দ্রের গবেষণা যে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে, তার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতার 'ইংলিশম্যান' পত্রিকা লিখেছিলেন—"বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ভারতীয় ছাত্রদের বিতৃষ্ণা ও মৌলিকতার অভাব সম্পর্কে যে অভিযোগ করা হয় তা আর বেশী দিন যুক্তিসঙ্গত মনে হবে না। অধ্যাপক বসু যদি 'কোহেরার' ( coherer ) যন্ত্রটিকে আরো নিখুঁত করতে পারেন তবে একদিন দেখা যাবে, প্রেসিডেন্সি কলেজের গবেষণাগারে একাকী কার্যরত বাঙ্গালী বিজ্ঞানীর আবিষ্কার সুদীর্ঘ পটভূমির আলোক-ব্যবস্থায় বিপ্লব এনেছে।"[১]

জগদীশচন্দ্রের প্রথম জীবনের এই গবেষণা যে ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করেছিল, তাতে লর্ড র‍্যালের অবদান কম নয়। এই মহান বিজ্ঞানী তাঁর প্রতিভাধর শিষ্যের সম্ভাবনাপূর্ণ গবেষণার প্রকৃতি লক্ষ্য করে মুগ্ধ হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, অর্থ ও উপকরণের অভাবে জগদীশচন্দ্রের গবেষণা ব্যাহত হচ্ছে, এই কথা শুনে লর্ড র‍্যালে তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, 'গভর্ণমেণ্ট গ্র্যাণ্ট ফাণ্ড' থেকে সাহায্যের জন্যে রয়্যাল সোসাইটির কাছে আবেদন করতে। লর্ড র‍্যালে সে সময়

১। "It would seem that the complaint of want of originality and distaste for scientific research so often brought against the Indian student is in a fair way of becoming no longer a just reproach. Should Professor Bose succeed in perfecting and patenting his 'coherer', we may in time see the whole system of coast-lighting throughout the navigable world revolutionised by the discoveries made by a Bengali scientist working single-handed in our Presidency College Laboratory."

—Englishman, 18th June, 1896.

রয়্যাল সোসাইটির যুগ্ম-সম্পাদক ; সুতরাং জগদীশচন্দ্রকে গবেষণার জন্যে আর্থিক সাহায্য মঞ্জুর করতে তাঁর কোনও অসুবিধা হয় নি। জগদীশচন্দ্রই সম্ভবতঃ প্রথম ভারতীয় বিজ্ঞানী, যিনি পাশ্চাত্ত্যের এক বিজ্ঞান-সংস্থা থেকে গবেষণার জন্যে এরূপ অর্থানুকূল্য লাভ করেছিলেন। এই সাহায্য ও সহানুভূতি সেদিন তাঁর মধ্যে নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল।

পাশ্চাত্ত্যের বিজ্ঞানী-সমাজে যখন জগদীশচন্দ্রের গবেষণার মূল্য স্বীকৃত হচ্ছিল, তখন স্বদেশেও তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সশ্রদ্ধ কৌতূহল জন্মে। প্রাক্তন অধ্যাপক ফাদার লাফোঁর অনুকরণে তিনি কলকাতার নাগরিকদের সমক্ষে পরীক্ষা সহযোগে বক্তৃতা দিতে মনস্থ করেন। বৈজ্ঞানিক বিষয়ে এই লোকরঞ্জক বক্তৃতানুষ্ঠানে ফাদার লাফোঁ ছিলেন তাঁর প্রিয় শিষ্যের সবচেয়ে উৎসাহী সহযোগী। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে প্রেসিডেন্সি কলেজে এক পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। প্রফুল্লচন্দ্রের কক্ষ থেকে অদৃশ্য বিদ্যুৎ-তরঙ্গ অধ্যাপক পেড্‌লারের কক্ষে এসে নিজের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করেছিল। এই পরীক্ষার মধ্যেই বেতারে সঙ্কেত বা বার্তা প্রেরণের সম্ভাবনা সূচিত হয়। পরের বছর বাংলার ছোটলাট স্যার আলেকজাণ্ডার ম্যাকেন্‌জির উপস্থিতিতে টাউন হলে অনুরূপ এক পরীক্ষায় জগদীশচন্দ্র বেতার-সঞ্চারী বিদ্যুৎ-তরঙ্গের অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শন করেন।

টাউন হলের বক্তৃতার পর ম্যাকেন্‌জি জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেন। তাঁর আগ্রহাতিশয্যে বাংলা সরকার থেকে জগদীশচন্দ্রকে তড়িৎ-বিজ্ঞানে গবেষণার জন্যে এককালীন হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়। স্যার আলেকজাণ্ডার ম্যাকেন্‌জিকে অভিনন্দন জানিয়ে সেদিন কলকাতার এক দৈনিক পত্রিকা লিখেছিলেন—"খুবই সঙ্গত ও সার্থক এই পদক্ষেপ। ভারতবর্ষে আজ সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষার।

একদিন জড়বিজ্ঞানের প্রতি দেশবাসীর ঔদাসীন্যের জন্যে অনুশোচনা করা হতো.। তখন একটা সার্বজনীন ধারণা ছিল—বিজ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশাধিকার পাবার মত গুণ ভারতীয়দের নেই। কিন্তু অধ্যাপক বসুর অভাবনীয় সাফল্যে সে ধারণা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে। ভবিষ্যতে এদেশে প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থাকে যেন সাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তার মধ্যে বিজ্ঞান ও কারিগরি পাঠক্রম গ্রহণ করা হয়। আমাদের তরুণ সম্প্রদায়ের সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার জন্যে স্যার আলেকজাণ্ডার ম্যাকেন্‌জি যদি তাঁর শাসনাধীন প্রদেশসমূহে শিক্ষা-ব্যবস্থায় এ-রকম সংস্কার সাধনে আন্তরিক প্রয়াসী হন, তবে দেশীয় গণমানসে তাঁর স্থান অক্ষয় হয়ে থাকবে।"[১]

এই সময় জগদীশচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজের পরীক্ষাগারে যে সব

১। This is a step in the right direction . . . what we most need in India is scientific and technical education. There was a time when the neglect of Physical Science by our country-men was very much deplored, and it was also thought that the people of India had not that in them which would qualify them to enter with any degree of success into the domain of science. But the remarkable success of Professor J. C. Bose as a Professor of Science in the Calcutta Presidency College, has negatived such a supposition. . . . In future the education system to be in force in this country, should not only be literary but also include a course of scientific, technical and commercial instructions. Sir Alexander Mackenzie will have a cherished place in the hearts of the people of Bengal, if he be pleased to see such reforms introduced in the educational system in the provinces over which he rules as would enable our youth to receive an all-round solid education. . . . *The Indian Mirror,* Jan. 8, 1896.

বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি সংগ্রহ করেছিলেন, সেগুলি সংকলিত করে তিনি একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন।[১] প্রখ্যাত পদার্থ-বিজ্ঞানী লর্ড কেল্‌ভিন এই পুস্তিকা পাঠ করে জগদীশচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন তাঁকে নিজের প্রকাশিত নিবন্ধাবলীর এক সংকলন পাঠিয়ে।

প্রায় একই সময়ে ( ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে ) জগদীশচন্দ্র ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্যে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য নির্ণয় ( On the determination of the wave-length of electric radiation by diffraction grating ) সম্পর্কে এক নিবন্ধ পেশ করেন। ঐ নিবন্ধ যথারীতি গৃহীত হয় এবং তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অব সায়েন্স ( D. Sc. ) উপাধি লাভ করেন।[২] জগদীশচন্দ্রের নিবন্ধের পরীক্ষক ছিলেন অধ্যাপক পয়েনটিং ও টমসন।

পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানী-সমাজে জগদীশচন্দ্রের প্রভূত সম্মানলাভে তাঁর কর্মক্ষেত্রে একদল ঈর্ষাকাতর ব্যক্তি নানাভাবে বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকেন। তাঁদের অভিযোগ—মৌলিক বিজ্ঞান-অনুশীলনের নামে জগদীশচন্দ্র অধ্যাপনার কাজে অবহেলা করছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, এই তরুণ অধ্যাপকের বিজ্ঞান-সাধনায় প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। বাংলার তৎকালীন লাট ম্যাকেন্‌জি জগদীশচন্দ্রের গবেষণার মূল্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন এবং তাঁকে যে নানা বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে চলতে হয়, তাও তিনি উপলব্ধি করতেন। তাই তিনি জগদীশচন্দ্রের জন্যে বেশী বেতনের এক নতুন পদ সৃষ্টির পরিকল্পনা করেন। কাজ তাঁর হবে সরকার-নিয়ন্ত্রিত কলেজে বিজ্ঞানাগারগুলির সংস্কার সাধন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে কয়েকজন তরুণ ছাত্রকে বৈজ্ঞানিক

১। "An account of experimental researches carried out at the Physical Laboratory of the Presidency College in the year 1895".

২। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রেরিত ২৬শে মে (১৮৯৬) তারিখের তারবার্তা —"( Thesis ) Accepted, ( Your ) presence excused."

গবেষণায় প্রণোদিত করা। কিন্তু শিক্ষাবিভাগের বিরোধিতায় ম্যাকেন্‌জির এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। জগদীশচন্দ্র তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সরকার-মনোনীত সদস্য। কোন কোন ব্যাপারে জগদীশচন্দ্র নিজের বিবেক অনুযায়ী কাজ করাতে তা সরকারী স্বার্থের অনুকূল হয় নি। এর জন্যে কৈফিয়ৎ চাওয়া হলে জগদীশচন্দ্র উত্তরে বলেন—"সরকারের অন্ধ স্তাবকতা করবো, এই যদি আমার কাছে আশা করা হয়ে থাকে তবে যেন যথা সত্বর আমাকে সরকারী মনোনয়ন থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।" এই সব ব্যাপারে শিক্ষাবিভাগ জগদীশচন্দ্রের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু ম্যাকেন্‌জি সাহেব জগদীশচন্দ্রকে তাঁর গবেষণা-কার্যে সাহায্য করবার জন্যে আন্তরিক-ভাবে চেষ্টা করছিলেন।

জগদীশচন্দ্রকে নতুন পদে নিয়োগের পরিকল্পনা ব্যর্থ হবার অব্যবহিত পরে এক সরকারী পত্রে তাঁকে জানানো হয়—এ-পর্যন্ত গবেষণার কাজে তিনি যে পরিমাণ ব্যক্তিগত অর্থব্যয় করেছেন, তা সম্পূর্ণ তাঁকে দেওয়া হবে। জগদীশচন্দ্র এই অর্থ গ্রহণে অসম্মত হওয়ায় সরকার প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর মৌলিক বিজ্ঞান-অনুশীলনের সাহায্য হিসেবে বার্ষিক আড়াই হাজার টাকা মঞ্জুর করেন।

### পঞ্চম অধ্যায়

# ইউরোপে প্রথম বৈজ্ঞানিক মিশন

গবেষণার প্রথম পর্বে বিদেশী বৈজ্ঞানিকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা ও উদ্ভাবিত তথ্যসমূহের সার্বজনীন স্বীকৃতি জগদীশচন্দ্রকে নতুন ভাবে গবেষণায় উৎসাহিত করে। সে সব গবেষণার সার্থক পরিচালনের পক্ষে এদেশে অনেক বাধাবিঘ্ন থাকায় তিনি বিদেশযাত্রার একান্ত প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। মনের ব্যাকুলতা প্রকাশ করে তিনি লর্ড র্যালেকে এক চিঠি দেন। উত্তরে শুভাকাঙ্ক্ষী অধ্যাপক তাঁর এই সংকল্পকে আন্তরিক সমর্থন জানিয়ে লিখলেন—"মাঝে মাঝে ইউরোপ পরিদর্শনে তোমার কাজের অনেক সুবিধা হবে।" লর্ড জর্জ হ্যামিলটন তৎকালীন ভারতসচিব। সামান্য পরিচয়ের সূত্র ধরে লর্ড র্যালে তাঁকে অনুরোধ করে চিঠি দিলেন—জগদীশচন্দ্রকে যেন তাঁর পরিকল্পনা সার্থক করবার জন্যে যথাসম্ভব সাহায্য করা হয়।

এই সময় লর্ড র্যালের কলকাতা পরিদর্শনের ফলে জগদীশচন্দ্রের ইউরোপ যাত্রা ত্বরান্বিত হয়। জগদীশচন্দ্র তাঁর নতুন গবেষণায় লর্ড র্যালের মত প্রখ্যাত বিজ্ঞানীর সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে আলোচনা করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর আমন্ত্রণে ইংল্যাণ্ডের এই প্রবীণ বিজ্ঞানী ও তাঁর প্রাক্তন অধ্যাপক প্রেসিডেন্সি কলেজের বীক্ষণাগার দেখতে আসেন। লর্ড র্যালে তরুণ জগদীশচন্দ্রের গবেষণায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ইউরোপ পরিভ্রমণে নতুন করে উৎসাহিত করে যান। তাঁর মনে হয়—এরূপ বিদেশ ভ্রমণে জগদীশচন্দ্র পাশ্চাত্ত্যের প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানীদের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পাবেন এবং সেই সঙ্গে ইউরোপের বিখ্যাত গবেষণাকেন্দ্রগুলিতে যে তথ্যানুসন্ধান চলেছে, তার একটা পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ও লাভ করবেন।

জগদীশচন্দ্র এর পর ইউরোপ যাত্রায় দৃঢ়সংকল্প হয়ে সরকারের কাছে ছুটির জন্যে আবেদন করেন। তাঁর এই পশ্চিমযাত্রার উদ্দেশ্য দুটি—প্রথমতঃ, ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের সম্মেলনে যোগদান ও সেখানে একটি নিবন্ধ পাঠ ; দ্বিতীয়তঃ, ইংল্যাণ্ড ও ইউরোপের বিভিন্ন অংশে প্রধান প্রধান গবেষণাগারগুলি পরিদর্শন। শিক্ষাবিভাগের মনোভাবের তখন পরিবর্তন হয়েছে। জগদীশচন্দ্রের ইউরোপ যাত্রার উদ্দেশ্য সমর্থন করে শিক্ষা-অধিকর্তা স্যার আলফ্রেড ক্রফ্‌ট্‌ বাংলা সরকারের সেক্রেটারির কাছে এক চিঠি দেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুন তারিখে লিখিত সেই সুদীর্ঘ পত্রের কিছুটা অংশ উদ্‌ধৃত হলো[১] :

---

১। In previous correspondence I have communicated to Government my opinion of the value of the scientific researches pursued at the Physical Laboratory of the Presidency College, Calcutta, by Prof. J. C. Bose, M.A., B.Sc., . . . . Mr. Bose is now very anxious to go to England for six months, in order, in the first place, to attend the meeting of the British Association in September, and if possible, in the second place, to visit the chief laboratories of England and the Continent, with the object of gaining knowledge which will be useful for his future work. I beg to submit for the favourable consideration of Government the proposal that instead of taking furlough for this purpose, he should be deputed to visit Europe for six months on the public service under Article 103 of the Civil Service Regulations. In order to justify this proposal, it is necessary for me to submit a brief account of the original work on which Mr. Bose has recently been engaged, and of the gratifying recognition which it has received from various scientific authorities in Europe. . . . .

"প্রেসিডেন্সি কলেজের বীক্ষণাগারে জগদীশচন্দ্র যে গবেষণায় ব্যাপৃত রয়েছেন, তার মূল্য সম্বন্ধে আমার মতামত আগের এক চিঠিতে ব্যক্ত করেছি। অধ্যাপক বসু এখন মাস ছয়েকের জন্যে ইংল্যাণ্ড যেতে ইচ্ছুক। তিনি ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের সেপ্টেম্বর মাসের অধিবেশনে যোগ দেবেন এবং যদি সম্ভব হয় তবে তিনি ইউরোপের বিখ্যাত গবেষণাকেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করে তাঁর ভবিষ্যৎ গবেষণার সহায়ক অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন। আমি সরকারের সহানুভূতিপূর্ণ বিবেচনার জন্যে প্রস্তাব করছি—অধ্যাপক বসুকে এখান থেকে প্রতিনিধিরূপে ইউরোপ পরিদর্শনে পাঠানো হোক। আমার প্রস্তাবের যৌক্তিকতা প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে এই সঙ্গে ইউরোপীয় বিজ্ঞানী-সমাজে সমাদৃত জগদীশচন্দ্রের গবেষণার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিলাম। আমি আশা করি, এথেকে অধ্যাপক বসুর অনন্যসাধারণ মৌলিকতা ও গবেষণা-প্রতিভার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে। এ-রকম প্রতিভাবান তরুণ বিজ্ঞানীকে সর্বপ্রকারে উৎসাহিত করা সরকারের কর্তব্য। শুধু অধ্যাপক বসুর ব্যক্তিগত লাভই নয়, সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞানের প্রগতির কথা ভেবে আমি তাঁকে ডেপুটেশনে পাঠানো প্রয়োজন মনে করি।"

জগদীশচন্দ্র এই প্রসঙ্গে স্যার আলেকজাণ্ডার ম্যাকেন্‌জির সঙ্গে দেখা করেন। বিজ্ঞানী হিসেবে জগদীশচন্দ্রকে ম্যাকেন্‌জি গভীর

---

From the above, I hope, it will be clear that Prof. Bose is an investigator of exceptional originality and power, and that he deserves all the encouragements that the Government can give him. In advocating his deputation to Europe on duty, I have in mind not merely his own personal benefit, but also the resulting advantage to science."—Letter from Sir Alfred Croft, Director of Public Instruction, Bengal, to the Secretary to the Government of Bengal, dated, 16th June, 1896.

শ্রদ্ধা করতেন। শিক্ষা-অধিকর্তার সুপারিশ তিনি বিনা দ্বিধায় মেনে নিলেন। জগদীশচন্দ্রকে ডেপুটেশনে পাঠানো সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্যসহ অস্থায়ী সেক্রেটারি ফিনুকেন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ম্যাকেন্‌জির সিদ্ধান্ত জানালেন।

"অধ্যাপক বসুকে ইউরোপে ডেপুটেশনে পাঠাবার প্রস্তাব ছোটলাট দৃঢ়ভাবে সমর্থন করছেন। অধ্যাপক বসুর গবেষণায় উৎসাহ সঞ্চার করবার জন্যে তাঁর পক্ষে যতটুকু সম্ভব তা তিনি করেছেন; কারণ, তাঁর মতে এটা সরকারের কর্তব্য। অধ্যাপক বসুর ইউরোপ পরিদর্শন ও প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার যথেষ্ট মূল্য আছে বলে তিনি মনে করেন।"[১]

সর্বশেষ অনুমোদনের জন্যে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত জানানো হয় ভারতসচিবকে। লর্ড র‍্যালে এই বিষয়ে ভারতসচিব হ্যামিলটনকে পূর্বাভাস দিয়ে রেখেছিলেন। সুতরাং জগদীশচন্দ্রের ইউরোপ পরিদর্শন সম্বন্ধে আর কোন বাধা বা অনিশ্চয়তা রইলো না।[২]

---

১। The Lieutenant-Governor strongly advocates the grant of the concession asked for. His Honour has done what he could to encourage and advance Mr. Bose's researches, as he thinks it is the duty of a great Government to do when it has a man of such exceptional qualifications on its staff, and he attaches much importance to Mr. Bose visiting Europe and conferring with the leaders of scientific inquiry there.—Letter from M. Finucane, Officiating Secretary to the Government of Bengal to the Secretary to the Government of India, Home Department, dated, the 30th June, 1896.

২। It has been settled that Prof. Bose should proceed at once on deputation to England to be present at a meeting of the British Association.—Indian Mirror, 16th July, 1896.

২৪শে জুলাই তারিখে বোম্বাই থেকে এস. এস. ক্যালেডোনিয়া জাহাজে জগদীশচন্দ্র ইংল্যাণ্ড যাত্রা করলেন।[১]

## ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের লিভারপুল অধিবেশনে বক্তৃতা

জগদীশচন্দ্র ২১শে সেপ্টেম্বর লিভারপুলে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের বিজ্ঞানী-সম্মেলনে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।[২] বক্তৃতার বিষয়বস্তু আগেই গণিত ও পদার্থ-বিজ্ঞান শাখার সভাপতি স্যার জে. জে. টমসনকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি সে সময় জগদীশচন্দ্রকে লিখেছিলেন, তাঁর বক্তৃতা খুবই সমাদৃত হবে। টমসনের সে ভবিষ্যদ্‌-বাণী সার্থক হয়। বক্তৃতাশেষে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী বৃদ্ধ লর্ড কেল্‌ভিন শ্রোতৃমণ্ডলীর স্বতঃস্ফূর্ত-প্রশংসায় যোগ তো দেনই, তাছাড়া আবেগের আতিশয্যে মহিলাদের গ্যালারিতে গিয়ে বসুপত্নীকে অভিনন্দিত করেন। লর্ড কেল্‌ভিন এতটা মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি ভারত-সচিবকে একখানা পত্রে লেখেন—"আমি বিশ্বাস করি, অধ্যাপক বসুর পরিচালনাধীনে প্রেসিডেন্সি কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি সুসজ্জিত গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হলে তা কলকাতায় বিজ্ঞানশিক্ষার সহায়ক হবে এবং ভারতবর্ষের খ্যাতি বৃদ্ধি পাবে।"

ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনে জগদীশচন্দ্রের এই বক্তৃতা সমকালীন পত্রিকাসমূহে যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল, নিম্নমুদ্রিত আংশিক উদ্‌ধৃতি (বঙ্গানুবাদ) থেকে তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

'এই বছরে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের সম্মেলনে সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য বিষয় হলো, বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সম্বন্ধে অধ্যাপক বসুর বক্তৃতা। কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট, কেম্‌ব্রিজের এম. এ. ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অব সায়েন্স উপাধি-প্রাপ্ত এই বিজ্ঞানী বিদ্যুৎ-

---

১। *Indian Daily News,* July, 18 (?) 1996.

২। "Complete apparatus for studying the properties of electric waves." (*Philosophical Magazine,* Jan., 1897).

রশ্মির সমবর্তন ( Polarisation ) সম্পর্কে যে মৌলিক গবেষণা করেছেন, তার প্রতি ইউরোপের বিজ্ঞানকর্মীদের আগ্রহ সঞ্চারিত হয়েছে। রয়্যাল সোসাইটি বিদ্যুৎ-রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ও প্রতিসরাঙ্ক সম্বন্ধে তাঁর গবেষণামূলক নিবন্ধের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।"[১]

"অদৃশ্য বিদ্যুৎ-তরঙ্গ নিয়ে অধ্যাপক বসু নানারকম পরীক্ষা দেখিয়েছেন—ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাঁর নতুন বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহের একাধিক সার্থক প্রয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে। দূরদূরান্তে সঙ্কেত-বার্তা প্রেরণ তাদের মধ্যে প্রধানতম। ঘন কুয়াশার মধ্যে জাহাজ থেকে জাহাজে বা বাতিঘর থেকে জাহাজে সঙ্কেত প্রেরণের সমস্যা যদি দূর হয় তবে মানবজাতির অশেষ কল্যাণ হবে।"[২]

---

১। "Among the most interesting features at the British Association this year was the paper on Electrical Waves by Professor J. C. Bose. This gentleman, an M.A. of Cambridge, Doctor of Science of London and a graduate of the Calcutta University, had already won the attention of the scientific world by his strikingly original researches on the polarisation of the electric ray. His later papers on the Determination of the Indices of Electric refraction and of the wave length of electric Radiation were published, with high tributes, by the Royal Society."—Times (London), 5th October, 1896.

২। "[Prof. Bose] has transmitted signals to a distance of nearly a mile ; and herein lies the first and obvious and exceedingly valuable application of this new theoretical marvel. It is telegraphy without any kind of intervening conductor. Every reader, we are sure, will instantly see that if all this be true the great problem of transmitting signals from ship to ship or from lighthouse to ship through a fog, has been solved

"মনীষিগণের জাতিত্ব নিয়ে অনেক সময় তুমুল তর্ক ও লেখনীযুদ্ধ হয়ে থাকে; কিন্তু তাঁদের সম্পর্কে ন্যাশন্যালিটির প্রশ্ন তুচ্ছ। বস্তুতঃ তাঁরা ন্যাশন্যালিটি, ব্যষ্টি বা কালের উর্ধ্বে; তাঁরা এই পৃথিবীর নাগরিক। ভারতবর্ষকে আমরা এতদিন একটা রহস্যময় দেশ বলে মনে করে এসেছি; এখানকার অধিবাসীদের মনে করেছি, নিছক কল্পনাপ্রবণ—যুক্তি ও বাস্তবতাবোধের কোন স্থান নেই সেখানে। ভুলে গিয়েছিলাম তাদের দূর অতীতের সমৃদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রগুলির কথা, ভুলে গিয়েছিলাম প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকগণের প্রজ্ঞা ও বোধিশক্তির কথা, জ্যোতিষ ও গণিতে যাঁদের গবেষণা-বুদ্ধি এবং চিন্তাধারা আরব ও গ্রীকদের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে এসে পৌঁচেছিল। বৈদেশিক জাতির আক্রমণ ও অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে অনেক বছর ধরে ভারতবর্ষে জ্ঞানের প্রগতি ব্যাহত হয়েছে। রাজনৈতিক শান্তি ও শৃঙ্খলা এবং নব্যশিক্ষার সুযোগে ভারতবাসীদের মানসিক উৎকর্ষের পুনরভিব্যক্তি দেখা যাচ্ছে। আধুনিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও একজন ভারতীয় অধ্যাপক প্রবল বাধা-বিপত্তির মধ্যে গবেষণা করে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনে প্রদত্ত বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বিষয়ে অধ্যাপক বসুর বক্তৃতা অনেক দিক্‌পাল বিজ্ঞানীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেছে। তড়িৎ-বিজ্ঞানে কয়েকটি দুরূহ তথ্যানুসন্ধানে তিনি অল্প সময়ের মধ্যে যে সাফল্য লাভ করেছেন, সে কথা স্মরণ করে আমরা অধ্যাপক বসুর ধৈর্য ও অসাধারণ শক্তির প্রশংসা না করে পারি না। তার চেয়েও বড় কথা, এই সব সার্থক গবেষণা করা হয়েছে তাঁর কর্মব্যস্ত অধ্যাপক-জীবনের দুর্লভ অবসর সময়ে। একজন সামান্য মিস্ত্রীর সাহায্য নিয়ে তাঁকে অতি জটিল, সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈরী করে নিতে হয়েছে। ইংল্যাণ্ডের প্রতিটি বিজ্ঞানকর্মীর মত তিনি যদি

and this alone will be a priceless benefit to the human race."
—Daily Chronicle, 28th November, 1896.

আধুনিক উপকরণে সজ্জিত ইউরোপীয় গবেষণাগারে কাজ করবার সুযোগ পেতেন, তাঁকে ঘিরে যদি বিজ্ঞান-সচেতন জনমণ্ডলী ও উৎসাহী সহকর্মীর পরিবেশ গড়ে উঠতো, যেখানে তিনি নিজেকে একান্তভাবে নিঃসঙ্গ মনে না করতেন, তবে আজ আমরা অপরিমেয় সাফল্য দেখতে পেতাম।"[১]

---

১। "The nationality of great men—though often the cause of much argument and pen-warfare—is in itself a matter of no importance, for, in reality, they have neither nationality, individuality, nor age—they are citizens of the world. . . . . India . . . . hitherto been regarded as a land of romance . . . . Her people we looked upon as highly imaginative, but devoid of thoroughness and practicability. We seem to have forgotten the stately colleges of their long past ages, their great philosophers and learned men, the result of whose researches in astronomy, mathematics and abstract thought has filtered down to us through the Arabs and Greeks. For many years the intellectual progress of India was hindered by foreign invasions and internal hostilities, but now, favoured with a period of peace and advantages of education, mental activity is re-asserting itself. Even in the domain of modern sciences, working under insuperable difficulties, an Indian Professor has done remarkable work, and his paper on Electric Waves, read before the British Association, caused quite a sensation among the many distinguished European savants present. . . . . We cannot help admiring the patience and extra-ordinary ability of our Indian Scientist when we remember that in the course of less than eighteen months he has brought to a successful conclusion six very important investigations on subjects the most difficult in electrical science. It is all the

ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনে বক্তৃতার পরে বসুদম্পতি নানাস্থানে সান্ধ্য ভোজে নিমন্ত্রিত হন। লর্ড কেল্‌ভিন সস্ত্রীক জগদীশচন্দ্রকে তাঁর গ্লাসগোর বাড়ীতে সাদর আমন্ত্রণ জানান। প্রখ্যাত রসায়ন-বিজ্ঞানী ডক্টর গ্ল্যাডস্টোনের বাড়ীতে ভোজসভা। বসুদম্পতি আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। এই ভোজসভার উপভোগ্য কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন অবলা বসু—"শুনিলাম একজন নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক (যাঁহাকে ভারতসচিব বিশেষজ্ঞরূপে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়াছিলেন) পার্শ্বস্থ বন্ধুকে বলিতেছেন—'এই চন্দ্র বসু লোকটি, যাঁহার কথা আজকাল লোকে এত বলিতেছে, সে কে হে? ভারতীয় লোক আবার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিবে? অসম্ভব! ··· ভারতবাসী নকলে মজবুত, কিন্তু বিচারবুদ্ধি খাটাইয়া হাতে-কলমে ব্যবহার তো কখনো করিতে পারে না!' পার্শ্বের লোকটি বিখ্যাত রাসায়নিক র‍্যামজে। তিনি বলিলেন—'চুপ কর, তুমি কিছু জান না—ভারতবাসী বহু শতাব্দীর সাধনায় তাহাদের চিন্তাশক্তি এত প্রখর করিয়াছে যে, চিন্তাশীলতায় তাহাদের সমকক্ষ হইতে আমাদের বহুদিন লাগিবে। আমাদের সৌভাগ্য যে, ইহারা এ-পর্যন্ত নিজের হাতে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করে নাই। যখন

---

more remarkable that all this has been accomplished in odd hours snatched from his incessant duties as a Professor. He had to design the most elaborate apparatus out of the crudest material, and with only such help as could be rendered by an ordinary mechanic. If he had the advantages that a European Laboratory affords, and the appliances at his disposal which every scientific man in England has, had he been surrounded by a scientific public and kindred workers, to take away the feeling of utter loneliness, we should have seen an extraordinary amount of successful activity."—Pearson's Magazine, December, 1896.

শিখিবে, তখন ব্রিটেনের আধিপত্য চলিয়া যাইবে। তবে এই 'চন্দ্র বসু' দৈবক্রমে এইরূপ সার্থকতা লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সিদ্ধিতে আমাদের ভয়ের কারণ নাই।"[১] ডক্টর গ্ল্যাডস্টোন বিপত্নীক, কুমারী জ্যেষ্ঠা কন্যা তাঁর দেখাশুনা করতেন। গ্ল্যাডস্টোন পরিবারের সঙ্গে বসুদম্পতির খুবই অন্তরঙ্গতা হয়।

## রয়্যাল ইন্‌স্টিটিউশনে শুক্রবাসরীয় সান্ধ্য বক্তৃতা

জগদীশচন্দ্রের গবেষণা বিজ্ঞানী-মহলে এমন একটা অভাবনীয় উৎসাহের সঞ্চার করে যে, ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনে বক্তৃতার অব্যবহিত পরে তিনি রয়্যাল ইন্‌স্টিটিউশনে শুক্রবাসরীয় সান্ধ্য বক্তৃতা ( Friday Evening Discourse ) দেবার জন্যে আমন্ত্রিত হন। ৩রা নভেম্বর তারিখে ইন্‌স্টিটিউশনের সম্পাদক ব্র্যাস্‌ওয়েল কর্তৃক লিখিত আমন্ত্রণ-পত্র—"ইংল্যাণ্ড পরিত্যাগের পূর্বে আগামী প্রাক্‌-ইস্টার অধিবেশনে আপনি বিদ্যুৎ-রশ্মির উপর আপনার বহু-আলোচিত গবেষণা সম্বন্ধে সান্ধ্য বক্তৃতা দিলে ইন্‌স্টিটিউশনের কর্তৃপক্ষ বিশেষ আনন্দিত হবেন।" পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানী-সমাজে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত ঘোষণার পক্ষে তখনকার দিনে রয়্যাল ইন্‌স্টিটিউশন ছিল অন্যতম প্রশস্ত ক্ষেত্র। এই সম্মান-সূচক আমন্ত্রণে ইণ্ডিয়া অফিস থেকে জগদীশচন্দ্রের ডেপুটেশনের সময় আরো তিনমাস বাড়িয়ে দেওয়া হলো, অভিভাষণ প্রস্তুতির জন্যে। পরবর্তী ২৯শে জানুয়ারী ( ১৮৯৭ ) তারিখে জগদীশচন্দ্র পূর্ব নির্ধারিত এই বক্তৃতা দেন।[২]

সার জেম্‌স্‌ ডেওয়ার গ্যাসের তরলীকরণ সম্পর্কিত গবেষণায় বিখ্যাত। তিনি রয়্যাল ইন্‌স্টিটিউশনের উপর তলাতেই থাকতেন। বক্তৃতার দিন এক সান্ধ্যভোজের আয়োজন করে তিনি সম্মানিত অতিথিদের সঙ্গে বসুদম্পতির পরিচয় করিয়ে দেন। তারপর ডেভি

---

১। 'বাঙ্গালী মহিলার বিলাত ভ্রমণ'—অবলা বসু; প্রবাসী—বৈশাখ, ১৩৩২

২। "On the polarisation of electric rays".

ও ফ্যারাডের সযত্ন রক্ষিত যন্ত্রপাতির প্রদর্শনী দেখে সবাই আসেন বক্তৃতা-কক্ষে। বক্তৃতাশেষে লর্ড র‍্যালে বলেন—"এরূপ নির্ভুল পরীক্ষা কখনো হয় নি—দু'একটি ভুল হলে মনে হতো জিনিষটা বাস্তব, কিন্তু এ যেন মায়াজাল।"

*Pall Mall Gazette*, *Electrical Engineer*, *Spectator* প্রভৃতি পত্রিকায় রয়্যাল ইনস্টিটিউশনে প্রদত্ত বক্তৃতা সম্পর্কে সপ্রশংস আলোচনা প্রকাশিত হয়। *Spectator* পত্রিকাকে ভারতীয়গণের কর্মপ্রয়াস সম্বন্ধে বরাবর বিরূপ সমালোচনায় মুখর দেখা গেছে। কিন্তু রয়্যাল ইনস্টিটিউশনের সেদিনকার সান্ধ্য ভাষণের পর এই পত্রিকার সম্পাদক আবেগময়ী ভাষায় জগদীশচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। সে অভিনন্দনের মর্ম-উদ্ধৃতি[১] এইরূপ :

"লণ্ডন মহানগরীতে একজন তরুণ বাঙ্গালী আধুনিক জড়-বিজ্ঞানের এক দুরূহ বিষয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন, আর ইউরোপের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরা বিমুগ্ধ হয়ে শুনছেন, আমাদের অভিজ্ঞতায় এই দৃশ্য দুর্লভ। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ও ধৈর্যসাধ্য পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যে বিজ্ঞানী-গোষ্ঠী

---

১। "There is, however, to our thinking something of rare interest in the spectacle there presented, of a Bengali of the purest descent lecturing in London to an audience of appreciative European savants upon one of the most recondite branches of modern physical science. It suggests at least the possibility that we may one day see an invaluable addition to the great army of those who are trying by acute observation and patient experiment to wring from Nature some of her most jealously guarded secrets. The people of the East have just the burning imagination which could extort a truth out of a mass of apparently disconnected facts, a habit of meditation without allowing the mind to

প্রকৃতির গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করবার চেষ্টা করছেন, তাঁদের সঙ্গে এক নতুন সত্যসন্ধানী পুরুষের সহযোগ ঘটবে—আজকের সান্ধ্য সম্মিলনে তারই সম্ভাবনা সূচিত হয়েছে। প্রাচ্যের মানুষের আছে সেই কল্পনা—যে কল্পনা আপাত অসংলগ্ন ঘটনার মধ্যে সত্যের সন্ধান পায়; আছে সেই মননশক্তি—যা চিত্তকে বিক্ষিপ্ত হতে দেয় না; আছে একাগ্রতা—ধৈর্য থেকে কিছুটা আলাদা যে বৃত্তি ইউরোপীয় মনে একান্ত দুর্লভ। অধ্যাপক বসু যদি তাঁর বিজ্ঞান-কল্পনায় মানুষের অজ্ঞাত কোন বিস্ময়কর রশ্মির সন্ধান পেয়ে থাকেন, তবে তার স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্যে তিনি নিরন্তর সাধনা করে যাবেন এবং জীবনের অন্তিম মুহূর্তে সে অসমাপ্ত কর্মভার তুলে দিয়ে যাবেন যোগ্য উত্তরসাধকের

dissipate itself and a power of persistence—it is something a little different from patience—such as hardly belongs to any European. We do not know Professor Bose, but we venture to say that if he caught with his scientific imagination, a glimpse of a wonder-working "ray" as yet unknown to man . . . ., and believed that experiment would reveal its properties and potentialities, he would go on experimenting ceaselessly through a long life, and, dying, hand on his task to some successor. Nothing would seem to him laborious in his inquiry, nothing insignificant, nothing painful, any more than it would seem to the true Sanyasi in the pursuit of his inquiry into the ultimate relation of his own spirit to that of the Divine. Just think what kind of addition to the means of investigation would be made by the arrival within that sphere of inquiry of a thousand men with the Sanyasi mind, the mind which utterly controls the body and can meditate and inquire endlessly while life remains, never for a moment losing sight of the object, never for a

হাতে। এই দুঃসাধ্য সাধনে কিছুই তাঁর কাছে ক্লান্তিকর, নিরর্থক বা বেদনাদায়ক মনে হবে না, যেমন মনে হয় না আপন আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে যোগসন্ধানী প্রকৃত সন্ন্যাসীর। কল্পনা করুন সেই দিনের, যেদিন নব্য জড়বিজ্ঞানের সাধনায় যোগ দেবে সহস্র সহস্র এশিয়াবাসী এমনি সন্ন্যাসী-মন নিয়ে, যে মন দেহকে পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করে, যতক্ষণ জীবন থাকে ধ্যান করে পরম সত্যের, পার্থিব প্রলোভনে ভ্রষ্ট হয় না লক্ষ্যপথ থেকে। তবে আপাততঃ কোন কারণ দেখছি না, কেনই বা তারা অমৃতরসের দুঃসাধ্য অন্বেষণ ছেড়ে জড়বিজ্ঞানের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হবে! তবে তাও যে একেবারে অসম্ভব নয়, অধ্যাপক বসু তার পূর্বাভাস দিয়েছেন। সেদিন মানবজাতির মানসিক শক্তি অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধি পাবে।"

এই ভবিষ্যদ্‌বাণী সার্থক হয়েছে। উদ্ভিদ-জীবন সম্পর্কিত গবেষণায় জগদীশচন্দ্রের কৃতিত্বে যেদিন পৃথিবীর বিজ্ঞানী-সমাজ বিস্মিত, সেদিন স্পেক্টেটর পত্রিকা গর্ব করে লিখেছিলেন—"আমাদের ভবিষ্যদ্‌বাণীকে অধ্যাপক বসু সার্থক করেছেন। তিন সহস্র বৎসরের ভারতীয় সংস্কৃতি এমন এক বৈজ্ঞানিক প্রতিভারূপে বিকশিত হয়েছে, পাশ্চাত্ত্য

---

moment letting it to be obscured by any terrestrial temptation. . . . . We can see no reason whatever why the Asiatic mind, turning from its absorption in insoluble problems, . . . . should betake itself ardently, thirstily, hungrily, to the research into Nature which can never end, yet is always yielding results, often evil as well as good. If that happened —and Professor Bose is at all events a living evidence that it can happen, that we are not imagining an impossibility—that would be the greatest addition ever made to the sum of the mental force of mankind in that one special and of course most profitable direction."—*Spectator,* February 6, 1897.

দেশে যার তুলনা নেই। জৈবক্রিয়ার গবেষণায় অধ্যাপক বসু বর্তমান যুগে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।"[১]

লণ্ডন পরিত্যাগের পূর্বমুহূর্তে জগদীশচন্দ্র বিদ্যুৎ-রশ্মি সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার জন্যে ইম্‌পিরিয়াল ইন্‌স্টিটিউটে আমন্ত্রিত হন। ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখের এই বক্তৃতা-সভায় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ সার হেনরি রস্‌কো জগদীশচন্দ্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং তাঁর গবেষণার সম্ভাব্য সার্থকতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বোম্বাইয়ের প্রাক্তন লাট লর্ড রিয়ে এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন— "বিজ্ঞান আন্তর্জাতিক ও সার্বজনীন। সুতরাং ব্রিটিশ বিজ্ঞান বা ভারতীয় বিজ্ঞান বলে কোন স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি না করে জগদীশচন্দ্রকে তাঁর গবেষণার জন্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়া উচিত।"

ইংল্যাণ্ডের খ্যাতনামা বিজ্ঞানীরা জগদীশচন্দ্রের গবেষণার যে মূল্য উপলব্ধি করেছিলেন, তা শুধু মৌখিক অভিনন্দনের উচ্ছ্বাসেই প্রকাশ পায় নি। লর্ড কেল্‌ভিন প্রেসিডেন্সি কলেজে গবেষণাগার স্থাপন সম্পর্কে ভারতসচিবের কাছে যে আবেদন জানিয়েছিলেন, সে কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এবার বহুসংখ্যক প্রথম শ্রেণীর ব্রিটিশ বিজ্ঞানী নিয়ে গঠিত এক প্রতিনিধিদল ভারতসচিবের সঙ্গে দেখা করেন। রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি লর্ড লিস্টার ছিলেন এই প্রতিনিধিদলের নেতা। পদার্থ-বিজ্ঞানের গবেষণার উন্নতিকল্পে কলকাতায় অধ্যাপক বসুর পরিচালনাধীনে একটি কেন্দ্রীয় গবেষণাগার

---

১। "The prediction has been justified in him. The culture of thirty centuries has blossomed into a scientific brain of an order which we cannot quite duplicate in the West. He is a prince among physiological research workers and a prophet of this age, which has brought so many new powers to life."—Spectator.

প্রতিষ্ঠার একান্ত প্রয়োজন—এই মর্মে এক স্মারকলিপি পেশ করা হয়। লর্ড লিস্টার, লর্ড কেল্‌ভিন, সার হেনরি রস্‌কো, সার উইলিয়াম র‍্যাম্‌জে, সার জি. জি. স্টোক্‌স্‌ প্রমুখ বিজ্ঞানীরা এই স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করেন। পার্লামেণ্টের বহু প্রভাবশালী সদস্য এই পরিকল্পনা সমর্থন করেছিলেন।

স্মারকলিপির মর্মানুসারে ভারতসচিব চল্লিশ হাজার পাউণ্ড ব্যয়ে কলকাতায় একটি গবেষণাগার স্থাপনের সুপারিশ করে ভারত সরকারকে চিঠি লেখেন। এই সুপারিশ আংশিকভাবে কার্যকরী হয়েছিল। গবেষণার জন্যে জগদীশচন্দ্রকে বাংলা সরকারের পক্ষ থেকে আড়াই হাজার টাকা ও ভারত সরকারের পক্ষ থেকে দু-হাজার টাকা বার্ষিক অর্থ-সাহায্য মঞ্জুর করা হয়।

ইংল্যাণ্ডে অবস্থান কালেই জগদীশচন্দ্র আয়ারল্যাণ্ডের বেল্‌ফাস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এভারেটের কাছ থেকে সেখানকার একটি বিজ্ঞান-সমিতিতে বক্তৃতা দেবার জন্যে এক আমন্ত্রণ-লিপি পান। কিন্তু সময়াভাবে তিনি সে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেন নি। ইংল্যাণ্ড ভ্রমণ শেষ করে জগদীশচন্দ্র আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে ফ্রান্স ও জার্মেনীর বিভিন্ন বিদ্যালয় ও বিজ্ঞানসংস্থা পরিদর্শন করেন। জগদীশচন্দ্র ৫ই মার্চ তারিখে বার্লিনের বিজ্ঞান-পরিষদে (Physikalische Gesselschaft) যে বক্তৃতা দেন, তা শোনবার জন্যে দূরবর্তী হাইডেলবার্গ থেকে এসেছিলেন বৃদ্ধ অধ্যাপক কুইংকে। এপ্রিল মাসে বিজ্ঞান-পরিষদের মুখপত্রে জগদীশচন্দ্রের গবেষণার এক সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক কুইংকের আমন্ত্রণে জগদীশচন্দ্র হাইডেলবার্গে তাঁর গবেষণাগার দেখতে যান। সেখানে লেনার্ড প্রমুখ খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয় হয়। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মার্চ তারিখে তিনি সরবোঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের সমক্ষে এক বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল বিদ্যুৎ-রশ্মির প্রতিফলন, প্রতিসরণ ও সমবর্তন। এই বক্তৃতা এমনি মনোজ্ঞ

হয়েছিল যে, পরবর্তী ২২শে মার্চ তারিখে পদার্থ-বিজ্ঞান সমিতিতে ( Société de Physique ) তার পুনরাবৃত্তি করতে হয়। এই বিজ্ঞানী-সভায় উপস্থিত ছিলেন ফরাসী বিজ্ঞান-পরিষদ ( L' Academie des Sciences )-এর প্রাক্তন সভাপতি অধ্যাপক কর্নু, লিপ্‌ম্যান, পোঁয়াকারে, কেইলেটেট, বেকেরেল প্রমুখ বিজ্ঞানিবৃন্দ। এঁরা সকলে জগদীশচন্দ্রের গবেষণার ভূয়সী প্রশংসা করেন। অধ্যাপক কর্নু জগদীশচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছিলেন—"বিজ্ঞানে প্রগতি-সাধনের যে শক্তি আপনার মধ্যে আছে, আপনার প্রারম্ভিক গবেষণাই তার পরিচয় বহন করছে। দু-হাজার বছর আগে আপনার পূর্বপুরুষগণ মানবসভ্যতায় পুরোবর্তী ছিলেন, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আলোক-বর্তিকা তুলেছিলেন ঊর্ধ্বে। আপনি সে মহান ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করুন। আমরা আপনার সাফল্য কামনা করি।" জগদীশচন্দ্রকে সে বার Société de Phsique-এর সভ্যপদ দিয়ে সম্মানিত করা হয়। ইউরোপ পরিভ্রমণের শেষে তিনি মার্শেল্‌স্ হয়ে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।

এরূপ আশাতীত সাফল্যের মধ্যে ইউরোপে জগদীশচন্দ্রের প্রথম বৈজ্ঞানিক মিশনের পরিসমাপ্তি ঘটে। উচ্চতর বিজ্ঞান-অনুশীলনে ভারতীয়দের অক্ষমতা সম্বন্ধে ইউরোপীয়দের মনে যে ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল, জগদীশচন্দ্র তা দূর করতে সক্ষম হন। শুধু তাই নয়, যে জড়বিজ্ঞানের চর্চাকে ভারতবর্ষের ঐতিহ্য-বিরোধী মনে করা হতো, নবভারতে তিনি তার উদ্‌বোধন করেন।

## পঞ্চম অধ্যায়

# সুহৃদ-প্রীতি

### রবীন্দ্র-সৌহৃদ্যের সূচনা

জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গতা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে প্যাট্রিক গেডিস লিখেছেন—সাফল্যমণ্ডিত ইউরোপ পরিভ্রমণের পর ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে জগদীশচন্দ্র দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। রবীন্দ্রনাথ তখন এই বিজয়ী বিজ্ঞানীকে অভিনন্দন জানাতে তাঁর বাসগৃহে আসেন। জগদীশচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে শ্রদ্ধা ও প্রীতির অর্ঘ্যস্বরূপ কবি তাঁর টেবিলের উপরে একটি ম্যাগ্‌নোলিয়া ফুল রেখে যান।[১] সম্ভবতঃ এই ঘটনাকে উপলক্ষ করেই জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রীতির সম্পর্কের সূচনা হয়। জগদীশচন্দ্র এই সময় ১৩৯, ধর্মতলা স্ট্রীটে আনন্দ-মোহন বসুর বাড়ীতে থাকতেন।[২] এই বন্ধুত্ব-সূচনাকালের একমাত্র নিদর্শন পাওয়া যায়, লণ্ডন-প্রবাস থেকে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জগদীশচন্দ্রের পত্রে ( ২রা নভেম্বর, ১৯০০ )—"তিন বৎসর পূর্ব্বে আমি তোমার নিকট একপ্রকার অপরিচিত ছিলাম। তুমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ডাকিলে। তারপর একটি একটি করিয়া তোমাদের

---

১। The Life and Works of Sir Jagadish C. Bose (1920), Patrick Geddes, পৃঃ ২২২।

২। প্রবাসী পত্রিকায় ১৩৩৩ সালের জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জগদীশচন্দ্রের পত্রাবলীর ধারাবাহিক প্রকাশ আরম্ভ হয়। তার অবতরণিকা স্বরূপ 'পত্রপরিচয়ে' রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"সেই তাঁর ধর্মতলার বাসা থেকে আরম্ভ করে আমাদের নির্জ্জন পদ্মাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত বন্ধুলীলার ছবি।"

অনেকের স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ হইলাম। তোমাদের উৎসাহ-ধ্বনিতে মাতৃস্বর শুনিলাম।"[১]

জীবনের দুই ভিন্ন বৃত্তপথের এই পথিকদ্বয়ের মধ্যে যে দুর্লভ মিলন ঘটেছিল, তাকে স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন···"চলা আর পথ বাঁধা এই দুই উদ্যোগের সব্যসাচিতায় জীবন ছিল সদাই চঞ্চল। এমন সময়ে জগদীশের সঙ্গে আমার প্রথম মিলন। তিনি তখন চূড়ার উপর উঠেন নি। পূর্ব উদয়াচলের ছায়ার দিক্‌টা থেকেই ঢালু চড়াই পথে যাত্রা করে চলেছেন, কীর্তি-সূর্য আপন সহস্র কিরণ দিয়ে তাঁর সফলতাকে দীপ্যমান করে তোলে নি। তখনো অনেক বাধা, অনেক সংশয়। কিন্তু নিজের শক্তিস্ফুরণের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের যে আনন্দ সে যেন যৌবনের প্রথম প্রেমের আনন্দের মতই আগুনে ভরা, বিঘ্নের পীড়নে দুঃখের তাপে সেই আনন্দকে আরো নিবিড় করে তোলে। প্রবল সুখদুঃখের দেবাসুরেরা মিলে অমৃতের জন্য যখন জগদীশের তরুণ শক্তিকে মন্থন করছিল সেই সময় আমি তাঁর খুব কাছে এসেছি।"[২] এরপর উভয়ের ক্রমপরিবর্তিত জীবনে দীর্ঘকাল ধরে যে পত্রালাপ হয়েছে, তাতে প্রথম বন্ধুত্বের স্বতঃচিহ্নিত পরিচয় অম্লান মাধুর্যে অঙ্কিত হয়ে আছে। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনায় সাফল্যের জন্যে বারে বারে গদ্যে-পদ্যে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতায়[৩] জগদীশচন্দ্রের প্রথম বৈজ্ঞানিক মিশনের সফলতা পরিকীর্তিত হয়।

---

১। প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৩৩; পৃঃ ৪১২।

২। 'পত্র-পরিচয়', প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩।

৩। 'অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের প্রতি' শীর্ষক এই কবিতাটি ('বিজ্ঞানলক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিমমন্দিরে') মাঘ, ১৩০৪ সংখ্যার 'প্রদীপ' পত্রে প্রকাশিত হয়। পরে 'জগদীশচন্দ্র বসু' শিরোনামায় আলোচ্য কবিতাটি 'কল্পনা' গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয়ের পরে জগদীশচন্দ্র ৮৫, আপার সার্কুলার রোডের বাড়ীতে কিছুদিন বাস করেন। এই বাড়ীতেই জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে কবিবন্ধুর পরিচয় নিবিড়তর হয়। রবীন্দ্রনাথ, শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রফুল্লচন্দ্র, ডক্টর নীলরতন সরকার, লোকেন পালিত প্রভৃতি অনেকেই নিয়মিতভাবে এখানে আসতেন। অন্তরঙ্গ আলাপ-আলোচনার মধ্যে অনেকদিন কেটেছে। রবীন্দ্রনাথ একাধিক পত্রে এই সার্কুলার রোডের বাড়ীতে বন্ধুদম্পতির প্রীতিপূর্ণ সাহচর্যের কথা উল্লেখ করেছেন। ইংল্যাণ্ড-প্রবাসী জগদীশচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ এই মধুর স্মৃতির কথা উল্লেখ করেছেন এক চিঠিতে—"কলকাতায় আমার সুখ নেই। পূর্বে এখানে যখন আসতুম তোমাদের ওখানেই সর্বপ্রথমে ছুটে যেতুম, এবারে সেরকম আগ্রহের সঙ্গে কোনখানে যাবার নেই। আজ প্রভাতেই তোমার চিঠিখানি পেয়ে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হল—তোমার সেই ছোট ঘরটি থেকে তোমার আলাপ গুঞ্জন যেমন আমি হৃদয়ে পূর্ণ করে নিয়ে আসতুম নিজেকে আজও সেইরকম পূর্ণ বোধ করচি।"[১] অপর এক পত্রে রয়েছে—"তোমার সার্কুলার রোডের সেই ক্ষুদ্র কক্ষটি এবং নীচের তলায় মাছের ঝোলের আস্বাদন সর্বদাই মনে পড়ে।" ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে সার্কুলার রোডের এই বাড়ীতে প্লেগে আক্রান্ত হয়ে একজন ভৃত্য মারা যায়। তাই জগদীশচন্দ্র ধর্মতলার বাসায় ফিরে যান এবং দ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক মিশন উপলক্ষে ইউরোপ যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত সেখানেই থাকেন।

### রেশম-কীট পালনে উৎসাহ

ইতিহাসবেত্তা অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় রেশম-শিল্প প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্‌যোক্তা ছিলেন। রবীন্দ্রনাথও তখন পল্লী-শিল্প পুনঃপ্রবর্তনের নানাবিধ কল্পনায় উৎসুক। উভয়ের মধ্যে যে সৌহৃদ্য ছিল, সেই

---

১। 'চিঠিপত্র' ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৫ দ্রষ্টব্য।

নীলরতন সরকার

সূত্রে রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহের বাড়ীতে রেশম-কীটের চাষ সুরু হয়। সম্ভবতঃ কবিবন্ধুর উৎসাহেই জগদীশচন্দ্রও তাঁর সার্কুলার রোডের বাড়ীতে রেশম-কীট পালনে মেতে ওঠেন। রবীন্দ্রনাথের ভরসা ছিল তাঁর পুত্রকন্যাদের গৃহশিক্ষক অত্যুৎসাহী লরেন্স—যিনি আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করে কীটের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু জগদীশচন্দ্র ছিলেন একেবারে অসহায়। তিনি রেশম-কীটের শোচনীয় পরিণামের কথা লিখে জানাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথকে—( ২৫শে এপ্রিল, ১৮৯৯ ) "কয়দিন হইল একটি প্রজাপতি সুস্থ শরীরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহার পর ২।৩টি অর্দ্ধমৃত অবস্থায় জন্মিয়াছে, আর কয়টি অর্দ্ধেক বাহির হইয়া রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় কি করিতে হইবে জানি না। যে একটি সুস্থ শরীরে বাহির হইয়াছিল, তাহাকে কি আহার দিতে হইবে জানি না। অনেক পুষ্প সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি, কিন্তু মধু সঞ্চয় করিতে তাহার কোন আগ্রহ নাই। কোন বন্ধু আমের চাট্‌নী দিতে বলিয়াছেন।"

বছরখানেক পরের কথা। ইতিমধ্যে জগদীশচন্দ্র কয়েকদিনের জন্যে শিলাইদহে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে রবীন্দ্রনাথের রেশম-কীট পালনাগারের তত্ত্বাবধায়ক লরেন্স সাহেবের সঙ্গে হয়তো এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। সেখান থেকে ফিরে আসবার কিছুদিন পরে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন—( মার্চ, ১৯০০ ) "প্রজাপতিগুলি এখনও জন্মগ্রহণ করে নাই। গত শনিবার হইতে প্রত্যহ গুটিগুলিকে নাড়িয়া দেখিতেছি, ভিতরে যেন পূর্ণতর হইয়া আসিতেছে। আশঙ্কা হয়, এত ঘন ঘন কম্পনে প্রাণবায়ু হয়ত বাহির হইয়া গিয়াছে। তাহা হইলেও একরূপ নিশ্চিন্ত হইতাম, কারণ যে এরণ্ড বৃক্ষের কথা বলিয়াছিলাম তাহার পাতাগুলি একেবারে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এই দুর্ভিক্ষের সময় সহসা প্রজাবৃদ্ধি মনে করিয়া ভীত আছি। বিশেষতঃ লরেন্স সাহেবের নিকট আমি কি করিয়া মুখ দেখাইব জানি না।"

## ভগিনী নিবেদিতা ও মিসেস ওলে বুলের সঙ্গে পরিচয়

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ। এই বছর স্বামী বিবেকানন্দের দু'জন বিদেশিনী শিষ্যার সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের পরিচয় হয়। এঁরা হলেন ভগিনী নিবেদিতা (মিস মার্গারেট নোবল) ও মিসেস ওলে বুল। বছর দুয়েক আগে লণ্ডনে এক বক্তৃতা-সভায় স্বামিজীর সঙ্গে মিস নোবলের প্রথম আলাপ হয় এবং স্বামিজীর চরিত্র-মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। তারপর একদিন পাশ্চাত্ত্য সমাজের যাবতীয় বন্ধন উপেক্ষা করে তিনি চলে আসেন ভারতবর্ষে। বিবেকানন্দের মানসকন্যা এই মিস নোবল ভগিনী নিবেদিতা নাম গ্রহণ করে নিজেকে উৎসর্গ করেন জনকল্যাণ ব্রতে। প্রায় একই সময়ে (ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৮) আমেরিকা থেকে মিসেস ওলে বুল গুরুদেবের জন্মভূমি পরিদর্শন, ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ ও নবীন-সঙ্ঘের কাজে আত্মনিয়োগ করবার উদ্দেশ্যে কলকাতায় আসেন। মিসেস বুলের স্বামী ছিলেন নরওয়ের একজন প্রখ্যাত বেহালাবাদক এবং গণিতবিদ্। নরওয়ের সাহিত্য ও সঙ্গীতের একটি উজ্জ্বল অধ্যায়ের সৃষ্টি হয়েছিল তাঁরই অনুপ্রেরণায়। একদিন ভগিনী নিবেদিতা ও মিসেস বুল জগদীশচন্দ্রের গবেষণা সম্বন্ধে একটা সশ্রদ্ধ কৌতূহল নিয়ে তাঁর পরীক্ষাগার দেখতে আসেন। এই পরিচয় ক্রমে পারিবারিক অন্তরঙ্গতায় পরিণতি লাভ করে।

জগদীশচন্দ্রের মধ্যবর্তিতায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও ভগিনী নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল এবং তিনি একবার শিলাইদহে কবির আতিথ্যও গ্রহণ করেছিলেন। এই সৌহৃদ্য প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন (১৬ই জুন, ১৮৯৯)—

"I really wanted to add a new friend to those with which India has already blessed me, and you

arc so dear to my friend Dr. Bose, that I cd. not help hoping you sd. be my friend too !"[১]

গবেষণার প্রাথমিক পর্যায়ে জগদীশচন্দ্র যে দুর্জয় সঙ্কল্প নিয়ে বাধা-বিঘ্নিত পথে এগিয়ে চলেছিলেন, ভগিনী নিবেদিতাকে তা মুগ্ধ করে। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে জগদীশচন্দ্রের তৎকালীন গবেষণাধারার আনুপূর্বিক বিবরণ দিয়ে নিবেদিতা একখানি পত্র লিখেছিলেন ( ১৮ই এপ্রিল, ১৯০৩ )। এই পত্রে তিনি জগদীশচন্দ্রের কর্মসাধনে অবাঞ্ছিত বাধাবিঘ্ন সম্বন্ধে আক্ষেপ প্রকাশ করেন।[২] স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার আত্মিক সম্পর্ক আরও গভীর হয়ে ওঠে। ১৯০৫ ও ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন, তখন আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে দূরে থেকেও বসুদম্পতির শুশ্রূষা ও সাহচর্যে বেশ নিরুদ্বেগেই ছিলেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে দার্জিলিঙে দ্বারকানাথ রায়ের[৩] গৃহে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এই অন্তিম মুহূর্তে বসুদম্পতি তাঁর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন।

ভগিনী নিবেদিতা প্রতিনিয়ত জগদীশচন্দ্রকে বিজ্ঞান সাধনায় উৎসাহিত করেছেন। তাঁর গবেষণার ফলাফল প্রকাশের কাজে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "এই সময়ে তাঁর কাজে ও রচনায় উৎসাহদাত্রীরূপে মূল্যবান সহায় তিনি পেয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতাকে। জগদীশচন্দ্রের জীবনের ইতিহাসে

১। 'চিঠিপত্র', ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৪৬

২। "Ah India! India! can you not give enough freedom to one of the greatest of your sons to enable him,—not to sit at ease, but—to go out & fight your battles where the fire is hottest & the labour most intense, and the contest raging thickest?"

৩। ডক্টর পি. কে. রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও অবলা বসুর ভগ্নীপতি।

এই মহনীয়া নারীর নাম সম্মানের সঙ্গে রক্ষার যোগ্য। তখন থেকে তাঁর কর্মজীবন সমস্ত বাহ্য বাধা অতিক্রম করে পরিব্যাপ্ত হোলো বিশ্বভূমিকায়।"[১]

ভগিনী নিবেদিতা যে জগদীশচন্দ্রকে সংঘাতমুখর পরিবেশের মধ্যে বিজ্ঞান-প্রচার ও আত্মপ্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত করেছিলেন শুধু তাই নয়, বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের মধ্যে যে সূক্ষ্ম শিল্পচেতনা ও ভারতীয় শিল্পরীতির প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছিল, তার মূলেও নিবেদিতার প্রভাব কম নয়। এই শিল্পানুরাগই একদিন ভারতীয় শিল্পধারায় 'রেনেসাঁর' ইতিহাসে স্মরণীয় শিল্পীত্রয় অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ ও নন্দলালের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের প্রীতিবন্ধন গড়ে তুলেছিল।

১। জগদীশচন্দ্র, প্রবাসী—পৌষ, ১৩৪৪।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

'এক প্রাণের লীলা জন্তু—জড়—জঙ্গমে'

—সত্যেন্দ্রনাথ

### গবেষণার ধারা পরিবর্তন

ইউরোপে প্রথম বৈজ্ঞানিক মিশনের অভাবনীয় সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে জগদীশচন্দ্র নতুন উদ্যমে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের গবেষণায় ব্যাপৃত হন। এই গবেষণার ফলাফল রয়্যাল সোসাইটির জার্ণালে ছটি নিবন্ধের আকারে প্রকাশিত হয় ( নভেম্বর, ১৮৯৭—ফেব্রুয়ারী, ১৯০০ )।[১] প্রকাশিত নিবন্ধ পাঠ করে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের বিজ্ঞান-কর্মিগণ জগদীশচন্দ্রের গবেষণায় কিরূপ আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন, ব্যক্তিগত পত্রালাপে তা প্রকাশ পেয়েছে। আমেরিকার মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গবেষক লিখেছিলেন ( ২৮শে অগাষ্ট, ১৮৯৭ )—"এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক হেন্‌রি কন্‌হার্টের নির্দেশে ক্ষুদ্রতর বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সাহায্যে আপনার পরীক্ষাগুলি পুনরাবৃত্তির চেষ্টা করেছি। পরীক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে যে চমকপ্রদ ফল পাওয়া গেছে, তা আপনাকে জানানো প্রয়োজন মনে করি। আগামী বছর এই সম্পর্কে আরও পরীক্ষা করতে চাই। আপনার কাছ থেকে কোন রকম নির্দেশ পেলে কৃতজ্ঞ থাকবো।" বেলফাস্ট কুইন্স কলেজের অধ্যাপক এভারেট ( ২২শে মার্চ, ১৮৯৮ ) এবং ডাবলিন থেকে অধ্যাপক টমাস প্রেস্‌টন ( ১৯শে এপ্রিল, ১৮৯৮ ) জগদীশচন্দ্রের গবেষণা ও নিবন্ধাবলী সম্বন্ধে গভীর ঔৎসুক্য প্রকাশ করে চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু এর অল্পদিন পরেই জগদীশচন্দ্রের

---

১। উল্লিখিত প্রবন্ধসমূহ ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে Collected Physical Papers নামক গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে।

গবেষণাধারায় একটা আকস্মিক পরিবর্তন হয় এবং সেই সঙ্গে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের স্বরূপ সন্ধানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ। বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সম্পর্কিত গবেষণায় ব্যাপৃত থাকবার কালে তিনি একদিন জড়বস্তুর মধ্যে প্রাণস্পন্দনের অনুরূপ সাড়া প্রত্যক্ষ করেন। গভীর বিস্ময়ে তিনি লক্ষ্য করেন—প্রাণীদের মত জড়বস্তুও বাইরের উত্তেজনায় সাড়া দেয় এবং একসময়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এই সংবেদনশীলতা ও ক্লান্তিবোধের অভিব্যক্তি আমাদের ইন্দ্রিয়ের আগোচর। বিদ্যুৎ-তরঙ্গ নিয়ে গবেষণা করবার সময় জগদীশচন্দ্র নিজের অজ্ঞাতসারে বিজ্ঞানের এক নতুন জগতে এসে পৌঁছেন। সে জগৎ জড় ও জীবের মধ্যবর্তী সীমারেখায় অবস্থিত। বিজ্ঞানের এই সীমান্ত রেখায় সুরু হলো জগদীশচন্দ্রের গবেষণার দ্বিতীয় পর্যায়।

## প্যারিসে আন্তর্জাতিক পদার্থ-বিজ্ঞান কংগ্রেসে আমন্ত্রণ

জড় ও জীবের মধ্যে যে গোপন ঐক্যের সন্ধান পাওয়া গেল, তাকে পাশ্চাত্ত্যের বিজ্ঞানী-মহলে প্রকাশ করবার জন্যে জগদীশচন্দ্র ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। কিছুদিন পরেই ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের বিখ্যাত প্যারিস-প্রদর্শনী। তার অন্যতম অঙ্গ হিসেবে এক আন্তর্জাতিক পদার্থ-বিজ্ঞান কংগ্রেসের আয়োজন করা হয়েছে। এই বিজ্ঞান-সভায় যোগ দেবার আমন্ত্রণ এসেছে জগদীশচন্দ্রের কাছে।

আমন্ত্রণপত্র পাবার পর জগদীশচন্দ্র বেলভেডিয়ারে লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভনর্ণর সার জন্ উড্‌বার্ণের সঙ্গে দেখা করেন। প্যারিস কংগ্রেসের আমন্ত্রণ সম্পর্কে কথা হলো। উড্‌বার্ণ জগদীশচন্দ্রকে বললেন, তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন, তবে প্যারিস-কংগ্রেসে যোগদান অনেকাংশে ভারতসচিবের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণরের সঙ্গে এই সাক্ষাৎকারের খবর শুনে ক্ষুব্ধ শিক্ষা-অধিকর্তা জগদীশচন্দ্রকে লিখে পাঠালেন—I am informed you had an interview

with the Lt. Governor and have asked to be deputed to Paris Exn., to attend a meeting of European Scientists. May I ask you to inform me of the reasons for making your request to His Honour ?

কয়েকদিন পরে সার জন্ প্রেসিডেন্সি কলেজে জগদীশচন্দ্রের গবেষণাগার দেখতে আসেন। তাঁর পরীক্ষাধারায় অতিশয় সন্তুষ্ট হয়ে তিনি ( লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্ণর ) কয়েকটি গবেষণাবৃত্তি মঞ্জুর করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে গভর্ণরের এই সৌহৃদ্যে শিক্ষা-অধিকর্তা ও প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ, উভয়ের মনোভাবের কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হলো। শিক্ষা-অধিকর্তা জগদীশচন্দ্রকে লিখলেন—আপনি আমার চিঠি ভুল বুঝেছেন, গভর্ণর আপনাকে প্যারিসে পাঠাতে চান। এই বিষয়ে রিপোর্ট চেয়েছেন, কাজেই এই সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাই। কিন্তু এই আলাপের মধ্যে তিনি শিক্ষা-অধিকর্তার যে মনোভাবের পরিচয় পেলেন, তাতে জগদীশচন্দ্র প্যারিস যাওয়া সম্বন্ধে একরকম হতাশ হয়ে পড়লেন।

এর কয়েকদিন পরে জগদীশচন্দ্র শিলাইদহে দিন দুয়েকের জন্যে রবীন্দ্রনাথের আতিথ্য গ্রহণ করেন। সেখান থেকে কলকাতায় ফিরে এসে তিনি শুনলেন—বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নাকি প্যারিস যাবার জন্যে তাঁর নাম উঠেছিল, কিন্তু 'প্রভুদের' তাদৃশ ইচ্ছা নেই। শেষ পর্যন্ত ভারতসচিবের কাছ থেকে অনুমোদনপত্র আসে জগদীশচন্দ্রের কাছে—জড়বস্তুর চেতনা সম্পর্কে তাঁর গবেষণার প্রচার ও স্বীকৃতির কথা বিবেচনা করে ভারত সরকার তাঁকে ইউরোপে পাঠানো সঙ্গত মনে করেন।

### ইউরোপ যাত্রা

নানা বাধাবিঘ্নের পর জুলাই মাসের প্রথম দিকে জগদীশচন্দ্র দ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক মিশনে ইউরোপ যাত্রা করেন। যাত্রার পূর্বমুহূর্তে

জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন (২৯শে জুন, ১৯০০)—"সম্মুখে অনেক আশা ও নৈরাশ্যের কারণ আছে। দেশ ছাড়িয়া যাইতেছি বলিয়া অবসাদে মন আক্রান্ত।" জগদীশচন্দ্র অগাস্ট মাসে প্যারিসে পৌঁছেন এবং যথাসময়ে বাংলা ও ভারত সরকারের প্রতিনিধিরূপে পদার্থ-বিজ্ঞান-সম্মেলনে যোগদান করেন। এখানেই বিজ্ঞান-জগতের কাছে তিনি প্রথম ঘোষণা করেন, জড়ের চেতনা সম্বন্ধে তাঁর বিস্ময়কর উপলব্ধির কথা।[১]

প্যারিসে পদার্থ-বিজ্ঞানীদের সেই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে জগদীশচন্দ্র বলেন—"জীব ও জড়ের মধ্যে যে প্রাণধর্মের লীলা চলছে, কোথাও তার ছেদ নেই। দুয়ের মধ্যে কোন স্পষ্ট সীমা নির্দেশ করা কঠিন—কোথায় জড়-প্রকৃতির শেষ, কোথায় জীবনধর্মের সুরু। অবশ্য যেমন মনগড়া অসংখ্য সীমারেখা টানা যায়, কোন একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেও তেমনি জীব ও জড়-প্রকৃতির আপাত-ব্যতিক্রমকে ব্যাখ্যা করা চলে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধানে বিজ্ঞানের যে স্বাভাবিক প্রবণতা, তাকেই শেষোক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গত কারণ হিসেবে উপস্থিত করা যায়।"

জগদীশচন্দ্রের এই বক্তৃতায় সমবেত বিজ্ঞানী-মণ্ডলীর বিস্ময়ের অন্ত রইলো না। সেদিনের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আর এক বাঙালী মনীষী, স্বামী বিবেকানন্দ। জগদীশচন্দ্রের সেই কৃতিত্বের কথা তিনি 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে গর্বভরে উল্লেখ করেছেন—

"আজ ২৩শে অক্টোবর ও কাল সন্ধ্যার সময় প্যারী হতে বিদায়। এ বৎসর প্যারী সভ্যজগতের এক কেন্দ্র, এ বৎসর মহাপ্রদর্শনী। নানা দিক্‌দেশ-সমাগত সজ্জন সঙ্গম। দেশ-

---

১। প্যারিসে পদার্থ-বিজ্ঞান-সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধ—
"De la Géneralité des Phénoménes Moléculaires produits par l'Electricité sur la Matiére Inorganique et sur la Matiére Vivante"

দেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করেছেন আজ এ প্যারীতে। মহাকেন্দ্রের ভেরীধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদ-তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্বজনসমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আর আমার জন্মভূমি—এ জর্মান, ফরাসী, ইংরাজ, ইতালী প্রভৃতি বুধমণ্ডলী-মণ্ডিত মহারাজধানীতে তুমি কোথায় বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহু গৌরবর্ণ প্রতিভামণ্ডলীর মধ্য হতে এক যুবা যশস্বী বীর, বঙ্গভূমির, আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন—সে বীর জগৎ-প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে. সি. বোস। এক যুবা বাঙ্গালী বৈদ্যুতিক, আজ বিদ্যুৎবেগে পাশ্চাত্যমণ্ডলীকে নিজের প্রতিভা মহিমায় মুগ্ধ করলেন—সে বিদ্যুৎসঞ্চার মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবনতরঙ্গ সঞ্চার করলে। সমগ্র বৈদ্যুতিকমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ—জগদীশ বসু—ভারতবাসী, বঙ্গবাসী! ধন্য বীর! বসুজ ও তাঁহার সতী সাধ্বী সর্বগুণসম্পন্না গেহিনী যে দেশে যান, সেথাই ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন—বাঙ্গালীর গৌরব বর্ধন করেন। ধন্য দম্পতি!"[১]

ফ্রান্স পরিত্যাগ করবার পূর্বে জগদীশচন্দ্র সরবোঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং প্যারিসে পদার্থ—( Societe de Physique ) ও প্রাণী-বিজ্ঞান সভায় ( Societe de Zoologique ) বক্তৃতা দেন। এরপর তিনি ইংল্যাণ্ডে আসেন।

## ত্রিপুরাধিপতি রাধাকিশোর দেবমাণিক্য

জগদীশচন্দ্রের জীবনকাহিনী প্রসঙ্গে, বিশেষ করে তাঁর দ্বিতীয় বিজ্ঞান-যাত্রার উদ্যোগ পর্বে রাধাকিশোর দেবমাণিক্যের নাম শ্রদ্ধার

---

১। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার রচিত 'বিবেকানন্দ চরিত' ( ১৩৬১ ), ৩০৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

সঙ্গে স্মরণযোগ্য। উভয়ের মধ্যে পরিচয় সাধন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই প্রসঙ্গে মহিমচন্দ্র দেববর্মা 'দেশীয় রাজ্য' গ্রন্থে লিখেছেন—

"একবার কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র, রবিবাবু প্রভৃতি বন্ধুদিগকে স্বীয় গবেষণার ফলাফল দেখাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তখনও রাধাকিশোরের সহিত জগদীশবাবুর সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না।...১৯০০ খৃঃ অব্দের বিষয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাকে জানিতে দিয়াছিলেন, "...যদি তুমি পার উপস্থিত হইও।"...মহারাজ এই খবর পাইয়া বিনা নিমন্ত্রণে উক্ত কলেজের বিজ্ঞানাগারে যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিলেন। রবিবাবু মহারাজকে দেখিয়া পুলকিত হইলেন এবং আচার্য্য জগদীশ বসুর সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন।"[১]

এর কিছুদিন পরেই প্যারিসের বিজ্ঞানী-সম্মেলনে যোগ দেবার জন্যে জগদীশচন্দ্র তাঁর সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা অবলা বসুকে নিয়ে ইউরোপ যাত্রা করেন। ইউরোপ যাত্রার এই উদ্‌যোগপর্বে জগদীশচন্দ্র যে আর্থিক বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন, সে প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"এই সময় যখন জানতে পারলুম যাত্রার পাথেয় সম্পূর্ণ হয় নি, তখন আমাকে উদ্বিগ্ন করে তুললে।...দুর্ভাগ্যক্রমে আমার নিজের সামর্থ্যে তখন লেগেছে পুরো ভাঁটা।...অগত্যা সে দুঃসময়ে আমার একজন বন্ধুর শরণ নিতে হোলো।...তিনি ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর দেবমাণিক্য।"[২]

সে সময় যুবরাজ বীরেন্দ্রকিশোরের শুভ পরিণয়ের আয়োজন চলছে। রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনা শুনে তাঁর হাতে পনেরো হাজার টাকার চেক তুলে দিয়ে মহারাজ মৃদু হেসে বললেন—"বর্তমানে আমার ভাবী বধূমাতার দু'একপদ অলঙ্কার নাই বা হইল।" এই

১। চিঠিপত্র, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৮০

২। 'জগদীশচন্দ্র', প্রবাসী, পৌষ, ১৩৪৪

অর্থকে পাথেয় করে বসুদম্পতি ইউরোপ যাত্রা করেন। জগদীশচন্দ্রের জয়বার্তার প্রত্যাশায় ত্রিপুরাধিপতি উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকতেন। সুহৃদের এই প্রত্যাশাপূর্ণ শ্রদ্ধার উল্লেখ আছে রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে। রবীন্দ্রনাথ ইংল্যাণ্ড-প্রবাসী জগদীশচন্দ্রকে লিখছেন (অক্টোবর বা নভেম্বর, ১৯০০)—"ত্রিপুরমহারাজকে আপনার সমস্ত খবরই আমি পাঠাইয়া থাকি। আপনার প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাইয়া আমি বড়ই আনন্দলাভ করিয়াছি। তিনি বলিয়া পাঠাইয়াছেন, আপনার কার্য্যের সহায়তার জন্য তাঁহার পূর্বপ্রতিশ্রুতি দানের অপেক্ষা আরো অনেকটা দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।"

রবীন্দ্রনাথ অপর একপত্রে লিখছেন (২০শে নভেম্বর, ১৯০০)—

"ত্রিপুরার মহারাজা এখন কলকাতায়। তোমার সফলতায় তিনি যে কি রকম আন্তরিক আনন্দ অনুভব করেন তা তোমাকে আর কি বলব! বাস্তবিক তিনি যে হৃদয়ের সঙ্গে তোমাকে শ্রদ্ধা করেন এতেই তিনি বিশেষরূপে আমার হৃদয় আকর্ষণ করেছেন। আজ তোমার চিঠি নিয়ে তাঁর ওখানে যাব—তিনি খুব খুসী হবেন। তুমি তাঁকে অল্পদিন হল যে চিঠি লিখেছিলে সেখানি পেয়ে তিনি যেন বিশেষ সম্মানিত হয়ে উঠেছিলেন এমনি উৎফুল্ল হয়েছিলেন। কোনরূপ তোমাকে সহায়তা করবার জন্য তিনি যেন ব্যগ্র হয়ে আছেন।"

নিজের আর্থিক সঙ্গতি যখন ক্ষীণ, তখন প্রবাসী বিজ্ঞানী-বন্ধুর জয়যাত্রার পথকে বাধামুক্ত রাখবার যে ব্রত রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন, তাতে এই উদারচেতা পুরুষ ছিলেন প্রধান সহায়।

## রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রবাসী জগদীশচন্দ্রের পত্র-বিনিময়

ফরাসী ও ব্রিটিশ বিজ্ঞানী-মহলে তাঁর নতুন বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জগদীশচন্দ্র লণ্ডন থেকে লিখেছেন (৩১শে অগাস্ট, ১৯০০)—

"একদিন [প্যারিস] Congress-এর President হঠাৎ আমাকে বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। আমি কিছু কিছু বলিয়াছিলাম। তাহাতে অনেকে অতিশয় আশ্চর্য হইলেন। তারপর Congress-এর Secretary আমার সহিত দেখা করিতে আইসেন, এবং আমার কাজ লইয়া discussion করেন। এক ঘণ্টা পর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—But, monsieur, this is very beautiful (but-এর অর্থ আমি প্রথমে বিশ্বাস করি নাই)। তারপর আরও তিন দিন এ-সম্বন্ধে আলোচনা হয়, প্রত্যহই more and more excited—শেষ দিন আর নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিলেন না। Congress-এর অন্যান্য Secretary এবং President-এর নিকট অনর্গল ফরাসী ভাষায় আমার কার্য সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন।

"এই গেল প্যারিসের পালা। তাহার পর লণ্ডনে আসিয়াছি। এখানে একজন physiologist আমার কার্যের জনরব শুনিয়াই বলিলেন যে, সে কখনও হইতে পারে না, there is nothing common between the living and non-living। আর একজন বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে ৪ ঘণ্টা কথা হইয়াছিল। প্রথম ঘণ্টায় ভয়ানক বাদানুবাদ, তারপর কথা না বলিয়া কেবল শুনিতেছিলেন, এবং ক্রমাগত বলিতেছিলেন, this is magic! this is magic! তারপর বলিলেন, এখন তাঁহার নিকট সমস্তই নূতন, সমস্তই আলোক। আরও বলিলেন, এইসব সময়ে accepted হইবে; এখন অনেক বাধা আছে। আমার theory পূর্ব্ব সংস্কারের সম্পূর্ণ বিরোধী, সুতরাং কোন-কোন physicists, কোন-কোন Chemists এবং অধিকাংশ physiologists আমার মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবেন। কোন-কোন মহামান্য বৈজ্ঞানিকের theory আমার মত গ্রাহ্য হইলে মিথ্যা হইবে; সুতরাং তাঁহারা বিশেষ প্রতিবাদ করিবেন। এবার সপ্তরথীর হস্তে অভিমন্যু বধ হইবে; আপনারা আমোদ দেখিবেন।

কিন্তু আপনাদের প্রতিনিধি রণে পৃষ্ঠভঙ্গ দিবে না। সে মনশ্চক্ষুতে দেখিবে যে, তাহার উপর অনেক স্নেহদৃষ্টি আপতিত রহিয়াছে।”

এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহব্যঞ্জক পত্র ( শিলাইদহ, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯০০ )—“যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে দিন। কাউকে রেয়াৎ করবেন না—যে হতভাগ্য surrender না করবে, লর্ড রবার্টসের মত নির্ম্মম চিত্তে তাদের পুরাতন ঘর-দুয়ার তর্কানলে জ্বালিয়ে দেবেন। তারপরে আপনি জয় ক'রে এলে আপনার সেই বিজয় গৌরব আমরা বাঙ্গালীরা ভাগ ক'রে নেব।”

জগদীশচন্দ্র সেপ্টেম্বর মাসে ( ১৯০০ ) ব্র্যাড্‌ফোর্ডে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের পদার্থ-বিজ্ঞান শাখায় এক নিবন্ধ পাঠ করেন। বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ধরবার যন্ত্র কি ভাবে কাজ করে, সে সম্পর্কে জগদীশচন্দ্র ও ইংল্যাণ্ডের খ্যাতনামা বিজ্ঞানী লজের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। এই ব্র্যাড্‌ফোর্ড সম্মেলনেই অধ্যাপক লজের ধারণা পরিবর্তিত হয় এবং তিনি অকুণ্ঠ প্রশংসার সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের মত স্বীকার করেন। ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জগদীশচন্দ্রের পত্র ( ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন রিসেপ্‌শন রুম, ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯০০ )—“আমার পূর্ব্ব research সম্বন্ধে কোন বৈজ্ঞানিক পত্রে অতি প্রশংসাবাদ ছিল এবং সেই সঙ্গে Prof. Lodge-এর theory সম্বন্ধে অপ্রশংসা ছিল। ইহাতে Prof. Lodge অতিশয় মনঃক্ষুন্ন ছিলেন এবং আমার theoryর প্রতিবাদ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া আসিয়াছিলেন। আমার প্রবন্ধের মুখবন্ধেই দুই theory লইয়া বাদানুবাদ, আর আমার সম্মুখেই Lodge! সকলেই Lodge-এর মুখের দিকে তাকাইতেছিল, আমিও এক একবার দেখিতেছিলাম। জন্ বুলের মনের ভাব মুখে প্রকাশ পায় না। তবে যখন শেষ হইল, বহু প্রশংসাধ্বনি শুনিলাম। Lodge উঠিয়াও প্রশংসা করিলেন এবং বসু-জায়ার নিকট যাইয়া বলিলেন, —“Let me heartily congratulate you on your

husband's splendid work." আমাকে বলিলেন—"You have a very fine research in hand, go on with it." হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "Are you a man with plenty of means? All these are very expensive and you have many years before you, your work will give rise to many others—all very important."

এর অল্প কয়েকদিন পরে অধ্যাপক ব্যারেটের কাছ থেকে এক চিঠি এল জগদীশচন্দ্রের কাছে। ব্যারেট লিখেছেন—"কাল রাতে আমাদের মধ্যে আলোচনা হলো ( অধ্যাপক লজও উপস্থিত ছিলেন )। আমরা ভেবে দেখলাম, ভারতবর্ষে আপনার সময়ের অনেক অপব্যয় হচ্ছে। আপনার কি স্থায়ী ভাবে ইংল্যাণ্ডে থাকতে কোন আপত্তি আছে? উপযুক্ত অধ্যাপকের পদ মাঝে মাঝে শূন্য হয়, তবে প্রার্থীও অসংখ্য। বর্তমানে একটি ভাল পদ শূন্য আছে ( কোন প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন অধ্যাপকের পদ )। এই চাকরি সুনিশ্চিত, শুধু আপনার সম্মতির অপেক্ষা।"

এই সম্পর্কে জগদীশচন্দ্র জনৈক বন্ধুকে লিখেছিলেন—"জড়বস্তুর সংবেদনশীলতার যে আভাস আমি পেয়েছি তাকে তথ্যের উপর স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিজ্ঞানের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের অন্বেষণ দরকার। ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী-মহলের ধারণা ছিল, বহু বছরের অনুসন্ধানে আমার কাছে এই নতুন সত্য ধরা পড়েছে। আমি নিঃসঙ্কোচে বলেছিলাম, বিদ্যুৎ-তরঙ্গের আঘাতে পদার্থের আণবিক পরিবর্তন নিয়ে গবেষণা করবার সময় কি ভাবে মুহূর্তের মধ্যে আমি জড়দেহে প্রাণস্পন্দন লক্ষ্য করেছি। ক্ষণকালের সে উপলব্ধি থেকে আমার গবেষণাধারায় যে বিরাট সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তাকে রূপায়িত করবার পক্ষে ইংল্যাণ্ড প্রবাসই শ্রেয়। কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করা আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়।

ব্যারেটের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে হলো। অক্ষয় হয়ে রইলো তাঁদের স্মৃতি, যাঁদের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব আমাকে কৃতার্থ করেছে।”

এই সময় রবীন্দ্রনাথকে লিখিত একাধিক পত্রে জগদীশচন্দ্রের দ্বিধা-আন্দোলিত মনের উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে। দেখা যায়, এই চিত্তবিক্ষেপের মুহূর্তে জগদীশচন্দ্র কবিবন্ধুর নির্দেশের উপর একান্ত-ভাবে নির্ভরশীল।

“এখন বলুন কি করি? একদিকে আমি যে কাজ আরম্ভ করিয়াছি—যাহার কেবল outskirts লইয়া এখন ব্যাপৃত আছি এবং যাহার পরিণাম অদ্ভুত মনে করি, সেই কাজ amateurish রকমে চলিবে না। তাহার জন্য অসীম পরিশ্রম ও বহু অনুকূল অবস্থার প্রয়োজন। অন্যদিকে আমার সমস্ত মনপ্রাণ দুঃখিনী মাতৃভূমির আকর্ষণ ছেদন করিতে পারে না। আমি কি করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। আমার সমস্ত inspiration-এর মূলে আমার স্বদেশীয় লোকের স্নেহ। সেই স্নেহবন্ধন ছিন্ন হইলে আমার আর কি রহিল?” (১০ই সেপ্টেম্বর)

“জীবনের কথা কেহ বলিতে পারে না। নতুবা ইচ্ছা ছিল, ভারতবর্ষ হইতে এক নূতন school of workers হইতে এক সম্পূর্ণ নূতন বিষয় প্রকাশিত হইবে।” (৫ই অক্টোবর)

“আমার হৃদয়ের মূল ভারতবর্ষে। যদি সেখানে থাকিয়া কিছু করিতে পারি তাহা হইলেই জীবন ধন্য হইবে। দেশে ফিরিয়া আসিলে যে-সব বাধা পড়িবে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। যদি আমার অভীষ্ট অপূর্ণ থাকিয়া যায় তাহাও সহ্য করিব।” (২রা নভেম্বর)

ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের ব্র্যাড্‌ফোর্ড অধিবেশনে জগদীশচন্দ্র জড়পদার্থের অনুভূতি সম্পর্কে যে নিবন্ধ পাঠ করেন, তা “ইলেক্‌ট্রিশিয়ান” পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই উপলক্ষে তাঁর নতুন গবেষণার উপর উক্ত পত্রিকা প্রশংসাসূচক মন্তব্য করে—

"কয়েক বছর আগে অধ্যাপক বসু ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের এক সভায় দেখিয়েছিলেন, আলোক-তরঙ্গ ও বিদ্যুৎ-তরঙ্গের প্রকৃতির মধ্যে কোনও মৌলিক পার্থক্য নেই।······বেতার-টেলিগ্রাফ যন্ত্রের অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ 'কোহেরার' সম্পর্কে তিনি উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। আমরা বিশ্বাস করি, অধ্যাপক বসু তাঁর দীর্ঘ জীবনের সাধনায় মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারকে আরও অনেক অনাবিষ্কৃত সত্যে সমৃদ্ধ করে দিয়ে যাবেন। তাঁর সাম্প্রতিক গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয়, পদার্থ, রসায়ন ও প্রাণী-বিজ্ঞান, এই তিন মহলের মধ্যে পরিণয় সাধনের আর দেরী নেই।"

### অসুস্থতা ও সাময়িক কর্মবিরতি

ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনে জগদীশচন্দ্র জড়বস্তুর সংবেদনশীলতা সম্পর্কে যে তথ্য পরিবেশন করেন, পদার্থ-বিজ্ঞানীরা তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেও জীববিদ্‌গণ তা সহজে স্বীকার করতে চাইলেন না। সন্দেহাতীত প্রমাণ সংগ্রহের জন্যে তিনি জড়পদার্থের উপর নানারকম পরীক্ষা করবার পরিকল্পনা করেন। এমন সময় দুর্ভাগ্যক্রমে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ায় জগদীশচন্দ্রকে প্রায় দু-মাস বিশ্রাম গ্রহণ করতে হয়।

ডাক্তার ক্রম্‌বি নামে জনৈক চিকিৎসক পরীক্ষা করে বলেন, আভ্যন্তরিক কি ব্যাধি হয়েছে, শীঘ্র চিকিৎসা না করলে আশঙ্কার কারণ। কঠিন অস্ত্রোপচার আবশ্যক। এই অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—"সীজার যে নৌকায় চড়েন সে নৌকা কি কখনও ডুবিতে পারে? মহৎ কর্ম্ম আপনাকে আশ্রয় করিয়া আছে, আপনাকে অতি শীঘ্র সারিয়া উঠিতে হইবে।" এই সময় মিসেস ওলে বুল ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করছিলেন। জগদীশচন্দ্রের অসুস্থতার সংবাদে উৎকণ্ঠিত হয়ে তিনি ইংল্যাণ্ডে আসেন এবং এই দুঃসময়ে পরমাত্মীয়ার মত চিকিৎসার সবকিছু ব্যবস্থা করেন।

১১ই ডিসেম্বর তারিখে নিউ ক্যাভেন্‌ডিস স্ট্রীটে অপারেশন হয়। মিসেস বুল ও অবলা বসুর অক্লান্ত সেবাযত্নে জগদীশচন্দ্র সুস্থ হয়ে ওঠেন। এই অসুস্থতার সময় তিনি কিছুদিন উইম্বল্‌ডনে ভগিনী নিবেদিতার মায়ের হৃদ্যতাপূর্ণ আতিথেয়তার মধ্যে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। বসু-পত্নীও একবার অসুস্থ অবস্থায় অনুরূপ পারিবারিক মমত্বের স্পর্শ পেয়েছিলেন।

জগদীশচন্দ্র যখন শারীরিক অসুস্থতার জন্যে চিন্তান্বিত, ঠিক সেই সময় রয়্যাল ইন্‌স্টিটিউশনে বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ জানালেন স্যার উইলিয়াম ক্রুক্‌স্—"I have read the most interesting account of your researches with extreme interest. I wonder whether I could induce you to deliver a lecture on these or kindred subjects of research before the Royal Institution. If you could do so, I shall be very glad to put your name down for a Friday Evening Discourse after Easter of 1901. I have a vivid recollection of the great pleasure you gave us all on the occasion when you lectured a few years ago."

এর মধ্যে জগদীশচন্দ্রের কাছে রয়্যাল সোসাইটি অব আর্টস থেকেও আমন্ত্রণ আসে। তিনি 'ভারতবর্ষে বিজ্ঞান-চর্চা' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে মনস্থ করেন এবং এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথকে কিছু উপকরণ সংগ্রহ করে পাঠাতে লেখেন।

### ডেভি-ফ্যারাডে পরীক্ষাগারে গবেষণা

রয়্যাল ইন্‌স্টিটিউশনের কর্তৃপক্ষ লণ্ডনের 'Full season' অর্থাৎ এপ্রিলের শেষে বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তার পূর্বেই ছুটির নির্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে যাবে। তাই জগদীশচন্দ্র ইণ্ডিয়া

অফিসে ছুটির জন্যে আবেদন করেন। এই আবেদন অনুসারে ছ-মাসের ছুটি মঞ্জুর হয়। এদিকে জগদীশচন্দ্র সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী পরিকল্পিত গবেষণার কাজ সুরু করেন। পুরনো বন্ধুবর্গ এবং লর্ড র‍্যালে ও সার জেম্‌স্ ডেওয়ার তাঁকে বিখ্যাত ডেভি-ফ্যারাডে পরীক্ষাগারে কাজ করবার জন্যে আমন্ত্রণ জানান। তখন জগদীশচন্দ্র যে একজন শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানী বলে পরিচিত হয়েছিলেন, এ তারই নিদর্শন। ডেভি-ফ্যারাডে গবেষণাগারে জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষার সাফল্য প্রসঙ্গে বুল নামক জনৈক দক্ষ সহকর্মীর নাম স্মরণীয়। এখানে নতুন পরীক্ষায় সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়, বাইরের উত্তেজনায় প্রাণী ও জড়-পদার্থের মধ্যে যে স্পন্দন জাগে, তা মূলতঃ অভিন্ন।

## রয়্যাল ইন্‌স্টিটিউশনে বক্তৃতা

জীব ও জড়ের মধ্যে উত্তেজনাজনিত স্পন্দনের এই যে ঐক্য তিনি প্রত্যক্ষ করেন, তার সঙ্গত পরিণতি হিসেবে এবার জগদীশচন্দ্রের দৃষ্টি পড়ে উদ্ভিদ-জগতের উপর। তাঁর মনে হয়, জীব ও জড়ের মধ্যস্থলবর্তী উদ্ভিদ-দেহেও যদি অনুরূপ সাড়া পাওয়া যায়, তবে তা জড়পদার্থের চেতনা সম্পর্কে তাঁর মতবাদের অতিরিক্ত সমর্থন হিসেবে গণ্য হবে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি জগদীশচন্দ্র জড়, উদ্ভিদ ও প্রাণীর সাড়ালিপির মধ্যে মৌলিক সাদৃশ্য লক্ষ্য করেন এবং বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তাঁর উপলব্ধি দৃঢ়তর প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিজ্ঞপ্তি বের হলো ১০ই মে রয়্যাল ইন্‌স্টিটিউশনে সান্ধ্য সম্মিলনে "যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক তাড়নায় জড়পদার্থের সাড়া" সম্পর্কে জগদীশচন্দ্র এক বক্তৃতা দেবেন। ইতিমধ্যে তিনি কয়েকটি সাড়া-লিপি নিয়ে কেম্‌ব্রিজের প্রখ্যাত শারীরবিজ্ঞানী এবং রয়্যাল সোসাইটির তৎকালীন সেক্রেটারী সার মাইকেল ফস্টারের সঙ্গে

দেখা করেন। মাইকেল ফস্টার প্রথমে সেগুলিকে প্রাণীর পেশীর সাড়ালিপি বলে মনে করেছিলেন; তাই তিনি নির্লিপ্তভাবে বললেন, এতে আর অভিনবত্ব কি আছে? কিন্তু যখন শুনলেন, সেগুলি একখণ্ড টিনের সাড়ালিপি, তখন তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইলো না। মাইকেল ফস্টারের পরামর্শ অনুসারে জগদীশচন্দ্র রয়্যাল ইন্‌স্টিটিউশনে বক্তৃতার পূর্বেই ৭ই মে তারিখে তাঁর তথ্যানুসন্ধানের সংক্ষিপ্ত ফলাফল রয়্যাল সোসাইটির কাছে পেশ করেন।

রয়্যাল ইন্‌স্টিটিউশনে শুক্রবাসরীয় সান্ধ্য বক্তৃতায় (১০ই মে, ১৯০১) জগদীশচন্দ্র বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেন—প্রাণী ও জড়ের সাড়ালিপি একই ভঙ্গীতে লেখা। বক্তৃতার সমাপ্তিতে তিনি বললেন, "বাইরের আঘাতে প্রাণী ও জড়ের মধ্যে যে অনুভূতি জাগে, যন্ত্রে গৃহীত লিপি তারই আত্মকাহিনী। সে সাড়ালিপির মধ্যে কি অদ্ভুত সাদৃশ্য! ক্লান্তি, উত্তেজনা ও বিষক্রিয়া, প্রাণী ও জড়ের সাড়ালিপিতে একই ভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। প্রাণ-ধর্মের এই লীলাকে আমরা কৃত্রিম সীমারেখা টেনে কি করে বিচ্ছিন্নভাবে দেখতে পারি! প্রাণী ও জড়ের প্রকৃতির মধ্যে যে একটা অন্তর্নিহিত ঐক্য রয়েছে, যন্ত্রের সাড়ালিপি কি তারই আভাস দেয় নি? অনুভূতির প্রকাশ কোথাও বাঙ্‌ময়, কোথাও সাঙ্কেতিক, আবার কোথাও একেবারেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। যদি তাই হয়, তবে আমরা নতুন উৎসাহে প্রকৃতির সেই রহস্য অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হব—যে রহস্য এতদিন আমাদের বিভ্রান্ত করেছে। আপাত-বিরুদ্ধ ঘটনাবলীর মধ্যে সহজ সঙ্গতি স্থাপনের উদ্দেশ্যেই বিজ্ঞানের প্রতিটি পদক্ষেপ। বৈচিত্র্যের মধ্যে যে ঐক্য প্রচ্ছন্ন রয়েছে, সে সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টিই বিজ্ঞানের লক্ষ্য। আলোক-তরঙ্গে ভাসমান ধূলিকণা, এই পৃথিবীতে জীবনের উচ্ছ্বাস ও মহাশূন্যে অসংখ্য ভাস্বর সূর্যের মধ্যে এক বিরাট ঐক্য কখন আমার কাছে ধরা পড়লো, জানি না। আমার পূর্বপুরুষগণ ত্রিশ শতাব্দী আগে

ভাগীরথী তীরে যে বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, সেদিন প্রথম আমি তার আংশিক মর্ম উপলব্ধি করলাম। এই বিশ্বের নিয়ত পরিবর্তনশীল বৈচিত্র্যের মধ্যে যাঁরা ঐক্য দেখতে পান চিরন্তন সত্য তাঁদেরই কাছে ধরা পড়ে।”

ইংল্যাণ্ড প্রবাসী জগদীশচন্দ্রের সফলতার কাহিনী ভগিনী নিবেদিতা অনেক সময় রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছেন। ‘আচার্য জগদীশচন্দ্রের জয়বার্ত্তা’[১] শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ রয়্যাল ইন্স্টিটিউশনের এক চিত্রকল্প বর্ণনা দিয়েছেন। নিবেদিতা-লিখিত কোনও পত্রের সে স্বচ্ছন্দ অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হলো।

“সন্ধ্যা নয়টা বাজিলে দ্বার উন্মুক্ত হইল এবং বসু-জায়াকে লইয়া সভাপতি সভায় প্রবেশ করিলেন। সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলী অধ্যাপক-পত্নীকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল। তিনি অবগুণ্ঠনাবৃতা এবং শাড়ী ও ভারতবর্ষীয় অলঙ্কারে সুশোভিতা। তাঁহাদের পশ্চাতে যশস্বী লোকের দল এবং সর্ব্বপশ্চাতে আচার্য্য বসু নিজে। তিনি শান্ত-নেত্রে একবার সমস্ত সভার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং অতি স্বচ্ছন্দ সমাহিতভাবে বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

“তাঁহার পশ্চাতে রেখাঙ্কণ-চিত্রিত বড় বড় পট টাঙ্গান রহিয়াছে। তাহাতে বিষপ্রয়োগে, শ্রান্তির অবস্থায়, ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি আক্ষেপে, উত্তাপের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় স্নায়ুর ও পেশীর এবং তাহার সহিত তুলনীয় ধাতু-পদার্থের স্পন্দন রেখা অঙ্কিত রহিয়াছে। তাঁহার সম্মুখের টেবিলে যন্ত্রোপকরণ সজ্জিত।

“...আচার্য্য বসু বাগ্মী নহেন। বাক্য রচনা তাঁহার পক্ষে সহজসাধ্য নহে; এবং তাঁহার বলিবার ধরণও আবেগে ও সাধ্বসে পূর্ণ। কিন্তু সে রাত্রে তাঁহার বাক্যের বাধা কোথায় অন্তর্ধান করিল।

---

১। বঙ্গদর্শন, আষাঢ়, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ; চিঠিপত্র, ষষ্ঠ খণ্ড, ১০৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

অবলা বসু

"এত সহজে তাঁহাকে বলিতে আমি শুনি নাই। মাঝে মাঝে তাঁহার পদবিন্যাস গাম্ভীর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল, এবং মাঝে মাঝে তিনি সহাস্যে সুনিপুণ পরিহাস সহকারে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ অথচ সরলভাবে বৈজ্ঞানিক ব্যূহের মধ্যে অস্ত্রের পর অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি রসায়ন, পদার্থতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা-প্রশাখার মধ্যে বিভেদ যেন অত্যন্ত সহজভাবেই মিটাইয়া দিলেন।

"তাহার পরে বিজ্ঞানশাস্ত্রে জীব ও অজীবের মধ্যে যে সকল ভেদ-নিরূপক সংজ্ঞা ছিল, তাহা তিনি মাকড়সার জালের মত ঝাড়িয়া ফেলিলেন। যাহার মৃত্যু সম্ভব, তাহাকেই তো জীবিত বলে। অধ্যাপক বসু একখণ্ড টিনকে মৃত্যুর পথে দাঁড় করাইয়া আমাদিগকে তাহার মরণাক্ষেপ দেখাইতে প্রস্তুত আছেন এবং বিষপ্রয়োগে যখন তাহার অন্তিম দশা উপস্থিত হয়, তখন ঔষধপ্রয়োগে পুনরায় তাহাকে সুস্থ করিয়া তুলিতে পারেন।

"অবশেষে অধ্যাপক যখন তাঁহার স্বনির্মিত কৃত্রিম চক্ষু সভার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন এবং দেখাইলেন যে, আমাদের চক্ষু অপেক্ষা তাহার শক্তি অধিক, তখন সকলের বিস্ময়ের অন্ত রহিল না।

"ভারতবর্ষ যুগে যুগে যে মহৎ ঐক্যের বাণী অকুণ্ঠিত চিত্তে ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে, আজ যখন সেই ঐক্যের সংবাদ আধুনিক কালের ভাষায় উচ্চারিত হইল, তখন আমাদের কিরূপ পুলক-সঞ্চার হইল, তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। মনে হইল, বক্তা যেন নিজস্ব আবরণ পরিত্যাগ করিলেন, তিনি যেন অন্ধকারের মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন,—কেবল তাঁহার দেশ এবং তাঁহার জাতি আমাদের সম্মুখে উত্থিত হইল।"

সার রবার্ট অস্টেন ধাতুবিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ এবং ব্রিটিশ মিণ্টের প্রধান কর্মকর্তা। তিনি উচ্ছ্বাসভরে জগদীশচন্দ্রকে বললেন "আমি সারাজীবন ধাতুর প্রকৃতি নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি। সে ধাতুরও

প্রাণ আছে জেনে আমি আজ গভীর আনন্দ অনুভব করছি।” এর মাসদুয়েক পরে অস্টেন একদিন জগদীশচন্দ্রকে তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেন। সেদিন তিনি জগদীশচন্দ্রকে বলেছিলেন—“আপনি নির্ভীকভাবে রয়্যাল ইন্স্টিটিউশনে যে তথ্য প্রকাশ করলেন, ঐ রকম একটা অস্পষ্ট ধারণা অনেক দিন আগে আমার মনে জেগেছিল। আমি একবার তার ইঙ্গিত দিতে গিয়ে বিজ্ঞানী-মহলে অপ্রতিভ হয়েছিলাম। আপনি যেরূপ সাহসের সঙ্গে এবং অকাট্য প্রমাণের সাহায্যে সে তথ্য প্রকাশ করেছেন, তাতে আমার অনেক দ্বিধা সম্পূর্ণ দূর হয়েছে।” স্ুইন্টন্ নামে একজন তড়িৎ-বিজ্ঞানী বলেছিলেন, This is beyond science, this Esoteric Buddhism.” প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক র‍্যাফেল মেলডোলা বলেন—“সম্পূর্ণ অতর্কিতে অধ্যাপক বসু প্রতীচ্যের বিজ্ঞানী-মনে এক বিরাট বিস্ময় হেনেছেন।” ইলেক্ট্রিশিয়ান পত্রিকা (১৭ই মে, ১৯০১) অধ্যাপক বসুকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

**শারীরবিজ্ঞানী ডক্টর ওয়ালার**

ডক্টর ওয়ালার তৎকালীন ইংল্যাণ্ডের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ শারীর-বিজ্ঞানী। সম্ভবতঃ সার জন্ বার্ডন স্যান্ডার্সনের পরেই তাঁর স্থান। হয় প্যারিস কংগ্রেসে নয়তো তার অব্যবহিত পরে ইংল্যাণ্ডে জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ। উভয়ের গবেষণাধারা একই লক্ষ্যের অভিমুখী। সে সম্পর্কে জগদীশচন্দ্র লিখেছেন—“তিনিও জীবনের অনুভূতির রেখা প্রসারিত করিতে প্রয়াসী। তিনি প্রমাণ করিতেছেন যে, বৃক্ষেও অনুভূতি আছে, বীজেও রোপণ করিবার কয়দিন পর হইতে অনুভূতি শক্তি বিকাশ পায়। এই স্থানেই জীবন ও মরণের প্রভেদ-রেখা। এ-স্থলে বলা আবশ্যক, অন্যান্য physiologist-রা এই সামান্য বিষয়টি গলাধঃকরণ করিতে পারিতেছেন না। Waller-কে বাতুল শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করেন।

এই সব কারণে উক্ত Waller-এর স্বভাব অতিশয় কোপন হইয়াছে। কাহারও সঙ্গে তর্ক হইলেই হাতাহাতির কাছাকাছি। উক্ত Waller-এর একজন সহকর্মীর সহিত আমার একজন ভক্তের অল্পদিন হইল ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছে।" ওয়ালার-শিষ্যগণ বিশ্বাস করতেন, জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে একটি সীমারেখা আছে। জগদীশচন্দ্র এ-রকম সীমারেখাকে স্বীকার করেন নি; তিনি বলেছেন, অনুভূতির সীমা জীব থেকে জড়ের মধ্যে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রসারিত। জগদীশচন্দ্র ও ওয়ালারের চিন্তাধারার মধ্যে এখানেই সংঘাত। জগদীশচন্দ্র লিখেছেন—"বন্ধুরা বলিলেন যে, অন্ততঃ কয়েকমাস পর্যন্ত Waller কিংবা তাঁহার ভক্তের সংস্পর্শে আসা আমার পক্ষে অস্বাস্থ্যকর হইবে।"

কিন্তু এরপরে ডক্টর ওয়ালারের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের একাধিকবার সাক্ষাৎ হয়েছে—কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনার সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা নেই। ডক্টর ওয়ালার জগদীচন্দ্রকে বলেছিলেন—"It appears that your work will probably upset mine. Truth is truth and I don't care, if I am proved to be in the wrong. So come and work; I will place my laboratory at your disposal. Teach me or let us work together." জগদীশচন্দ্র একদিন ডক্টর ওয়ালারের গবেষণাগার পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন—সেখানে ডক্টর ওয়ালার নিজে, তাঁর সহধর্মিণী ও আরও দু'জন সহকারী (এঁদের মধ্যে একজন ডক্টর অব সায়েন্স) দিবারাত্রি যেরূপ অক্লান্তভাবে গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন, জগদীশচন্দ্র তা দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হন। এসব রয়্যাল ইনস্টিটিউশনে বক্তৃতার পূর্ববর্তী অধ্যায়ের ঘটনা। এর পরে জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে ইংরেজ জীব-বিজ্ঞানীদের যে শোচনীয় মতবিরোধ চলে, ডক্টর ওয়ালার তাতে নেতৃত্ব করেছিলেন।

### সপ্তম অধ্যায়

# ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী-সমাজে শ্রেণী-বিরোধ

তৎকালীন ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী-সমাজে যে শ্রেণী-বিরোধ চলছিল এবং তার মধ্যে জগদীশচন্দ্রকে কি রকম সন্তর্পণে চলতে হয়েছে, রবীন্দ্রনাথকে লিখিত একপত্রে ( ৫ই অক্টোবর, ১৯০০ ) তার সকৌতুক উল্লেখ আছে। সে পত্রের অংশবিশেষ এখানে উদ্‌ধৃত হলো—
"Chemist and physicist-এর মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম, Physiologist-রাও সেইরূপ। সেদিন আমাদের physical section-এ Chemist-দিগকে অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করা হয়েছিল। আমাদের President তাহাদিগের মন আকর্ষণ করিবার জন্য তাহাদিগের বিশেষ স্তুতিগান করিলেন। তাহার উত্তরে এক Chemist প্রবর উঠিয়া বলিলেন, আমাদের ঝগড়া করিবার ইচ্ছা নাই; কিন্তু আপনাদের J. J. Thompson সেদিন বলিয়াছেন যে, atom অবিভাজ্য নহে। যাহারা আপনাদের atom-এর উপর হাত তোলে, তাহাদিগের সহিত আমাদের চিরসংগ্রাম।"

"তারপর একজন Physiologist-এর সহিত দেখা হয়। তিনি আমার কার্য্যের বিশেষ প্রশংসা করিলেন এবং বলিলেন, 'আশা করি আপনি অন্যান্য Physicist-এর ন্যায় আমাদের সুবৃহৎ Physiology-কে Physics-এর শাখা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন না। একটা formula দিয়া সব explain করা, একি চালাকি?'

"আমার দু-একজন Physicist বন্ধু বলেন যে, Psychology Science নহে, সুতরাং ও বিষয়টা বাদ দিবেন। অর্থাৎ মনে হয়ত সন্দেহ হইয়াছে যে, এ লোকটা Oriental, যদি ওদিকে একবার বেঁকে যায়, তাহা হইলে Physics ছাড়িয়া ওদিকে চলিয়া যাইবে।"

## রয়্যাল সোসাইটিতে বক্তৃতা

জগদীশচন্দ্রের গবেষণায় উদ্ভিদ ও জীব-বিজ্ঞানীদের মধ্যে ধীরে ধীরে যে বিরূপ মনোভাব সঞ্চিত হয়েছিল, রয়্যাল সোসাইটির অধিবেশনে তা প্রকাশ পেল। ১৯০১খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুন, রয়্যাল সোসাইটিতে জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা।[১] অন্য কোন বিজ্ঞানসংস্থার অধিবেশনে পরিবেশিত তথ্যাবলী রয়্যাল সোসাইটি সাধারণতঃ প্রকাশ করেন না। তবে রয়্যাল ইন্স্টিটিউশনে জগদীশচন্দ্র যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তার বিষয়বস্তু-সংবলিত নিবন্ধ প্রকাশের ব্যাপারে রয়্যাল সোসাইটি গতানুগতিক রীতির ব্যতিক্রম করেছিলেন। তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, প্রকাশের পূর্বে আলোচ্য নিবন্ধ সোসাইটির অধিবেশনে পাঠ করতে হবে। শারীরবিজ্ঞানীদের পক্ষ থেকে যদি বিরূপ সমালোচনা না হয়, তবে এই নিবন্ধ প্রকাশ করতে কোনও বাধা থাকবে না।

অক্সফোর্ড থেকে সার বার্ডন স্যান্ডার্সন এসেছেন। ডক্টর ওয়ালার ও তাঁর সমর্থক বিজ্ঞানীরাও উপস্থিত। বক্তৃতাসভায় বার্ডন স্যান্ডার্সন বলেন—পদার্থের অনুভূতি সম্পর্কে গবেষণা শারীরবিজ্ঞানীদের এক্তিয়ারভুক্ত—সুতরাং জগদীশচন্দ্রের পক্ষে তা অনধিকার চর্চা। নিবন্ধের শেষাংশে বৈদ্যুতিক উত্তেজনায় উদ্ভিদের সাড়া সম্পর্কে যে পরীক্ষার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা অবিশ্বাস্য। নিবন্ধের শিরোনামা ও সঙ্কলিত তথ্যের আংশিক পরিবর্তনের জন্যে তিনি জগদীশচন্দ্রকে নির্দেশ দেন। কিন্তু জগদীশচন্দ্র বার্ডন স্যান্ডার্সনের এই নির্দেশ অনুসারে সত্যের অপলাপ করতে প্রস্তুত ছিলেন না, তাতে তাঁর নিবন্ধ যদি অপ্রকাশিত থাকে, তাও বাঞ্ছনীয়। বার্ডন স্যান্ডার্সন জগদীশচন্দ্রের ন্যায় তরুণ বিজ্ঞানীর এই উপেক্ষায় ক্ষুব্ধ হলেন।

---

১। বিষয়—On the electrical response of inorganic substances.

রয়্যাল সোসাইইটির অধিবেশন সম্পর্কে জগদীশচন্দ্র জনৈক বন্ধুকে লিখেছিলেন—"উচ্ছ্বসিত প্রশংসাধ্বনির মধ্যে আমার নিবন্ধ পাঠ ও পরীক্ষা প্রদর্শন শেষ হলো। বার্ডন স্যান্ডার্সন উঠে ভূয়সী প্রশংসা করে বললেন—পদার্থবিদের কাছে নিঃসন্দেহে আমার কাজের যথেষ্ট মূল্য আছে। তবে জড়পদার্থের চৈতনার সমর্থনে আমি যে পরীক্ষাগুলি প্রদর্শন করেছি, জৈব প্রক্রিয়ার সঙ্গে তাদের কিছুটা বাহ্যিক মিল আছে মাত্র। এরপর ডক্টর ওয়ালারের বিরূপ সমালোচনার উত্তর দিতে গিয়ে আমি মৃদু বিরক্তির সুরেই বললাম—জড় ও জৈব প্রকৃতির মধ্যে কিছুমাত্র সাদৃশ্য থাকতে পারে না, একে ধ্রুবসত্য বলে মেনে নেওয়ার অন্ধ প্রবৃত্তির কোনও জবাব দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। আমি নিশ্চিত বুঝতে পারলাম, আজ থেকে দু'জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ শারীরবিজ্ঞানী আমার ঘোর শত্রু হয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু তাতে আমি মোটেই বিচলিত নই। এরপর জীব-বিজ্ঞানীদের তরফ থেকে আর কোন প্রশ্নের অবতারণা হলো না। দু'জন পদার্থ-বিজ্ঞানী, অধ্যাপক বয়েস্ এবং রুকার গুটিকয়েক প্রশ্ন করেন; প্রশ্নগুলি অবশ্য অবান্তর নয়। আমিও সেগুলির সদুত্তর দিলাম। এরপর নিয়মমাফিক ধন্যবাদের পালা শেষ হলো। এবার শারীরবিজ্ঞানীদের সঙ্গে আমার প্রকৃত সংগ্রাম সুরু হবে। কিন্তু সব সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রয়োজন দীর্ঘদিনের অনলস প্রয়াস। স্যান্ডার্সন শারীর-বিজ্ঞানীদের মধ্যে অগ্রগণ্য—সবাই তাঁর কথা বিনাদ্বিধায় মেনে নেবে। কিন্তু একাকী সংগ্রাম করবার জন্যে যে মানসিক শক্তির প্রয়োজন, তারও অভাব হবে না!"

**লণ্ডন-প্রবাসে দ্বিধা ও সংশয়পীড়িত জগদীশচন্দ্র**

কীর্তির দুর্গম অপরিচিত পথে জগদীশচন্দ্র নিঃসঙ্গ যাত্রা সুরু করেছেন, পদে পদে নানা বাধা তাঁর গতি ব্যাহত করছে। জড়-পদার্থের মধ্যে প্রাণধর্মের অস্তিত্বের বার্তাকে জগদীশচন্দ্র একদিন

বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠা দান করবেন, এই প্রত্যাশা রবীন্দ্রনাথের মনে উন্মাদনা জাগিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন, ভারতবর্ষের যথার্থভাবে আত্মপরিচয় দেবার, বিশ্বসভায় ভারতবর্ষের অমরবাণী উচ্চারণ করবার সময় উপস্থিত। তিনি তাঁর বিজ্ঞানী বন্ধুর মধ্যে সহজেই একটি ঐশ্বর্য, সঙ্কল্পের সুদৃঢ় শক্তি দেখেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, জগদীশচন্দ্র 'নব্যভারতের প্রথম ঋষিরূপে জ্ঞানের আলোকশিখায় নূতন হোমাগ্নি প্রজ্বলিত' করবেন, তাঁর সাধনায় ভারতবর্ষ আর একবার গুরুর বেদীতে আরোহণ করবে।

লণ্ডন-প্রবাসে ঘটনার প্রতিকূলতায় ও বিজ্ঞান-সাধনার ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তায় জগদীশচন্দ্র যখন বিষণ্ণ ও উদ্বিগ্ন, তখন তাঁর সাধনা সম্বন্ধে বিপুল শ্রদ্ধা ও প্রত্যাশায় রবীন্দ্রনাথ নিরন্তর উৎসাহপূর্ণ চিঠি লিখে তাঁর মনকে অবসাদ ও দ্বিধা থেকে মুক্ত রাখবার চেষ্টা করেছেন।

"ধন্যোহং কৃতকৃত্যোহং! তোমাদের চিঠি পাইয়া আমি প্রাতঃকাল হইতে নূতন লোকে বিচরণ করিতেছি। যে ঈশ্বর তোমার দ্বারা ভারতের লজ্জা নিবারণ করিয়াছেন আমি তাঁহার চরণে আমার হৃদয়কে অবনত করিয়া রাখিয়াছি। কোন্ দিক্ দিয়া তিনি আমাদের দেশকে গৌরবান্বিত করিবেন অদ্য আমি তাহার অরুণাভামণ্ডিত পথ দেখিতেছি।···নব্য ভারতের প্রথম ঋষিরূপে জ্ঞানের আলোকশিখায় নূতন হোমাগ্নি প্রজ্বলিত কর।"

"বাধা যতই গুরুতর হউক তুমি যে ভার গ্রহণ করিয়াছ তাহা সমাধা না করিয়া তোমার নিষ্কৃতি নাই; সেজন্য যে কোন প্রকার ত্যাগস্বীকার প্রয়োজন তাহা তোমাকে করিতে হইবে।··· তোমার উপর আমার একান্ত নির্ভর আছে—বর্তমান য়ুরোপ তোমাকে গ্রহণ করিল কি না তাহা লইয়া আমি অতিমাত্র উৎকণ্ঠিত হইতেছি না—তুমি যাহা দেখিতে পাইয়াছ তাহা বৈজ্ঞানিক মায়া-মরীচিকা নহে তাহাতে আমার সন্দেহমাত্র, দ্বিধামাত্র নাই।

তোমার উদ্ভাবিত সত্য একদিন বৈজ্ঞানিক সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবে।

"য়ুরোপের মাঝখানে ভারতেবর্ষের জয়ধ্বজা পুঁতিয়া তবে তুমি ফিরিয়ো—তাহার আগে তুমি কিছুতেই ফিরিয়ো না।...যেখানে থাক এবং যেমন করিয়া হউক, উল্লাসে হউক, বাধায় হউক, নৈরাশ্যে হউক, তুমি নিজেকেও ব্যর্থ করিতে পার না।...নিরাসক্ত ভারতবর্ষের অবিচলিত স্থৈর্য্য তোমাকে তোমার কর্ম্মের মধ্যে অনায়াসে রক্ষা করুক। ভারতবর্ষের অশ্বমেধের ঘোড়া তোমার হাতে আছে, তুমি ফিরিয়া আসিলে আমাদের যজ্ঞ সমাধা হইবে।"

১৭ই সেপ্টেম্বর (১৯০০) থেকে ২০শে জুন (১৯০২) পর্যন্ত লণ্ডন-প্রবাসী জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে সুদীর্ঘ পত্রালাপ হয় উপরের উদ্ধৃতিগুলি তার বিচ্ছিন্ন অংশ। এই মৌখিক উৎসাহবাণী ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালী পাঠক-সমাজের সামনে জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনা ও তাঁর স্বদেশপ্রেমে উদ্‌বোধিত আত্মবিসর্জনের কাহিনী উপস্থাপিত করেন। 'বঙ্গদর্শন'-এর সম্পাদকরূপে রবীন্দ্রনাথ নিজে একাধিক প্রবন্ধ ও কবিতা রচনা করেন।[১] এগুলি ছাড়া রবীন্দ্রনাথের উদ্‌যোগে সাময়িক পত্রে আরও অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।[২]

---

১। "আচার্য জগদীশের জয়যাত্রা" (বঙ্গদর্শন, আষাঢ়, ১৩০৮); একই সংখ্যায় প্রকাশিত "জগদীশচন্দ্র বসু" শীর্ষক কবিতা (ভারতের কোন বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্তি তুমি); "জড় কি সজীব?" (বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ, ১৩০৮)

২। জগদানন্দ রায় লিখিত "অধ্যাপক বসুর আবিষ্কার" (ভারতী—আষাঢ়, শ্রাবণ, কার্তিক; ১৩০৭), সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত "বিলাতে অধ্যাপক বসু" (ভারতী—আষাঢ়; ১৩০৮), রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখিত "অধ্যাপক বসুর নবাবিষ্কার" (বঙ্গদর্শন—আশ্বিন; ১৩০৮) এবং "অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার" (সাহিত্য—ভাদ্র; ১৩০৮)

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের এই বন্ধুপ্রীতিতে মুগ্ধ হয়ে জগদীশচন্দ্র লিখেছেন (৬ই জুলাই, ১৯০১)—"তুমি কি জান যে, এই বিদেশে থাকিয়া, দিন রাত্রি পরিশ্রম করিয়া আমার মন কিরূপ অবসন্ন ও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে ? সম্মুখে অজ্ঞাতরাজ্য, আমি একাকী পথ খুঁজিয়া একান্ত ক্লান্ত, কখন একটু আলোক পাই তাহার সন্ধানে চলিতেছি। তোমাদের স্নেহে আমার অবসন্নতা চলিয়া যায়···মাঝে মাঝে তোমাদের উৎসাহবাক্যে আমাকে পুনর্জীবিত করিও।"

শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণের বিরোধিতার ফলে রয়্যাল সোসাইটি কর্তৃক জগদীশচন্দ্রের নিবন্ধ গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও প্রকাশিত হলো না। এই আকস্মিক ঘটনাবিপর্যয়ে জগদীশচন্দ্রের মনে দারুণ নৈরাশ্য ঘনীভূত হয়ে উঠলো। মুষ্টিমেয় ক্ষুব্ধ জীব-বিজ্ঞানীর বিরোধিতা যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তাতে শুধু পূর্বখ্যাতি ম্লান হওয়াই নয়, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে গবেষণা করবার সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিল। বর্তমানে গবেষণার যে সঙ্কুচিত সুযোগ-সুবিধা পেয়েছেন তা বন্ধ হয়ে যাবে, ডেপুটেশনের সময়ও শেষ হয়ে আসছে—এসব কথা ভেবে জগদীশচন্দ্র বিচলিত হয়ে পড়লেন। হয় তাঁকে প্রেসিডেন্সি কলেজের চাকরি ছেড়ে ইংল্যাণ্ডে থেকে যেতে হবে আপন মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্যে, নয় তো সঙ্কল্পিত কাজ অসমাপ্ত রেখে ফিরে যেতে হবে ভারতবর্ষে—সেখানে গতানুগতিক অধ্যাপনার মধ্যে আত্মবিলুপ্তি অনিবার্য। কিন্তু বিনা বিরোধিতায় অসংশয়ে কোনও সত্যকে মেনে নেওয়া, তাকে পুরাপুরি গ্রহণ করা নয়, নিন্দা ও প্রতিবাদের মধ্যে সব সত্যের, বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক সত্যের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা। জগদীশচন্দ্র দ্বিতীয় পন্থাই বেছে নিলেন।

তবু মানসিক দ্বন্দ্ব। একদিকে সকল বাধা ও দ্বিধাকে অতিক্রম করে স্বীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করবার দৃঢ় সঙ্কল্প, অন্যদিকে সবকিছু সাধনা ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা সুনিশ্চিত জেনেও মাতৃভূমিতে ফিরে আসবার জন্যে ব্যাকুলতা।

ভারতবর্ষে কর্মসাধনের ক্ষেত্র কিরূপ বাধাসঙ্কুল, সে কথা মর্মে মর্মেই রবীন্দ্রনাথের জানা ছিল। জন্মভূমির প্রতি মমত্ববোধে জগদীশচন্দ্র ইংল্যাণ্ডে অধ্যাপনাকার্যে ব্রতী হবার সাদর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন। সে কথা স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ একবার জগদীশচন্দ্রকে লিখেছিলেন ( ২০শে নভেম্বর, ১৯০০ )—"তুমি এদেশে থেকেই যদি কাজ করতে চাও তোমাকে কি আমরা সকলে মিলে স্বাধীন করে দিতে পার্‌দিনে? কিন্তু তুমি সাহস করে এ প্রস্তাব কি গ্রহণ করবে? পায়ে বন্ধন জড়িয়ে পদে পদে লাঞ্ছনা সহ্য করে তুমি কাজ করতে পারবে কেন? আমরা তোমাকে মুক্তি দিতে ইচ্ছা করি—সেটা সাধন করা আমাদের পক্ষে যে দুরূহ হবে তা আমি মনে করিনে।" কিন্তু নানাকারণে এই প্রস্তাব জগদীশচন্দ্রের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয় নি। অসময়ে ভারতবর্ষে ফিরে এলে তাঁর কর্ম-সমাধা সম্বন্ধে ব্যাঘাত ঘটবে, এই আশঙ্কায় রবীন্দ্রনাথ আশা-নিরাশায় আন্দোলিত জগদীশচন্দ্রকে লিখলেন—"যদি পাঁচ-ছ'বছর তোমাকে বিলাতে থাকতে হয় তুমি তারই জন্যে প্রস্তুত হোয়ো, অনর্থক ভারতবর্ষের ঝঞ্ঝাটের মধ্যে এসে কাজ নষ্ট কোরো না।···আমার কাছে লেশমাত্র সঙ্কোচ কোরো না। বৎসরে তোমাকে কত পরিমাণে দিলে তুমি বিনা বেতনে দীর্ঘ ছুটি নিতে পার আমাকে লিখে। ( ২১শে মে, ১৯০১ )

"তোমাকে বারম্বার মিনতি করিতেছি—অসময়ে ভারতবর্ষে আসিবার চেষ্টা করিও না। তুমি তোমার তপস্যা শেষ কর—দৈত্যের সহিত লড়াই করিয়া অশোকবন হইতে সীতা-উদ্ধার তুমিই করিবে, আমি যদি কিঞ্চিৎ টাকা আহরণ করিয়া সেতু বাঁধিয়া দিতে পারি তবে আমিও ফাঁকি দিয়া স্বদেশের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিব।" ( ৪ঠা জুন, ১৯০১ )

জগদীশচন্দ্র মন স্থির করে ডেপুটেশনের সময় বাড়িয়ে দেবার জন্যে ইণ্ডিয়া অফিসের কাছে আবেদন করেন। ইণ্ডিয়া অফিসের

কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে যাঁর কাছে পরামর্শ চাইলেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি জগদীশচন্দ্রের বিরোধী জীব-বিজ্ঞানীদের একজন। এই অবস্থায় তাঁর আবেদন স্বভাবতঃই অগ্রাহ্য হলো। ছুটির আবেদন প্রত্যাখ্যাত হবার পর জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন (৬ই জুলাই, ১৯০১)—"আমি দুই বৎসরের Extension-এর জন্য India office-এ আবেদন করিয়াছিলাম। Under Secretary of State বলিলেন, পাইতে কোন কষ্ট হইবে না। হঠাৎ খবর পাইলাম যে, যদিও আমার Scientific work is very important, yet the Secretary of state regrets…ইত্যাদি।" এর মধ্যে একদিন প্রখ্যাত দেশপ্রেমিক ও মনীষী রমেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের দেখা। তিনি জগদীশচন্দ্রকে দেশে ফিরে যাবার কথায় বার বার নিষেধ করেন। এই সাক্ষাতের পর রমেশচন্দ্র দত্ত ১৬ই জুলাই তারিখে রবীন্দ্রনাথকে এক পত্র লেখেন।[১] কি ভাবে জগদীশচন্দ্রকে তাঁর বিজ্ঞান-সাধনায় আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও আত্মনির্ভরতা দান করা যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত সে সম্পর্কে এই পত্রে রবীন্দ্রনাথকে একটি পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিলেন।

ডেপুটেশনের আবেদন অগ্রাহ্য হওয়ায় অনন্যোপায় জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও রমেশচন্দ্রের উৎসাহে কর্তৃপক্ষের কাছে ফার্লোর জন্যে আবেদন করেন। সে সম্পর্কে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন—"আমি ফার্লোর জন্য আবেদন করিয়াছি, জানি না কি হয়। তবে Anglo-Indian member of Council-এর মধ্যেও দুই একজন মানবিক ভাব একেবারে বর্জ্জন করিতে পারেন নাই। তাহার মধ্যে একজন আমাকে বলিয়াছেন, 'আমি তোমার ছুটির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিব, for I think it will be a sin against Science to make you leave work now'। সার উডবার্ণ

১। চিঠিপত্র, ষষ্ঠ খণ্ড (বিশ্বভারতী), পৃঃ ১৪৩।

আমাকে সর্ব্বদা সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহার অধস্তন কর্ম্মচারীদের হস্তেই আমাদের জীবনসংশয়।" ফার্লোর জন্যে এই আবেদন গ্রাহ্য হয় এবং জগদীশচন্দ্র নতুন উৎসাহে রয়্যাল ইন্‌স্টিটিউশনে পরীক্ষা সুরু করেন। সেপ্টেম্বর মাসে তিনি গ্লাসগোতে বৃটিশ অ্যাসোসিয়েশনে একটি প্রবন্ধ[১] পাঠ করেন।

ফার্লোর আবেদন মঞ্জুর হলেও জগদীশচন্দ্রের আর্থিক সমস্যা দূর হলো না। এই সময় অনেকে ত্রিপুরাধিপতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রীতি-সম্পর্ককে মলিন করবার চেষ্টা করেন।[২] 'তাঁহাকে (জগদীশচন্দ্র) বন্ধনমুক্ত, ভারমুক্ত করিতে পারিলে আমি কৃতার্থ হইব—ইহা কেবল বন্ধুত্বের কার্য নহে, স্বদেশরে কার্য'—এই কথা মনে করে 'সমস্ত অভিমানকে সম্পূর্ণ বিসর্জন' দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরাধিপতির দাক্ষিণ্য প্রার্থনা করলেন—"জগদীশবাবুর জন্য কিছু করবার সময় অগ্রসর হইতেছে। তাঁহার বিজ্ঞানালোচনার সঙ্কটকাল উপস্থিত হইয়াছে। তিনি যে উচ্চের দিকে উঠিতেছিলেন পরাধীনতা ও বাহিরের বাধায় তাঁহাকে হঠাৎ নিরস্ত করিলে আমাদের পক্ষে ক্ষোভ ও লজ্জার সীমা থাকিবে না।...আমার একান্ত আন্তরিক মঙ্গল উদ্দেশ্যের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টি রক্ষা করিবেন।"[৩] মহারাজের সহৃদয়তার জন্যে সেদিন রবীন্দ্রনাথ নিঃসহায় প্রবাসে জগদীশচন্দ্রের সফলতার পথকে সুগম করতে পেরেছিলেন।

**অধ্যাপক ভাইন্‌সের সৌজন্য—লিনিয়ান সোসাইটিতে বক্তৃতা—**

অধ্যাপক ভাইন্‌স্ একজন খ্যাতনামা উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী। কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এঁর অধ্যাপনায় জগদীশচন্দ্র মুগ্ধ হয়েছিলেন। একদিন

---

১। "The change of conductivity of metallic particles under cyclic electromotive variation."

২। ঠাকুর মহিমচন্দ্র দেববর্মাকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র 'চিঠিপত্র'—ষষ্ঠ খণ্ডে সঙ্কলিত, পৃঃ ১২৯ দ্রষ্টব্য।

৩। পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃঃ ১৩৩-৩৪ দ্রষ্টব্য।

উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী হোরেস ব্রাউন ও সাউথ কেন্‌সিংটন কলেজের অধ্যাপক হাউয়েস্‌কে সঙ্গে নিয়ে ভাইনস্‌ জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষাগার দেখতে আসেন। জগদীশচন্দ্রের গবেষণাধারায় মুগ্ধ হয়ে তাঁরা তাঁকে নির্দেশ দেন, রয়্যাল সোসাইটি যে নিবন্ধ প্রকাশ করে নি, তা লিনিয়ান সোসাইটির কাছে পাঠাতে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, সে বছর অধ্যাপক ভাইনস্‌ ও হাউয়েস ছিলেন লিনিয়ান সোসাইটির যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক। ভাইনস্‌ জগদীশচন্দ্রকে বলেন—"আপনাকে আমরা লিনিয়ান সোসাইটিতে এক নিবন্ধ পাঠ করবার জন্যে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। সেখানে আমরা জীব-বিজ্ঞানীদের, বিশেষ করে আপনার প্রতিপক্ষকে উপস্থিত থাকতে বলবো।" ভাইন্‌সের আমন্ত্রণক্রমে ২০শে মার্চ ( ১৯০২ ) জগদীশচন্দ্র লিনিয়ান সোসাইটিতে যে বক্তৃতা[১] দেন, পশ্চিমী বিজ্ঞানী-মহলে আত্মপ্রকাশ ও নিজের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করবার সে ছিল এক দুর্লভ সুযোগ। বক্তৃতার পূর্বে জগদীশচন্দ্র জনৈক বন্ধুকে লিখেছিলেন—"যদি কোনদিন বৈজ্ঞানিক অন্বেষণের এই নতুন পথ থেকে সরে দাঁড়াই তবে সেটা হবে আমার খুসী অনুযায়ী, পারিপার্শ্বিক ঘটনার চাপে পড়ে নয়। ভবিষ্যতের কর্মপথ এখনও স্পষ্ট দেখতে পাই না। একক মানুষ তার অটুট সঙ্কল্প ও অদম্য মানসিক শক্তি নিয়ে কি করে সঙ্ঘবদ্ধ বিরোধিতার সামনে দাঁড়াতে পারে, সেটা দেখাবার জন্যেই আমি এই অন্বেষণের পথে ফিরে আসবো। নিষ্ক্রিয় হয়ে আমি বসে থাকবো না। আমি মিরাকল্‌ বিশ্বাস করি না। সেই মিরাকল্‌ই হয়তো এবার ঘটবে, কারণ আমি যে সংগ্রাম করে চলেছি, তা সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্যে।"

---

১। বিষয় : "On the electric response in ordinary plants under mechanical stimulus." এই বক্তৃতা পরে প্রবন্ধাকারে লিনিয়ান সোসাইটির জার্ণাল 'Botany'-তে ( Vol 25 ) প্রকাশিত হয়।

জগদীশচন্দ্রের এই আত্মপ্রত্যয় ঘোষণা যে অর্থহীন ভাবোচ্ছ্বাস নয়, লিনিয়ান সোসাইটির বিজ্ঞানী-সম্মেলনে তা প্রমাণিত হয়ে গেল। বক্তৃতার পর দিন জগদীশচন্দ্র তাঁর বিজয়-কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন—"গত রাত্রির বক্তৃতার তুলনায় রয়্যাল ইন্‌স্টিটিউশনের বক্তৃতা কিছুই নয়। আমি যেন সংগ্রামের নেশায় মেতে উঠেছিলাম। একটা প্রচণ্ড বন্যাবেগের মত আমার তথ্য-বিশ্লেষণ ও পরীক্ষণ-সূক্ষ্মতা শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিস্ময়ে নির্বাক করে দিল। আমি একা, প্রতিপক্ষ প্রবল, কিন্তু মহান সত্যকে রোধ করবার মত কতটুকু শক্তি আছে তাঁদের? পনেরো মিনিট ধরে বক্তৃতাকক্ষ উচ্ছ্বসিত প্রশংসাধ্বনিতে মুখরিত হয়ে রইলো। আমি নির্বিকার চিত্তে পরীক্ষা-সহযোগে তথ্যের পর তথ্য পরিবেশন করে গেলাম। সভাপতি শ্রোতৃমণ্ডলীকে আহ্বান করলেন, আমার মতবাদ ও পরীক্ষা সম্পর্কে যদি কারও মনে সংশয় থাকে তা ব্যক্ত করতে; কিন্তু কেউ উঠে এলেন না।" প্রখ্যাত জীব-বিজ্ঞানী অধ্যাপক হার্টগের মনে জগদীশচন্দ্রের তথ্য সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ ছিল, কিন্তু সেদিন লিনিয়ান সোসাইটির জড় ও জীবের অনুভূতির সঙ্কেত-লিপি প্রত্যক্ষ করে তিনি পরম বিস্ময় বোধ করেন। শ্রোতৃমণ্ডলীর পক্ষ থেকে অধ্যাপক হার্টগ জগদীশচন্দ্রকে আন্তরিক অভিনন্দন জানালেন।

স্যান্ডারসন ও তাঁর সমর্থক দলের বিরোধিতার ইঙ্গিত করে অধ্যাপক ভাইন্‌স্ জগদীশচন্দ্রকে বলেন—"আমাদের বিজ্ঞান-কর্মীদের সম্পর্কে আপনাকে আরও অনেক জানতে হবে।" তিনি জগদীশচন্দ্রের কাছে উদ্ভিদের অনুভূতি সম্পর্কে তাঁর দীর্ঘদিনের আগ্রহের কথা নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করলেন। মাত্র কয়েক মাস আগে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক বিজ্ঞান-কর্মীর সহযোগিতায় এই বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানের পরিকল্পনাও তৈরী করেছিলেন। বক্তৃতার পরদিন ভাইন্‌স্ জগদীশচন্দ্রকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে লিখলেন—"উদ্ভিদ-দেহের সংবেদনশীলতা সম্বন্ধে আমাদের মনে আর

কোনও দ্বিধা নেই। দীর্ঘ দিন ধরে পদার্থের অনুভূতি সম্পর্কে নানা প্রশ্ন আমার মনে জেগেছে। আজ আপনার সার্থক গবেষণায় জড় প্রকৃতির উপর যে আলোকপাত হয়েছে, তাতে আমি বিস্মিত।"

লিনিয়ান সোসাইটির জার্ণালে জগদীশচন্দ্রের নিবন্ধ প্রকাশের পথেও প্রতিপক্ষের বিরোধিতা বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল। রয়্যাল সোসাইটিতে নিবন্ধ পাঠ করবার প্রায় আটমাস পরে লণ্ডনের কোনও বিজ্ঞান-পত্রিকায় ডক্টর ওয়ালার এক নিবন্ধ প্রকাশ করেন। জগদীশচন্দ্রের যে নিবন্ধ রয়্যাল সোসাইটিতে অপ্রকাশিত অবস্থায় পড়েছিল, এই নিবন্ধ তারই অবিকল প্রতিলিপি। নিবন্ধের কোথায়ও জগদীশচন্দ্রের নামোল্লেখ পর্যন্ত করা হয় নি। পাঠকগণের স্মরণ থাকতে পারে, এই ডক্টর ওয়ালার সেই বিরোধী জীব-বিজ্ঞানীদের একজন, যাঁরা রয়্যাল সোসাইটিতে জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতার সময় উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর পরিবেশিত তথ্যসমূহের তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। ডক্টর ওয়ালারকে লিনিয়ান সোসাইটির অধিবেশনে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করা হয়, কিন্তু তিনি সে অধিবেশনে অনুপস্থিত ছিলেন। লিনিয়ান সোসাইটির জার্ণালে জগদীশচন্দ্রের নিবন্ধ প্রকাশের পূর্বমুহূর্তে ডক্টর ওয়ালারের সমর্থক বিজ্ঞানীরা তাঁর প্রকাশিত নিবন্ধের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ভোলেন নি। দেখা গেল, শারীরবিজ্ঞান পরিষদ ( Physiological Society ) কর্তৃক ডক্টর ওয়ালারের নিবন্ধ গৃহীত হয়েছে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই নভেম্বর তারিখে, অর্থাৎ লিনিয়ান সোসাইটিতে জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতার প্রায় চার মাস আগে। উভয় নিবন্ধের মধ্যে বিষয়বস্তুর অদ্ভুত মিল থাকায় লিনিয়ান সোসাইটির প্রকাশন-কর্তৃপক্ষ জগদীশচন্দ্রকে এই ব্যাপারে আলোকপাত করতে অনুরোধ জানালেন। ডক্টর ওয়ালারের সহযোগীরা মনে করেছিলেন, লিনিয়ান সোসাইটি এ-সব ব্যাপার গোপন রাখবেন এবং জগদীশচন্দ্রের নিবন্ধ প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু সুখের কথা, উক্ত সোসাইটির সম্পাদকের নিকট জগদীশচন্দ্র

রয়্যাল ইন্‌স্টিটিউশনে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তার এক প্রতিলিপি ছিল। তিনিই প্রথম বিরোধী জীব-বিজ্ঞানীদের অভিসন্ধির আভাস পান। শেষ পর্যন্ত লিনিয়ান সোসাইটির সৌজন্যে প্রকৃত ঘটনার উপর আলোকপাত সম্ভব হয়।

এসব ব্যাপারে জগদীশচন্দ্র স্বভাবতঃই মর্মপীড়া অনুভব করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি অধ্যাপক ভাইন্‌স্‌কে লিখেছিলেন —"আপনাদের সৌজন্যে আমি গভীর কৃতজ্ঞতা বোধ করছি। আমি এবার ইংল্যাণ্ডে এসে যে বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছি, তার প্রকৃত অর্থ আগে বুঝতে পারি নি। আমি আশা করেছিলাম, আর এক বছরের মধ্যে আমার নতুন তথ্য সম্পর্কে সব সন্দেহ ও ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে পারবো। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, আসল বিঘ্ন কোথায়। আমাকে অবমানিত করবার জন্যে একটা গোপন ষড়যন্ত্র চলছিল, সে কথা জেনে আমি মনে খুবই আঘাত পেয়েছি। তবু তারই মধ্যে অনেকের কাছে আমি যে ন্যায়নিষ্ঠার পরিচয় পেয়েছি, তা কোনদিন ভুলবো না।"

### প্রথম গবেষণা-গ্রন্থ প্রকাশ

এই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার পরে জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় নিবন্ধ প্রকাশের গতানুগতিক রীতির পরিবর্তে গ্রন্থাকারে গবেষণার ফলাফল লিপিবদ্ধ করাই নিরাপদ মনে করলেন। দু'তিন মাসের মধ্যে গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরী হয়ে গেল। জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন—( ১৮ই জুলাই, ১৯০২ )—"রৌদ্র ও মেঘের ছায়া ক্রমাগত আমাদের হৃদয়পটে একে অন্যের অনুধাবন করিতেছে। আমার পুস্তকের শেষ প্রুফ লইয়া ব্যস্ত আছি। আর ৩।৪ সপ্তাহে পুস্তক মুদ্রিত হইবে। প্রুফ দেখিবার সময় গত দুই বৎসরের দারুণ সংগ্রামের কথা মনে হইয়া একান্ত ক্লিষ্ট হই। আমার এই দীর্ঘ যন্ত্রণার ফল যেন তোমাদের গ্রহণীয় হয়।"

অক্টোবর মাসে লংম্যানস্, গ্রীন্ অ্যাণ্ড কোম্পানি কর্তৃক জগদীশ-চন্দ্রের প্রথম গ্রন্থ 'Response in the Living and Non-Living' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রচনাকালে জগদীশচন্দ্র যে সব নতুন পরীক্ষা ও তথ্যসংগ্রহ করেছিলেন, সে সম্বন্ধে তিনি রয়্যাল সোসাইটির কাছে একটি নিবন্ধ পাঠান (মে, ১৯০২)। বিনা সমালোচনায় সে নিবন্ধ অনতিবিলম্বে প্রকাশিত হয়। জগদীশচন্দ্র লিখেছিলেন—"আমার কাজ একরকম শেষ হয়েছে, ভবিষ্যতে শুধু অনিশ্চয়তা ও নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে বসে থাকা। তবু আমি মনে করি, সত্য প্রতিষ্ঠার খাতিরে আমাদের মানসিক শক্তিকে জাগিয়ে রাখতে হবে।"

বিদ্বেষ ও বিরোধিতার যে ক্লিন্ন রূপ তিনি দেখেছিলেন, তাতে তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে মনে গভীর নৈরাশ্য ছিল। সে আশঙ্কা অমূলক প্রমাণিত হয়। শুধু বৈজ্ঞানিক তথ্য নয়, সাহিত্য সম্পদে পূর্ণ এই গ্রন্থ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রখ্যাত দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার, অধ্যাপক কারভেল্থ্ রিড, প্রিন্স ক্রোপ্যাট্‌কিন এবং সায়েন্স অ্যাবস্ট্র্যাক্ট্, রিভিয়ু অব রিভিয়ুস (অক্টোবর, ১৯০২), ডেইলি ক্রনিকল (২২শে নভেম্বর, ১৯০২), ইলেকট্রিশিয়ান (২৬শে ডিসেম্বর, ১৯০২) প্রভৃতি পত্রিকা জগদীশ-চন্দ্রের যুগপৎ বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যকীর্তিকে অভিনন্দিত করেছিলেন। জার্মেনীতেও এই বই সম্পর্কে যথেষ্ট ঔৎসুক্য সঞ্চারিত হয়েছিল। লংম্যান্স্ কর্তৃক প্রকাশিত হবার অব্যবহিত পরেই লাইপজিগের এক প্রকাশনপ্রতিষ্ঠান এই বই জার্মান ভাষায় অনুবাদ করবার প্রস্তাব করেন।

ইংল্যাণ্ড পরিত্যাগের পূর্বে জগদীশচন্দ্র বেলফাস্টে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের অধিবেশনে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রিত হন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মে তিনি যে বক্তৃতা[১] দেন, তা যথেষ্ট সমাদৃত হয়। সেই

১। "Electric response in animal, vegetable and metal".

বছরই সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের বেলফাস্ট অধিবেশনে উদ্ভিদ-বিজ্ঞান শাখার সভাপতি জগদীশচন্দ্রের গবেষণার সপ্রশংস উল্লেখ করেন। 'ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাগাজিন' পত্রিকার নভেম্বর সংখ্যায় তাঁর গবেষণার মূল্য সম্পর্কে একটি আলোচনা প্রকাশিত হয়।

জার্মান বিজ্ঞানী-মহলেও জগদীশচন্দ্রের গবেষণার বিষয় যথেষ্ট সমাদৃত হয়। অধ্যাপক বুশলি ( প্রাণী-বিজ্ঞান বিভাগ, হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় ) ও ডক্টর বুশেরি ( বন্ বিশ্ববিদ্যালয় ) জগদীশচন্দ্রকে তাঁর গবেষণার প্রতি তাঁদের আগ্রহের কথা জানান। ডক্টর বুশেরি লিখেছিলেন ( ২রা মে, ১৯০২ )—"আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনি বক্তৃতা দিলে বিভাগীয় প্রধান ব্যারন ফন্ ডর গল্শ্ অত্যন্ত আনন্দিত হবেন। আমার ইচ্ছা, প্রখ্যাত শারীরবিজ্ঞানী অধ্যাপক ফ্লুগার এই বক্তৃতায় উপস্থিত থাকেন এবং আপনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়।" এই সময় ফরাসী পদার্থ-বিজ্ঞান পরিষদে ( Societe Francaise de Physique) জগদীশচন্দ্রের একটি নিবন্ধ[১] পঠিত হয় এবং তিনি এই পরিষদের সদস্য মনোনীত হন। সেখানকার বিজ্ঞানী-মণ্ডলী তাঁর নতুন আবিষ্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনতে একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু সময়াভাবে জগদীশচন্দ্রের পক্ষে ইউরোপের কোথাও যাওয়া সম্ভব হয় নি।

এর কিছুদিন পরে রয়্যাল ফটোগ্রাফিক সোসাইটির পত্রিকায় ফটোগ্রাফি সম্পর্কে জগদীশচন্দ্রের একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। উক্ত সোসাইটির উদ্‌যোগে ১০ই জুন সন্ধ্যায় তিনি এক বক্তৃতা দেন।[২] শ্রোতৃমণ্ডলী ফটোগ্রাফি সম্পর্কিত নতুন তত্ত্বের কথা শুনে বিস্মিত হন। সোসাইটির সভাপতি বলেন—"It will produce

---

১। "Sur la Re'ponse Electrique de la Matiére Vivante"

২। "The latent image and molecular strain theory of photographic action"

a revolution about our ideas of photography. 'অ্যামেচার ফটোগ্রাফার' নামে এক পত্রিকায় এই বিষয়ে সপ্রশংস আলোচনা প্রকাশিত হয়। এই বক্তৃতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জগদীশচন্দ্রের পত্র (৩০শে মে, ১৯০২)—"আগামী Photographic Societyতে বক্তৃতার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছি—দৃষ্টি ও ফটোগ্রাফী সম্বন্ধে বলিতে হইবে। চক্ষে যে ছায়া পড়ে তাহা মিলাইয়া যায়, কেবল তাহার প্রতিধ্বনি সুপ্ত ও জাগরিত স্মৃতিরূপে থাকিয়া যায়। কিন্তু photoর ছবি একেবারে অপরিবর্ত্তিতরূপে মুদ্রিত হইয়া যায়। কি করিয়া সেই আণবিক আড়ষ্টতা (molecular arrest) সাধিত হয়, তাহার সম্বন্ধে অতি আশ্চর্য্য experimentএ সফলতা লাভ করিয়াছি। হঠাৎ মনে হইল বুঝি তুমি আমার আবিষ্কার চুরি করিয়া ইতিপূর্ব্বে কবিতারূপে প্রচার করিয়াছ। সুরদাস যখন তাহার চক্ষু শলাকাবিদ্ধ করিতেছিল তখন তাহার মনে হইল যে, চির অন্ধকারে পলকহীন স্মৃতি চিরমুদ্রিত থাকিবে।"

এই সময় রয়্যাল সোসাইটি ও লিনিয়ান সোসাইটি জগদীশচন্দ্রের পূর্ব-উপেক্ষিত ও বহুবিতর্কিত নিবন্ধগুলি প্রকাশ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এসব সাফল্যের কথা তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখে জানাচ্ছেন (২৭শে জুন, ১৯০২)—"এতদিন সংগ্রামে বিক্ষুব্ধ ছিলাম; তুমি শুনিয়া সুখী হইবে সর্ব্বত্রই জয় সংবাদ। তোমার নিকট তিনখানা পুস্তিকা পাঠাই। তারিখ দেখিলে বুঝিবে ইহা এক বৎসর পূর্ব্বে পঠিত হয়, এক বৎসর পরে গৃহীত হইল। জড়ের স্পন্দন সম্বন্ধে গত বৎসরের ঘটনা জান। পুনরায় এ-বৎসর Royal Societyতে আসিয়াছিলাম। এবার অনেক তর্কের পর আমার মতেরই জয় হইয়াছে।···আমি সম্প্রতি বিনা আলোকে ছবি তুলিতে সমর্থ হইয়াছি। আমি এইবার নূতন নূতন তত্ত্বের সন্ধান পাইয়া বিহ্বল হইয়াছি। ইহার অন্ত কোথায়? মানুষের মন যে আর ধারণ করিতে পারে না।"

## প্রিন্স ক্রোপ্যাট্‌কিন

জগদীশচন্দ্র তাঁর বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় ইংল্যাণ্ডে বহুবিধ প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিলেন। গতানুগতিক চিন্তাধারার সঙ্গে স্বাভাবিক সংঘাত ছাড়াও বাধা এসেছিল নানাদিক থেকে। শারীরতত্ত্ববিদেরা জীবনকে একটা মহৎ কিছু মনে করতেন। তাঁদের বিজ্ঞান যে পদার্থবিদ্যারই একটি শাখামাত্র, এ-কথা তাঁরা কোন মতেই স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন না। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক চিন্তা-জগতে যে বিপ্লবের সূচনা করেছিল, তার আঘাত ধর্মীয় চিন্তা-জগৎ পর্যন্ত প্রসারিত হয়। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন—"কোন কোন মূঢ় লোকে মনে করেন যে, বিজ্ঞানদ্বারা জীবনতত্ত্ব বাহির হইলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিবার আবশ্যক নাই। তাঁহারা অতিশয় পুলকিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের ভাবগতিক দেখিয়া খ্রীষ্টবিশ্বাসী বৈজ্ঞানিকেরা কিছু তটস্থ হইয়াছেন। এজন্য আমি কোন কোন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইব।" তবে যাঁদের কোন স্বার্থ ছিল না, তাঁরা জগদীশচন্দ্রের উদ্ভাবনী প্রতিভাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন এবং তাঁকে উৎসাহিত করেছিলেন। র‍্যালে, ভাইন্‌স্ প্রমুখ বিজ্ঞানী ছাড়া এই শ্রেণীর অপর এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন প্রিন্স ক্রোপ্যাট্‌কিন। ইংল্যাণ্ড-প্রবাসেই তাঁর সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের পরিচয় হয়, সম্ভবতঃ পাশ্চাত্ত্যের দেশগুলিতে রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রচারের উদ্‌যোগ-সূত্রে। তৎকালীন ইউরোপের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী প্রথম জীবনে ছিলেন বিপ্লবী। জগদীশচন্দ্র যখন তাঁর নতুন বৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রচারে শারীরতত্ত্ব-বিদ্‌দের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন, তখন তাঁর গবেষণাসমূহের অন্যতম গুণগ্রাহী এই মনস্বী ব্যক্তি তাঁকে বলেছিলেন—"You will probably not live to see it universally accepted, it is too daring for this theological country.···Your theory upsets the old-established physiological

dogmas. Do you think they will easily give up, unless you make them ?"

**স্বদেশে প্রত্যাবর্তন**

সেপ্টেম্বর মাস। প্রিয় স্বদেশভূমিতে ফিরে যাবার সময় হয়ে এসেছে। কবিবন্ধু লিখেছেন—"ভারতবর্ষের অশ্বমেধের ঘোড়া তোমার হাতে আছে, তুমি ফিরিয়া আসিলে আমাদের যজ্ঞ সমাধা হইবে।" কিন্তু জগদীশচন্দ্র ক্লান্ত, যুদ্ধজয়ের কোলাহল ছেড়ে এবার তিনি নিভৃত স্থানের সন্ধান করছেন, যেখানে 'জগৎচক্রের ঘর্ঘর শব্দে' জয়পরাজয়ের তোলাপাড়া কিছুক্ষণ ভুলে থাকা যায়। তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন (৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯০২)—"তোমার সহিত কত বিষয় বলিবার আছে তাহা অনেকদিনেও ফুরাইবে না। তোমার গৃহে আমার জন্য এতটুকু স্থান রাখিও। বাহিরের কোলাহল, মিথ্যা বাদবিসম্বাদ হইতে পলায়ন করিয়া তোমার সহিত প্রকৃতের অন্বেষণ করিব।" এই সময় অবলা বসু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন, সে জন্যে ইংল্যাণ্ড পরিত্যাগ করতে কয়েক দিন দেরী হয়ে যায়। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি বসুদম্পতি কলকাতায় প্রত্যাগমন করেন।

অষ্টম অধ্যায়

# স্বদেশে সম্মানলাভ—আমেরিকা পরিভ্রমণ

"প্রাণের আদিম ভাষা গূঢ় ছিল তাহার অন্তরে"

**রাজকীয় সম্মাননা**

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ, কার্জনের শাসনকালে সে বছর ১লা জানুয়ারী দিল্লীতে আহূত দরবারে সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক-বার্তা ঘোষণা করা হয়। এই উপলক্ষে বিজ্ঞানের প্রগতিকল্পে জগদীশচন্দ্রের অবিস্মরণীয় মৌলিক অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ভারত সরকার তাঁকে সি. আই. ই. উপাধিতে ভূষিত করেন। এই ঘটনার উপর সরস মন্তব্য করে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লেখেন ( ১লা জানুয়ারী, ১৯০৩ )—"আজ কাগজে এক সংবাদ দেখিয়া চক্ষুস্থির। আমার একটি পুচ্ছ সংযোগ হইয়াছে।"

**ভারত সঙ্গীত-সমাজ কর্তৃক সম্বর্ধনা**[১]

অল্প কিছুদিন পরে জগদীশচন্দ্রকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্যে সঙ্গীত-সমাজ কর্তৃক একটি সারস্বত-সম্মিলনের আয়োজন করা হয়। ১৯শে মাঘ ১৩০৯ ( ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯০৩ ) তারিখের এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কোচবিহারের মহারাজা বাহাদুর। অনুষ্ঠানের জন্যে রবীন্দ্রনাথ 'জয় তব হোক জয়' গানটি রচনা করেছিলেন। সরলাদেবীর 'বন্দি তোমায় ভারতজননি বিদ্যামুকুটধারিনি', গানটিও এই সম্বর্ধনা উপলক্ষে রচিত।[২] পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন জগদীশচন্দ্রকে সংস্কৃত কবিতায় আশীর্বাদ করেন।

---

১। "সঙ্গীত-সমাজ"—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, মাসিক বসুমতী; জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০।

২। ভারতী; ফাল্গুন, ১৩০৯।

সঙ্গীত-সমাজ কর্তৃক এই সম্বর্ধনার পিছনে যে প্রেরণা ছিল, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ 'সঙ্গীত-সমাজ' শীর্ষক প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে লিখেছেন—

"ইংলণ্ডের কোন বিখ্যাত বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানের সভাপতি কলিকাতায় আসিয়া জগদীশচন্দ্রের গবেষণাগার দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তখন প্রেসিডেন্সী কলেজের ছুটী। জগদীশচন্দ্র সেই সময় উক্ত বৈজ্ঞানিককে ছুটীর সময় কলেজে লইয়া যাইয়া গবেষণাগার দেখাইয়াছিলেন। পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিককে কলেজের গবেষণাগার স্বয়ং দেখাইবার সুযোগে বঞ্চিত কলেজের য়ুরোপীয় অধ্যক্ষ জগদীশচন্দ্রের কৈফিয়ৎ তলব করেন, তিনি কেন অধ্যক্ষের বিনানুমতিতে একজন বাহিরের লোককে (stranger) কলেজের গবেষণাগার দেখাইয়াছেন? পত্রখানিতে জগদীশচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুরা অপমান বোধ করেন এবং জগদীশচন্দ্র পদত্যাগে প্রস্তুত হইয়া অধ্যক্ষকে লিখেন—ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানের সভাপতি যে সভ্যজগতে কোথাও stranger ইহা তিনি জানিতেন না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ জগদীশচন্দ্রের বন্ধুরা তাঁহার জন্য গবেষণাগার প্রতিষ্ঠায় চেষ্টিত হন এবং ত্রিপুরার মহারাজা সে জন্য বহু সহস্র টাকা দিতে সম্মত হন। একদিন প্রাতঃকালে বর্ত্তমান লেখক আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নিকট যাইয়া কথা প্রসঙ্গে এই সংবাদ দিলে রায় মহাশয় তখনই প্রতিবেশী জগদীশচন্দ্রের গৃহে যাইয়া তাঁহাকে পদত্যাগ-সংকল্প বর্জন করান।······সেই সময়, বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত ঘটনার জন্য 'সঙ্গীত-সমাজে' জগদীশচন্দ্রকে সম্বর্দ্ধিত করা হয়।"

ইউরোপে দ্বিতীয় সার্থক বৈজ্ঞানিক মিশনের শেষে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পর জগদীশচন্দ্র নতুন উৎসাহে উদ্ভিদের শারীরক্রিয়া সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গবেষণা সুরু করেন। পদার্থ ও শারীর-বিজ্ঞানের সমন্বয়ে নতুন ধারায় এই তথ্যানুসন্ধান সুরু হয়। প্রাণী ও জড়-জগতের দুস্তর ব্যবধানে রয়েছে বিচিত্র নির্বাক উদ্ভিদ-জগৎ। সৃষ্টির

ইতিবৃত্তের আলোচনায় পণ্ডিতেরা বলেছেন—এই পৃথিবীতে মানুষের বহু আগে উদ্ভিদের আবির্ভাব ঘটেছে। কবি বলেছেন, শুধু আবির্ভাব নয়, 'প্রাণের আনন্দ নিয়ে, শঙ্কা নিয়ে, দুঃখ নিয়ে, নির্জন পৃথিবীতে সে যুগ-যুগান্তর মানুষের অপেক্ষায় বসে ছিল।' 'বৃক্ষবন্দনা'[১] কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ উদ্ভিদের চৈতন্য-রূপের যে প্রশস্তি গেয়েছেন, বৈদিক সাহিত্যের সর্বত্র সে সুর ধ্বনিত; বেদব্যাস, মনু, উদয়ন, চক্রপাণি প্রমুখ হিন্দু মনীষিগণ উদ্ভিদকে প্রাণবন্ত বলে বর্ণনা করেছেন। তপোবন-সভ্যতার যুগ থেকে প্রকৃতির সঙ্গে মানব-মনের একাত্মবোধ গড়ে উঠেছে। নীরব নিস্পন্দ উদ্ভিদ-জগতে প্রাণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানুষের মনে একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল সত্য, কিন্তু বিজ্ঞানের সন্ধানী দৃষ্টিতে সে ইন্দ্রিয়াতীত প্রাণধর্মের কোনও লক্ষণ ধরা পড়ে নি। জগদীশচন্দ্র যে অন্বেষণ সুরু করেন, তার উদ্দেশ্য—নির্বাক উদ্ভিদ-জগতে প্রতিনিয়ত প্রাণধর্মের যে লীলা চলছে, প্রাণীর জীবনধর্মের মত তা একই ছন্দের অনুসারী—প্রাচীন ভারতীয় ঋষিগণের এই উপলব্ধিকে বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা। তিনি যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভিদ-দেহের যে স্পন্দনলিপি গ্রহণ করেন, দেখা যায়, প্রাণী-দেহের স্পন্দনের সবকিছু বৈশিষ্ট্য তাতে বর্তমান।

### রয়্যাল সোসাইটি কর্তৃক নিবন্ধ প্রত্যাখান

এই গবেষণার ফলাফল লিপিবদ্ধ করে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রয়্যাল সোসাইটিতে কয়েকটি নিবন্ধ পাঠানো হয়। জগদীশচন্দ্রের এই নতুন অবদানসমূহের মূল্য উপলব্ধি করে সোসাইটির কর্তৃপক্ষ উক্ত নিবন্ধগুলি তাঁদের ফিলজফিক্যাল ট্রানজ্যাকসনে প্রকাশ করবেন বলে স্থির করেন। কিন্তু এবারেও জীব-বিজ্ঞানীদের বিরোধিতায় শেষ মুহূর্তে নিবন্ধ প্রকাশ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়। রয়্যাল সোসাইটির

১। 'বনবাণী'-র প্রথম কবিতা ("অন্ধ ভূমিগর্ভ হতে শুনেছিলে সূর্যের আহ্বান")

কর্তৃপক্ষ জগদীশচন্দ্রকে লিখলেন—"যদিও আপনার গবেষণার যথেষ্ট মূল্য আছে, তথাপি ফলাফলসমূহ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এবং প্রচলিত তত্ত্বের বিরোধী। সুতরাং ভবিষ্যতে যতদিন না উদ্ভিদ-জগৎ নিজে থেকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে, ততদিন আপনার তথ্য সম্পর্কে আমরা কোনও মতামত প্রকাশে নিরস্ত থাকবো।"

নিবন্ধ প্রকাশে রয়্যাল সোসাইটির এই অসম্মতিতে জগদীশচন্দ্র দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন—"আমার ধারণা ছিল এই কুৎসিত মতদ্বন্দ্ব বুঝি অনেকদিন শেষ হয়েছে। কিন্তু এখন দেখছি, শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক মূল্যের ভিত্তিতে বিচার না করে ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে আমার নতুন নিবন্ধগুলিকে অবরোধ করা হচ্ছে। প্রতিপক্ষের নিশ্চিত ধারণা, আমি এই দূরান্তে নিরুত্তর বসে থাকবো। হয়তো তাই থাকতাম, কিন্তু এই অবস্থায় অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমি আনুপূর্বিক ঘটনা সম্পর্কে একটি বিবৃতি দিতে বাধ্য হয়েছি। বৈজ্ঞানিক আলোচনার পরিধির মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বন্দ্ব কতখানি লজ্জাকর, তা আমি গভীরভাবে অনুভব করছি।"

আত্মপ্রকাশের পথ যখন এমনিভাবে অবরুদ্ধ, জগদীশচন্দ্র সেই মানসিক উদ্‌বেগের মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন (২৯শে জুন, ১৯০৪)—"আমার মনটা একটু বিষণ্ন আছে। ১৯টি প্রবন্ধ লিখিয়াছি, তাহার একটিও প্রকাশিত হইতে পারিতেছে না। বই লিখিব মনে করি, কিন্তু সেই পুরাতন লেখা এখন দেখিতে ইচ্ছা করে না। আমার যে প্রতিদ্বন্দ্বী, আমার আবিষ্ক্রিয়া চুরি করিয়াছিল, সে একখানা পুস্তক লিখিয়াছে। তাহাতে লেখা আছে যে, পূর্বে লোকে মনে করিত যে, কেবল Sensitive Plant সাড়া দেয়; "But these notions are to be extended and we are to recognise that any vegetable protoplasm gives electric response."

প্রাসঙ্গিক গবেষণায় জগদীশচন্দ্রের মৌলিকতার কথা প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থকার গোপন রেখেছিলেন। জগদীশচন্দ্র এই পত্রে তার জন্যে বিস্ময় প্রকাশ করেন।

**বুদ্ধগয়া ভ্রমণ**

রবীন্দ্রনাথ সেবার শিলাইদহে 'পদ্মাতীরের কলহংসমুখর বালুতটে শারদশ্রীর শুভ শুভ্র সমাগম' প্রতীক্ষায়। সেখান থেকে তিনি জগদীশচন্দ্রকে লিখেছিলেন ( ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯০০ ) "বোধ করি মনে আছে, আপনি আমাকে একটি ভ্রমণ সঙ্গ দানে প্রতিশ্রুত আছেন, কাশ্মীরে হোক, উড়িষ্যায় হোক, ত্রিবাঙ্কুরে হোক, আপনার সঙ্গে ভ্রমণ করে আপনার জীবনচরিতের একটা অধ্যায়ের মধ্যে ফাঁকি দিয়ে স্থান পেতে ইচ্ছে করি। আশা করি, বঞ্চিত করবেন না—সেই ভবিষ্যৎ কোন একটা ছুটির জন্যে পাথেয় সঞ্চয় করে রাখছি।" বছর চারেক পরে ( ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ) সে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয় বুদ্ধগয়া ভ্রমণে। অন্যান্য সহযাত্রীদের মধ্যে ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা, স্বামী সদানন্দ, ব্রহ্মচারী অমূল্য ( স্বামী শঙ্করানন্দ ) ও আচার্য যদুনাথ সরকার। সেখানে তাঁরা মহান্তের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। বুদ্ধগয়া থেকে সকলে রাজগীর পরিভ্রমণে গিয়েছিলেন।

**জাতীয় ভবন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা**

আনন্দমোহন বসু তখন জগদীশচন্দ্রের বাড়ীতে মৃত্যুশয্যায়। এমনি রোগজীর্ণ দেহেই তিনি সার্কুলার রোডের অপর ধারে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর ফেডারেশন হলের ( বর্তমান মিলন মন্দির ) ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তাঁর ঘোষণাপত্রের বাংলা অনুবাদ পাঠ করেন রবীন্দ্রনাথ। এর প্রায় সপ্তাহখানেক পরে রাজনৈতিক আন্দোলনে ছাত্রদের যোগদান নিষিদ্ধ করে যে 'কার্লাইল সার্কুলার' প্রকাশিত হয়, তারই প্রতিবাদে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা। এসব

প্রতিষ্ঠা-উদ্‌যোগের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। জগদীশচন্দ্র তাঁর অধ্যাপনা ও গবেষণায় নিমগ্ন থেকেও দেশের শুভ-সাধনের পরিকল্পনা ও আন্দোলন সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না।

ফেডারেশন হলের পরিকল্পনা নিয়েই জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে পত্র লেখেন (২৩শে অক্টোবর, ১৯০৫)—"তোমাকে একটা বিষয় পরিষ্কার বুঝাইয়া দিতে হইবে। সর্ব্বপ্রথম আমাদের বঙ্গভবন প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। একটি মূর্ত্তিমান এবং বর্দ্ধমান জিনিষ আমাদের উৎসাহের প্রধান সহায় হইবে। তারপর এইস্থানে কেন্দ্র করিয়া যত বড় কাজ আরম্ভ হইবে। এই স্থানে ৫০০০ লোকের বসিবার হল যেন নির্মিত হয়। সেখানে প্রতি পক্ষে নিয়মিতরূপ ছাত্রদের জন্য বক্তৃতা, কথকতা প্রভৃতি হইবে। তারপর আমাদের সেই জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বক্তৃতা এখানে নিয়মিত দেওয়া হইবে। এই বিষয়টি অতি গুরুতর, কারণ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ছাত্রদিগকে বহিষ্কারের জন্য বিবিধ সাংঘাতিক চেষ্টা হইতেছে। ইহার প্রতিবিধান একান্ত আবশ্যক।

"এখানে রামমোহন রায়, বঙ্কিম, ঈশ্বরবিদ্যাসাগর প্রভৃতির স্মৃতিচিহ্ন থাকিবে ইত্যাদি। তুমি এই বিষয়ে অতি সুন্দর প্রবন্ধ প্রস্তুত করিবে। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন নানাস্থানে পঠিত হইবে। এই সময় আমাদের বিজ্ঞজনেরা বিবিধ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিবেন এবং ঘুমাইবার পরামর্শ দিবেন। এখনই জাগ্রত থাকিবার সময়। তোমাকে চৌকিদারী করিতে হইবে।"

এই সময় ৯৩, সার্কুলার রোডের বাড়ীতে মাঝে মাঝে গানের আসর বসতো; রবীন্দ্রনাথ দেশাত্মবোধক গান গাইতেন। হেমেন্দ্র মোহন বসু সে সব গান রেকর্ড করতেন।

### গবেষণা-গ্রন্থ প্রকাশ

কোন কোন মহলে ধরে নেওয়া হলো, রয়্যাল সোসাইটি কর্তৃক জগদীশচন্দ্রের নিবন্ধ প্রকাশে অসম্মতির অর্থ আর কিছুই নয়, পাশ্চাত্ত্য

সমাজে তাঁর বৈজ্ঞানিক মতসমূহের চূড়ান্তভাবে পরিত্যক্ত হওয়া। গবেষণার জন্যে সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে যে সামান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছিল, এই পরিস্থিতিতে তাও বন্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কা দেখা দিল। জগদীশচন্দ্র কিছুমাত্র নিরুৎসাহিত না হয়ে বিজ্ঞানী-সমাজে আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার বিকল্প পন্থা অনুসরণ করলেন। খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে লংম্যান্‌স্ থেকে গবেষণার ফলাফল সম্বলিত দু'খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হলো—Plant Response as a means of Physiological Investigation (১৯০৬) ও Comparative Electrophysiology (১৯০৭)। সন্নিবেশিত তথ্যের প্রাচুর্যে এই দুইখানি গ্রন্থ বৈজ্ঞানিক গবেষণার ইতিহাসে স্মরণীয় কীর্তি। উদ্ভিদের দর্শনাতীত জীবনের অব্যক্ত কাহিনী তুলে ধরা হলো এই দু'খানি গ্রন্থে। নির্বাকের অন্তঃপুরে আমাদের মত একটা সুসংহত জৈব-ক্রিয়া চলছে। প্রাণের উচ্ছ্বাস, আঘাতে বেদনাবোধ ও মরণের আক্ষেপ, উদ্ভিদের জীবন-নাট্যের প্রতিমুহূর্তের ইতিহাস লেখা হলো যন্ত্রের সঙ্কেত-লিপিতে।

জগদীশচন্দ্রের এই দু'খানি নবপ্রকাশিত গবেষণা-গ্রন্থ বিজ্ঞানী-মহলে অভাবনীয় আগ্রহের সঞ্চার করে। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে এই পুস্তকে সন্নিবেশিত পরীক্ষাসমূহ সাফল্যের সঙ্গে অনুসৃত হয়। কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে শারীরবিজ্ঞান সম্পর্কিত নানাবিধ তথ্যানুসন্ধানের কাজে জগদীশচন্দ্রের পরিকল্পিত 'অপ্‌টিক্যাল লিভার' নামক যন্ত্রের ব্যবহার সুরু হয়। য়ুট্রেক্‌টে ভ্যান্ ডার্ উল্‌ক্ ও কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হার্পার জগদীশচন্দ্রের উদ্ভাবিত বিবিধ পদ্ধতি তাঁদের গবেষণায় প্রয়োগ করেন। এই সময় রাশিয়ার তাস্‌খন্দ্ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লেনো জগদীশচন্দ্রের কাছে তাঁর গ্রন্থসমূহ রুশ ভাষায় তর্জমা করবার অনুমতি চেয়ে চিঠি লেখেন—"তুলনামূলক ইলেক্ট্রো-ফিজিয়োলজি, শারীরবিজ্ঞানের এই বিশেষ শাখার অভাবনীয় সাফল্য

আপনার কৃতিত্বের পরিচায়ক। রুশ ভাষায় আপনার গ্রন্থসমূহের অনুবাদ রুশীয় শারীরবিজ্ঞানীদের পক্ষে খুবই সহায়ক হবে।” বোম্বাইয়ের ‘টাইম্‌স্ অব ইণ্ডিয়া’ নামক পত্রিকা এই গ্রন্থ রচনার জন্যে জগদীশচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়ে লেখেন—“রাজনৈতিক আন্দোলনের নায়ক হিসেবে যখন বাংলাদেশ সাধারণ মানুষের কাছে পরিচিত, ঠিক সেই সময় অধ্যাপক বসুর গ্রন্থ দু'খানি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিল, বাঙ্গালী-প্রতিভা মহত্তর কর্মে ব্রতী।”

## তৃতীয়বার বিদেশ-যাত্রার উদ্‌যোগ

বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানী-সমাজে তাঁর গবেষণার এই আশাতীত সমাদরে এবং পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানী-মহল তাঁর নতুন পরীক্ষার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করায় জগদীশচন্দ্র ইউরোপ ও আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক মিশনে যাওয়া প্রয়োজন বোধ করলেন। জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার এই বিশ্ববিশ্রুতির কথা সরকারী কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাত ছিল না। বাংলার তৎকালীন লাট সার অ্যাণ্ডু ফ্রেজারের নির্দেশে জগদীশচন্দ্র তাঁকে এক চিঠি লেখেন। চিঠিতে ছিল পূর্বকৃত ও সমসাময়িক গবেষণার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও পরিকল্পিত গবেষণার জন্যে আর্থিক সাহায্যের প্রার্থনা। সমকালীন দেশীয় পত্রিকার অন্যতম ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ সেদিন জগদীশচন্দ্রের আবেদনে দৃঢ়ভাবে সমর্থন জানিয়েছিল। হয়তো তারই পরোক্ষ ফল—১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস থেকে শিক্ষাবিভাগে তাঁর পদোন্নতি ও বেতনবৃদ্ধি।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিক। জগদীশচন্দ্র ছুটির জন্যে আবেদন করেছেন—ইউরোপ যাত্রার প্রস্তুতি চলছে। ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটের উদ্‌যোগে এক সভার অনুষ্ঠান হচ্ছে মেডিক্যাল কলেজের রসায়ন বিভাগে। ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত এই সভায় বক্তৃতা শোনবার জন্যে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ

করেছিলেন। সভাপতি সার অ্যাণ্ড্রু ফ্রেজার, ফাদার লাফোঁ-ও উপস্থিত। জগদীশচন্দ্র তাঁর নতুন আবিষ্কার বিষয়ক "জীবন ও মৃত্যুর সঙ্কেত-লিপি ( Curves of Life and Death )" সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। সেই চিত্তাকর্ষক বক্তৃতার জন্যে জগদীশচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়ে ফ্রেজার সভাপতির ভাষণে বলেন—"অধ্যাপক বসু ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্যে ছুটি নিয়ে ইংল্যাণ্ডে যাচ্ছেন। সেই সঙ্গে তিনি ইউরোপের বিজ্ঞানী-মহলের নিকট অভিনব গবেষণার বার্তা বয়ে নিয়ে যেতে চান। আমরা তাঁর শুভ কামনা করি—তিনি সুস্থ শরীরে তাঁর সঙ্কল্প সার্থক করে পরম তৃপ্তি নিয়ে প্রবাস থেকে ফিরে আসুন।"

## তৃতীয়বার ইউরোপযাত্রা

জগদীশচন্দ্র ছুটির জন্যে আবেদন করলেও বাংলাসরকারের কর্তৃপক্ষ পূর্ববর্তী মিশনের সাফল্যের কথা বিবেচনা করে তাঁকে ডেপুটেশনে পাঠানো যুক্তিযুক্ত মনে করলেন। জগদীশচন্দ্রকে ডেপুটেশনে পাঠাবার প্রয়োজনীয়তা সমর্থন করে গোপালকৃষ্ণ গোখেল এই সময় ভারত সরকারের কাছে এক স্বতন্ত্র চিঠি লিখেছিলেন। ভারতসচিবের কাছ থেকে এই ব্যাপারে চূড়ান্ত অনুমোদন আসতে বিলম্ব হওয়ায় জগদীশচন্দ্র আপাততঃ ছুটি নিয়ে ইংল্যাণ্ডে যাত্রা করা সঙ্গত মনে করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছুটি মঞ্জুর হয়ে গেল। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর তিনি পরিকল্পিত মিশনে ইউরোপ যাত্রা করেন। পরের বছর ৮ই এপ্রিল কর্তৃপক্ষ জগদীশচন্দ্রকে জানিয়ে দেন, ভারতসচিব এক বছরের জন্যে ডেপুটেশন মঞ্জুর করেছেন।

ইউরোপ যাত্রার পথে বোম্বাই থেকে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে একখানি ছোট্ট চিঠি লেখেন। বিদেশে যাত্রার সময় উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ হয় নি, সে জন্যে আন্তরিক বেদনাবোধের উল্লেখ ছিল তাতে।

বোম্বাই পর্যন্ত সহযাত্রী ছিলেন ডক্টর পি. কে. রায়ের পুত্র সরলকুমার রায় ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ( দেশপ্রিয় )। জগদীশচন্দ্র ব্রিণ্ডিসি বন্দরে নেমে সেখান থেকে জার্মেনী হয়ে নভেম্বর মাসের শেষের দিকে লণ্ডনে পৌঁছেন। সেখানে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে বসুদম্পতির সাক্ষাৎ হয়। এর অল্প কয়েকদিন আগে রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠপুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়েছে। সে দুঃসংবাদ শুনে জগদীশচন্দ্র কবি বন্ধুকে লিখলেন—"তোমার এই শোকের সময়ে কেবলমাত্র আমার হৃদয়ের বেদনা জানাইতেছি। তোমার সুখ-দুঃখের সাথী আমি। কি করিয়া তোমাকে সান্ত্বনা দিব জানি না। আমাদের দুজনেরই অনেক প্রিয়জন পরপারে। সুতরাং সে দেশ আর দূরদেশ মনে হয় না।"

এবারকার মিশনে জগদীশচন্দ্র ইংল্যাণ্ডে খুব বেশীদিন থাকতে পারেন নি। তবু সঙ্কীর্ণ সময়ের মধ্যে তিনি কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদগ্ধ বৈজ্ঞানিক সংস্থার সাদর আমন্ত্রণে যে বক্তৃতা দেন, তাতে পূর্ববর্তী মিশনের সাফল্য অতিক্রান্ত না হোক, তার পুনরাবৃত্তি হয়েছিল।

এই সময় রবীন্দ্রনাথ একখানি পত্রে, অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনের ( ডিসেম্বর, ১৯০৭ ) ব্যর্থতা, 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার সমকালীন সংখ্যাসমূহে স্বাধীনতার অভয়মন্ত্রপূর্ণ কোন উদার বাণীর অভাব প্রভৃতির উল্লেখ করে লিখেছেন—"আমি যখনই আমাদের দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া দেখি তখনই আমাকে আমার নিজের দুঃখতাপ হইতে টানিয়া বাহির করিয়া আনে। আমাদের অসহ্য দুর্দশার মূর্তি ঘরে ও বাহিরে আজকাল এমনি সুপরিস্ফুট হইয়া দেখা দিয়াছে যে, নিজের ব্যক্তিগত ক্ষতি লইয়া পড়িয়া থাকিবার সময় আমাদের আর নাই।" জগদীশচন্দ্র দেশের এই সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত মর্মাহত। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর পাবনা অধিবেশন আসন্ন, রবীন্দ্রনাথ সভাপতির আসন গ্রহণ করবেন।

রবীন্দ্রনাথ তখন গ্রামে গ্রামে যথার্থভাবে স্বরাজ স্থাপনের চিন্তায় ও নিজের সাধ্যমত তার উদ্‌যোগে ব্রতী। সুতরাং প্রাদেশিক সম্মিলনীতে তাঁর অভিভাষণ ও সঙ্কল্পের সার্থকতা সম্বন্ধে জানবার জন্যে জগদীশচন্দ্র একান্ত উৎসুক। জগদীশচন্দ্র এই সময়ে লণ্ডনে বসে তাঁর ছাত্র সুরেশচন্দ্র নাগের সঙ্গে বোলপুর ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় সম্পর্কে নানারকম উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করতেন। বোলপুরে একটি টেক্‌নিক্যাল বিভাগ খোলবার ব্যাপারে তিনিই রবীন্দ্রনাথের মনে আগ্রহসঞ্চার করেন।

## প্রথম আমেরিকা ভ্রমণ

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে জগদীশচন্দ্র ইংল্যাণ্ড থেকে আমেরিকা রওনা হন। মাঝে (৪ঠা সেপ্টেম্বর) তিনি ডাব্‌লিনে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনে একটি বক্তৃতা দেন।[১] জগদীশচন্দ্রের এই প্রথম আমেরিকা যাত্রা। কিন্তু প্রকাশিত নিবন্ধ ও গ্রন্থসমূহের মাধ্যমে তিনি এখানকার বিজ্ঞানী-মহলে অনেক আগে থেকেই পরিচিত। সুতরাং খুবই স্বাভাবিক, আমেরিকার বিজ্ঞান-কর্মিগণ তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে এবং তাঁর বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ধারার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভের জন্যে উৎসুক হয়েছিলেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও সোসাইটি থেকে যে সব আমন্ত্রণ এসেছিল, তার সবগুলি তিনি রক্ষা করতে পারেন নি। কিন্তু ইলিনয়, অ্যান্ আর্বর, উইস্‌কন্‌সিন্ ও শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়, বোস্টন মেডিক্যাল সোসাইটি, বটানিক্যাল সোসাইটি অব আমেরিকা (বাল্টিমোর), শিকাগো অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস্ প্রভৃতি স্থানে তিনি যে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তা প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও সাধারণ মানুষের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন লাভ করেছে। অ্যামেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি অ্যাড্‌ভান্সমেণ্ট অব সায়েন্স-এর আমন্ত্রণে জগদীশচন্দ্র বাল্টিমোরে

১। "Mechanical and Electrical Response in Plants."

এক বক্তৃতা দেন। উপস্থিত বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলী আনন্দ ও বিস্ময় প্রকাশ করেন। ওয়াশিংটনে কৃষি-গবেষণা বিভাগের কর্মিগণ বলেন, জগদীশচন্দ্রের অনুসন্ধান থেকে তাঁরা যথেষ্ট ফল প্রত্যাশা করেন।

এত সম্মান ও সম্বর্ধনার মধ্যে জগদীশচন্দ্র দেশের অবারিত আকাশ, অপর্যাপ্ত আলোক এবং নিরবচ্ছিন্ন অবকাশের জন্যে উন্মুখ। তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন—'বোলপুরের সীমাহীন প্রান্তর দেখিতে পাইতেছি। সেই প্রথম যখন শিলাইদহে গিয়াছিলাম—সে আজ কত বৎসরের কথা—আজও প্রত্যেক দৃশ্য মনে পড়িতেছে। অনেকগুলি ছোট ছোট গল্প লিখিয়া রাখিও। প্রতিদিন একটি বা দুটি শুনাইতে হইবে। জীবনের সন্ধ্যাকালে স্বপ্নরাজ্য জাগিয়া উঠিবে।"

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের অগাষ্ট মাসে বসুদম্পতি ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন। জাহাজে সহযাত্রী ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। তিনি বোম্বাই থেকে মাদ্রাজ অভিমুখে চলে যান। জগদীশচন্দ্র অবলা বসুকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। ভগিনী নিবেদিতাও অল্প কিছু দিন পরে কলকাতায় উপস্থিত হন। এই সময় জগদীশচন্দ্র, অবলা বসু ও শ্রীঅরবিন্দ ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর বাগবাজার, বোসপাড়া লেনের বাড়ীতে মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ করতেন।

## নবম অধ্যায়

# বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনীর ময়মনসিংহ অধিবেশনে সভাপতিত্ব

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল তারিখে ময়মনসিংহে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনীর চতুর্থ অধিবেশনে হয়। সম্মিলনীর কর্তৃপক্ষ জগদীশচন্দ্রকে সেই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবার জন্যে মনোনয়ন করেন। জীবনের বৃহত্তর অংশ বিজ্ঞান-অনুশীলনে অতিবাহিত হলেও সাহিত্য-সম্মিলনীর এই সাদর আমন্ত্রণ তিনি বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেন। কারণ সাহিত্য ও বিজ্ঞানের মধ্যে আপাত-বিরোধকে তিনি কখনও স্বীকার করেন নি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা এবং বাংলা সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ তার নিদর্শন। সভাপতির অভিভাষণে তিনি সে কথা উল্লেখ করেন। মহারাজা কুমুদচন্দ্র সিংহ ছিলেন সম্মিলনীর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। অধিবেশনের কয়েকদিন পূর্বে তিনি জগদীশচন্দ্রকে জানান যে, অধিবেশন উপলক্ষে তাঁর আবিষ্ক্রিয়া সম্বন্ধে বক্তৃতা শোনবার জন্যে স্থানীয় অধিবাসী ও সম্মিলনীর সভ্যগণ উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন। জগদীশচন্দ্র সানন্দে এই প্রস্তাবে সম্মত হন। এর কয়েকদিন পরে মহারাজার কাছ থেকে আর এক অনুরোধ আসে। জগদীশচন্দ্রের পক্ষে সে অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। মহারাজা লিখেছিলেন—"বিজ্ঞান বিষয়ক ভাষণ শোনবার জন্যে সাধারণের যে রকম আগ্রহ দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয়, বক্তৃতা-গৃহে[১] স্থান সঙ্কুলান হবে না। সে কারণে অভ্যর্থনা সমিতি প্রবেশমূল্য ধার্য করতে ইচ্ছুক। জগদীশচন্দ্র উত্তরে কুমুদচন্দ্র

১। ময়মনসিংহ টাউন-হলে আলোচ্য বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

সিংহকে জানালেন—ময়মনসিংহ জমিদারপ্রধান স্থান, টাকা হয়তো উঠতে পারে, কিন্তু শুধু বিত্তশালী লোকের জন্যে বক্তৃতা দিতে তিনি প্রস্তুত নন। কোনও প্রবেশমূল্য যেন ধার্য না করা হয়। প্রয়োজন হলে তিনি দু'দিন বক্তৃতা দেবেন। এই প্রস্তাব অনুসারে স্থির হয়, একদিন ইংরেজীতে এবং আর একদিন বাংলায় বক্তৃতা হবে।

সাহিত্য-সম্মিলনীর সভাপতি হিসেবে জগদীশচন্দ্র যে ভাষণ দেন, তা বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। এই ভাষণ "বিজ্ঞানে সাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধাকারে 'অব্যক্ত' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তার আংশিক উদ্‌ধৃতি এখানে দেওয়া হলো।

"এই সাহিত্য-সম্মেলন বাঙ্গালীর মনে এক ঘনীভূত চেতনাকে বাঙ্গলা দেশের এক সীমা হইতে অন্য সীমায় বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে এবং সফলতার চেষ্টাকে সর্ব্বত্র গভীর ভাবে জাগাইয়া তুলিতেছে।···আজ আমরা আমাদের চিত্তের সমস্ত সাধনাকে সাহিত্যের নামে এক করিয়া দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি।"

ইতিপূর্বে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রও একদিন এই সম্মিলন সভার প্রধান আসনে বৃত হয়েছিলেন। সে প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্র বলেন—এ বিজ্ঞানী সমাদরের মধ্যে সাহিত্যের একটি উদার মূর্তি প্রকাশিত হয়েছে। কবি ও বিজ্ঞানীর সাধর্ম্য আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন—

"কবি এই বিশ্বজগতে তাঁহার হৃদয়ের দৃষ্টি দিয়া একটি অরূপকে দেখিতে পান, তাহাকেই তিনি রূপের মধ্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। অন্যের দেখা যেখানে ফুরাইয়া যায় সেখানেও তাঁর ভাবের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় না। সেই অপরূপ দেশের বার্ত্তা তাঁহার কাব্যের ছন্দে ছন্দে নানা আভাসে বাজিয়া উঠিতে থাকে। বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে কিন্তু কবিত্ব সাধনার সহিত তাঁহার সাধনার ঐক্য আছে। দৃষ্টির আলোক যেখানে শেষ হইয়া যায় সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ করিতে থাকেন। শ্রুতির শক্তি যেখানে

সুরের শেষ সীমায় পৌঁছায় সেখান হইতেও তিনি কম্পমান বাণী আহরণ করিয়া আনেন। প্রকাশের অতীত যে রহস্য, প্রকাশের আড়ালে বসিয়া দিনরাত্রি কাজ করিতেছে, বৈজ্ঞানিক তাহাকেই প্রশ্ন করিয়া দুর্ব্বোধ উত্তর বাহির করিতেছেন এবং সেই উত্তরকেই মানব-ভাষায় যথাযথ ব্যক্ত করিতে নিযুক্ত আছেন।"

বহুদিন পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যে একবার গুহামন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। সেখানে এক গুহার মধ্যে অর্দ্ধ অন্ধকারে বিশ্বকর্মার মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত দেখিলাম।···সেই মহাশিল্পীর আবির্ভাবের ফলেই আমাদের জড়দেহ চেতনাময় ও সৃজনশীল হইয়া উঠিয়াছে। সেই আমাদের সৃজনশক্তিরই একটি চেষ্টা বাঙ্গালা সাহিত্য-পরিষদে আজ সফলমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।"

জগদীশচন্দ্র তাঁর আবিষ্কার সম্বন্ধে সাধারণের জন্যে পরীক্ষা সহযোগে ইংরেজী ও বাংলায় যে দুটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তা লোকরঞ্জক বিজ্ঞান-সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। কোথাও পারিভাষিক শব্দের বন্ধন নেই, প্রাঞ্জল বর্ণনার গুণে দুরূহ বৈজ্ঞানিক তথ্য সেদিন শ্রোতৃবর্গের অন্তস্তলে গিয়ে পৌঁচেছিল। বাংলা ভাষার মাধ্যমে জনসভায় এই বোধ হয় প্রথম বিজ্ঞান-আলোচনা।

**উদ্ভিদ-জীবনের রহস্য-সন্ধান**

পাশ্চাত্য দেশে তৃতীয় সার্থক বৈজ্ঞানিক মিশন সমাপ্ত করে ভারতবর্ষে ফিরে আসবার পর জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদ-দেহে স্পন্দনের আরও নিখুঁত পরিমাপের জন্যে সূক্ষ্মতর যন্ত্র নির্মাণের পরিকল্পনার দিকে দৃষ্টি দেন। এর ফলে 'রেজোন্যান্ট রেকর্ডার', 'অসিলেটিং রেকর্ডার' প্রভৃতি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রসমূহ উদ্ভাবিত হয়। জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদের জৈব-ক্রিয়া সম্বন্ধে পূর্বে যা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, এই যন্ত্রগুলির সাহায্যে তা আরও নিখুঁতভাবে পুনরাবৃত্তি ও সমর্থন করা সম্ভব হলো। শুধু

তাই নয়, প্রাণীদেহের মত উদ্ভিদের দেহেও স্নায়ুতন্ত্রের সন্ধান পাওয়া গেল। জগদীশচন্দ্র এসব নতুন তথ্যানুসন্ধানের ফলাফল লিপিবদ্ধ করে রয়্যাল সোসাইটিতে "On an Automatic Method for the Investigation of the Velocity of Transmission of Excitation in Mimosa" শীর্ষক যে নিবন্ধ পেশ করেন, তা ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে 'ফিলজফিক্যাল ট্র্যানজ্যাকশন্‌স্‌-'এ প্রকাশিত হয়। এই সময় লংম্যানস্‌ কর্তৃক তাঁর নতুন গবেষণা ও তথ্য-সম্বলিত "Researches on the Irritability of Plants" নামে একখানি গ্রন্থ এবং 'Annals of Botany' পত্রিকায় অপর একটি নিবন্ধ[১] প্রকাশিত হয়। এই নিবন্ধ ও গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জগদীশচন্দ্র ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও সোসাইটিতে বক্তৃতা দেবার জন্যে আমন্ত্রিত হন। বিশেষ আমন্ত্রণে তিনি এই সময় পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনটি ভাষণ দেন।

### প্রতিভার রাজকীয় স্বীকৃতি

সরকারী মহলেও তাঁর প্রতিভা উপযুক্ত স্বীকৃতি লাভ করে। ভারতবর্ষের তৎকালীন ভাইস্‌রয় লর্ড হার্ডিঞ্জের ব্যক্তিগত সুপারিশে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে জগদীশচন্দ্রকে সি. এস. আই. উপাধিতে ভূষিত করা হয়। হার্ডিঞ্জ একবার জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন—"অত্যন্ত আনন্দের কথা, বিজ্ঞানের এক বিশেষ শাখায় একজন ভারতবাসী পুরোবর্তীর আসনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।" এর কিছুদিন পরে ( ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই মার্চ তারিখের সমাবর্তন সভায় ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অব সায়েন্স উপাধি দিয়ে জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-প্রতিভাকে সম্মানিত করেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে লিখিত এক চিঠিতে জগদীশচন্দ্র বাংলা সরকারের কাছে

---

১। Diurnal Variation of Moto-excitability in Mimosa."

তাঁর পরিকল্পিত গবেষণার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত অর্থসঙ্গতির জন্যে আবেদন করেন। পার্বত্য অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা পরিবেশে একটি বীক্ষণাগার স্থাপন করে ইউরোপীয় ও মেরু অঞ্চলের কৃত্রিম আবহাওয়ায় উদ্ভিদ-জীবন নিয়ে গবেষণা এবং কলকাতার বাইরে একটি পরিচ্ছন্ন পরীক্ষামূলক উদ্যান রচনা এই পরিকল্পনার অঙ্গীভূত ছিল। কর্তৃপক্ষ জগদীশচন্দ্রের আবেদন আংশিকভাবে পূরণ করেন। জগদীশচন্দ্র পাঁচ বছরের জন্যে বার্ষিক চব্বিশ হাজার টাকা অর্থ-সাহায্য চেয়েছিলেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে লিখিত এক চিঠিতে ভারতসচিব তিন বছরের জন্যে বার্ষিক আঠারো হাজার টাকা সাহায্যদানের সিদ্ধান্ত জানান। পরিকল্পিত গবেষণায় আশানুরূপ সাফল্য দেখা গেলে আরও দু'বছর এই অর্থ-সাহায্য দেওয়া হবে—ভারত সরকারকে এই মর্মে এক নির্দেশ দিয়ে রাখা হয়।

## রামমোহন লাইব্রেরী

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্র রামমোহন লাইব্রেরীর সভাপতি নির্বাচিত হন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। ১৯১২ থেকে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ, এই সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর তিনি রামমোহন লাইব্রেরীর নানা সংস্কার ও উন্নয়ন-কার্যে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁরই উদ্‌যোগে এখানে প্রতি শনিবার সান্ধ্য বক্তৃতার প্রবর্তন করা হয়। স্বদেশীযুগের চারণকবি মুকুন্দ দাসের যাত্রাদলে হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামে এক যুবক ছিলেন। তিনি ভাল কথকতা জানতেন। জগদীশচন্দ্র ছিলেন এসব যাত্রা ও কথকতার আশৈশব অনুরাগী। তিনি হেমচন্দ্রকে বাড়ীতে ডেকে এনে অনেকবার তাঁর কথকতা শুনেছেন। রামমোহন লাইব্রেরীতেও তিনি ধারাবাহিকরূপে হেমচন্দ্রের কথকতার ব্যবস্থা করেন এবং তিনি নিজে ছিলেন অন্যতম উৎসাহী শ্রোতা।

## রবীন্দ্রনা'থের নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্তি

জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যখন প্রথম পরিচয়, তখন উভয়ের 'জীবন ভোর বেলাকার মেঘের মত অস্পষ্ট, কিন্তু নানা রঙে রঙীন ; আত্মপ্রকাশের স্রোত নানা বাঁকে বাঁকে আপনাতে আপনি বিস্মিত হয়ে চলেছিল'। জগদীশচন্দ্র তখন দ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক মিশনে ইংল্যাণ্ড-প্রবাসে ; ইউরোপীয় বিজ্ঞানী-সমাজের স্বীকৃতির জন্যে তিনি বাধা-বিঘ্নিত পথে যাত্রা সুরু করেছেন। কবিবন্ধু তাঁর প্রধানতম শুভানুধ্যায়ী। স্বদেশের সঙ্কীর্ণ সীমা অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-কীর্তির কথা তখন বিশ্বভূমিকায় পরিব্যাপ্ত হয় নি। জগদীশচন্দ্র সে সময় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সৃষ্টি, বিশেষ করে গল্পগুলি ভাষান্তরিত করে তাকে বৃহত্তর মানব-সমাজের কাছে প্রকাশ করবার আন্তরিক চেষ্টা করেন। অবশ্য এই ভাষান্তরণের ফলে মূল রচনার সৌন্দর্য কতখানি অক্ষুণ্ণ থাকবে, সে সম্বন্ধে কবি ও বিজ্ঞানী উভয়েরই যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্রকে লিখেছিলেন [ ডিসেম্বর, ( ১৯০০ ) ]—"আমার রচনালক্ষ্মীকে তুমি জগৎ-সমক্ষে বাহির করিতে উদ্যত হইয়াছ—কিন্তু তাহার বাঙ্গলা-ভাষা বস্ত্রখানি টানিয়া লইলে দ্রৌপদীর মত সভাসমক্ষে তাহার অপমান হইবে না তো ? সাহিত্যের ঐ বড় মুস্কিল, ভাষার অন্তঃপুরে আত্মীয়-পরিজনের কাছে সে যে ভাবে প্রকাশমান, বাহিরে টানিয়া আনিতে গেলেই তাহার ভাবান্তর উপস্থিত হয়।" জগদীশচন্দ্রের এই উদ্‌যোগ তখন বিশেষ সার্থক হয় নি। সে জন্যে তাঁর মনে গভীর বেদনা ছিল। দীর্ঘদিন পরে রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হবার পর পাশ্চাত্ত্যের বিদগ্ধ সমাজে তিনি যে অকুণ্ঠিত সম্মান লাভ করলেন, তাতে সবচেয়ে বেশী আনন্দিত হলেন তাঁর নিঃসঙ্গ প্রথম জীবনের বন্ধু জগদীশচন্দ্র। তিনি লিখলেন ( ১৯শে নভেম্বর, ১৯১৩ ) —"পৃথিবীতে তোমাকে এতদিন জয়মাল্য ভূষিত না দেখিয়া বেদনা অনুভব করিয়াছি। আজ সেই দুঃখ দূর

হইল। দেবতার এই করুণার জন্য কি করিয়া আমার কৃতজ্ঞতা জানাইব? চিরকাল শক্তিশালী হও, চিরকাল জয়যুক্ত হও। ধর্ম্ম তোমার চির সহায় হউন।”

নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্তি উপলক্ষে শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে বাংলাদেশের সাহিত্যানুরাগীদের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথকে যে অভিনন্দন দেওয়া হয়, তাতে সভাপতিত্ব করেন জগদীশচন্দ্র। স্বীয় সাধনার প্রতীক স্বরূপ জগদীশচন্দ্র সেদিন রবীন্দ্রনাথকে ছোট্ট মাটির টবে বসানো একটি লজ্জাবতী লতা উপহার দিয়েছিলেন।

## চতুর্থবার ইউরোপ-যাত্রা

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্রের বয়স পঞ্চান্ন পূর্ণ হয়। সে বছরই সরকারী চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করবার কথা। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ও অধ্যাপনা-কুশলতার জন্যে কার্যকাল আরও দু'বছর বাড়িয়ে দেন। সরকারী নির্দেশে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে জগদীশচন্দ্র চতুর্থ বৈজ্ঞানিক মিশনে পাশ্চাত্ত্য দেশে গমন করেন। ইউরোপ যাত্রার পূর্বে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর তিনি লজ্জাবতী লতার স্নায়বিক স্পন্দন সম্পর্কে কলকাতায় এক বক্তৃতা দেন। সভাপতি ছিলেন বাংলার তৎকালীন লাট লর্ড কারমাইকেল।

এবারকার বৈজ্ঞানিক মিশনে জগদীশচন্দ্র সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি ছাড়াও সঙ্গে করে লজ্জাবতীর মত কয়েকটি স্পর্শকাতর উদ্ভিদ নিয়ে যাওয়া সঙ্গত মনে করলেন। কারণ যে সময় ইউরোপীয় বিজ্ঞান-সমিতি-গুলির পূর্ণ অধিবেশন চলে, তখন সেখানকার অধিকাংশ উদ্ভিদই নির্জীব অবস্থায় থাকে।

যথেষ্ট সতর্কতা সত্ত্বেও সমুদ্র-পথেই অর্ধেক গাছ বিনষ্ট হয়ে যায়। লণ্ডনে পৌঁছাবার পর বাকী গাছগুলিকে সযত্নে রাখা হয় রিজেণ্টস্

পার্কে। সেখানে নিরক্ষীয় অঞ্চলের উদ্ভিদসমূহ সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

জগদীশচন্দ্র মেইডা ভেইলে একটি অস্থায়ী গবেষণাগার গড়ে তোলেন। শীতপ্রধান ইংল্যাণ্ডের আবহাওয়ায় নিরক্ষীয় অঞ্চলের গাছপালা নিয়ে পরীক্ষার ব্যাপারে তিনি প্রথমটায় বেশ অসুবিধা বোধ করেছিলেন। ইংল্যাণ্ডের বিদগ্ধ জনমণ্ডলীর অনেকে জগদীশচন্দ্রের এই গবেষণাগার পরিদর্শন করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি সার উইলিয়াম ক্রুক্‌স্ ও আরও অনেক প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানী। জগদীশচন্দ্রকে সার উইলিয়াম ক্রুক্‌স্ লিখেছিলেন—"উদ্ভিদের স্বতঃস্পন্দন লিপিবদ্ধ করবার অভিনব যান্ত্রিক কৌশল দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। শারীরবিজ্ঞানের গবেষণায় আপনার এই লিপি-গ্রহণ-কৌশলের যথেষ্ট মূল্য হবে বলে আমি মনে করি।" একজন প্রখ্যাত শারীরবিজ্ঞানী উদ্ভিদের প্রাণ-স্পন্দন প্রত্যক্ষ করে যে অকুণ্ঠ স্বীকারোক্তি করেছিলেন, তাতে জগদীশচন্দ্রের বিস্ময়ের অন্ত ছিল না। তিনি বলেছিলেন—"আমারই ভোটের জোরে রয়্যাল সোসাইটিতে উদ্ভিদের চেতনা সম্পর্কে আপনার নিবন্ধ প্রকাশ না করবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেদিন আমি বিশ্বাস করতে পারি নি যে, উদ্ভিদ-দেহে প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভব। আমি মনে করেছিলাম, প্রাচ্যসুলভ কল্পনাপ্রবণতা আপনাকে ভুল পথে চালিত করেছে। আজ আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি, আপনার মত অভ্রান্ত।" মৃত্যুর মুহূর্তে উদ্ভিদ-দেহে যে দারুণ আক্ষেপের সৃষ্টি হয়, সঙ্কেত-লিপিতে তার আভাস দেখে পরিহাসরসিক নাট্যকার বার্নার্ড-শ মনে গভীর দুঃখ অনুভব করেছিলেন। বিভিন্ন জার্ন্যাল ও সংবাদপত্রের সম্পাদক মেইডা ভেইলের পরীক্ষাগার দেখতে আসেন এবং সেখানে উদ্ভিদ-প্রকৃতির বিচিত্র অভিব্যক্তি নিয়ে যে গবেষণা চলছিল, তিনি তার বিস্তৃত কাহিনী পরিবেশন করেন। এভাবে সমাজের বিভিন্ন স্তরে উদ্ভিদ-জীবন সম্পর্কে অপরিসীম আগ্রহ সঞ্চারিত হয়।

জগদীশচন্দ্র বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা দেবার জন্যে আমন্ত্রিত হন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় (২০শে মে),[১] কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় (২রা জুন)[২] ও রয়্যাল কলেজ অব সায়েন্সে তিনি যে বক্তৃতা দেন, তা যথেষ্ট সমাদৃত হয়। পূর্ববর্তী মিশনগুলিতে বক্তৃতার সঙ্গে পরীক্ষা প্রদর্শনের কাজ জগদীশচন্দ্র নিজেই করেছেন। কিন্তু বর্তমান মিশনে এই ব্যাপারে সহযোগিতা করেন বশীশ্বর সেন ও জ্যোতিপ্রকাশ সরকার। জগদীশচন্দ্রের গবেষক জীবনে এঁরা ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা সভায় সভাপতি ছিলেন সার ফ্রান্সিস ডারউইন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মে তারিখে জগদীশচন্দ্র তৃতীয়বার রয়্যাল ইন্‌স্টিটিউশনে সান্ধ্য বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল "উদ্ভিদের সঙ্কেত-লিপি ও তার অভিব্যঞ্জনা" (On Plant Autographs and Revealation)। বক্তৃতার উপসংহারে জগদীশচন্দ্র বলেন—"এই আমাদের মূক সঙ্গী, আমাদের দ্বারপ্রান্তে নিঃশব্দে যাদের জীবনের লীলা চলছে, তাদের গভীর মর্মবাণী তারা ভাষাহীন অক্ষরে লিপিবদ্ধ করে দিল, ব্যক্ত করে গেল জীবনের চাঞ্চল্য ও মরণের আক্ষেপ। আমাদের মনশ্চক্ষুর সামনে অনুভূতিশীল, আবেগ-স্পন্দিত উদ্ভিদের জৈবক্রিয়ার একটা পূর্ণ রূপ ফুটে উঠেছে। বাঙ্ময় প্রাণী ও নির্বাক উদ্ভিদের মধ্যে যে সীমারেখা রচিত হয়েছিল, আজ তা বিলুপ্ত হলো।"

বিশেষ আমন্ত্রণে জগদীশচন্দ্র অক্টোবর মাসে লণ্ডনের রয়্যাল কলেজ অব মেডিসিনে বক্তৃতা দেন।[৩] সভাপতি ছিলেন সোসাইটি অব মেডিসিনের কোষাধ্যক্ষ সার হেন্‌রি মরিস। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী সার লডার ব্রাণ্টন মনোজ্ঞ বক্তৃতার জন্যে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে

---

১। "On the Electrical Investigation of the Irritability of Plants".

২। "Plant Response".

৩। "Action of Drugs on Plants".

বলেন—"আমি বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে আপনার বক্তৃতা শুনেছি, কারণ প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে লজ্জাবতী গাছ নিয়ে আমি অনুরূপ পরীক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলাম। উদ্ভিদ-দেহে প্রাণস্পন্দন ও সেই সঙ্গে প্রকৃতিতে যে ঐক্যের সন্ধান আপনি দিয়েছেন, তাতে মানুষ আজ এক নতুন চিন্তাজগতে উত্তীর্ণ হলো।" সার লডার ব্রাণ্টন এক পত্রে জগদীশচন্দ্রকে লিখেছিলেন—"পতঙ্গভুক উদ্ভিদের পরিপাক-ক্রিয়া সম্পর্কে আমি ডারউইনের জন্যে কতকগুলি পরীক্ষা করেছিলাম। উদ্ভিদ ও প্রাণীর জৈবক্রিয়ায় আপনি যে সাদৃশ্য দেখিয়েছেন, তার তুলনায় সেগুলি অতি সাধারণ। প্রাণী-দেহে ওষুধের ক্রিয়া সম্পর্কে আলোকপাতের পক্ষে আপনার নির্দেশিত পদ্ধতিই সবচেয়ে প্রশস্ত।" ৩রা নভেম্বর তারিখে সোসাইটি অব মেডিসিনের সদস্যবৃন্দ জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেলের কাছে এক চিঠি লেখেন।

জগদীশচন্দ্রের এই বক্তৃতাগুলি সার্বজনীন প্রশংসা লাভ করে। অধ্যাপক কারভেথ রীড, অধ্যাপক অলিভার ও অধ্যাপক স্টারলিং ( ইউনিভার্সিটি কলেজ, লণ্ডন ) অধ্যাপক ফার্মার ( ইম্পিরিয়্যাল কলেজ অব সায়েন্স অ্যাণ্ড টেক্‌নোলজি, লণ্ডন ) ব্যক্তিগত পত্রে জগদীশচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। 'ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকা তাঁকে 'উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের ডারউইন' বলে অভিহিত করেন।

ইংল্যাণ্ডে এই সাফল্যপূর্ণ মিশনের সময় জগদীশচন্দ্র ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। জীব-বিজ্ঞান সম্পর্কিত গবেষণার প্রখ্যাত কেন্দ্র ভিয়েনা। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী অধ্যাপক মলিশ জগদীশচন্দ্রের গবেষণা সম্পর্কে যথেষ্ট উচ্চধারণা পোষণ করতেন। ভিয়েনা, ফ্রান্স ও জার্মেনীর শারীরবিজ্ঞানীরা জগদীশচন্দ্রকে সম্বর্ধিত করেন। হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রিংশাইম বলেছিলেন—"জার্মান বিজ্ঞান-কর্মিগণ আপনার

যন্ত্রসমূহের এক প্রদর্শনী দেখতে একান্ত আগ্রহান্বিত।" ৩রা অগাষ্ট থেকে জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে জগদীশচন্দ্রের কতকগুলি বক্তৃতা দেবার কথা ছিল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে তাঁকে ইউরোপ পরিত্যাগ করতে হয়।

## আমেরিকা-প্রবাসে

২২শে নভেম্বর জগদীশচন্দ্র আমেরিকায় পৌঁছেন। বিশ্ববিদ্যালয় ও বৈজ্ঞানিক সোসাইটিতে সম্বর্ধনা ও বক্তৃতার মধ্যে এখানকার কর্মব্যস্ত দিনগুলি অতিবাহিত হয়। শ্রীমতী ওলে বুলের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর ভাই জে. জি. থ্‌প্‌ বোস্টনের একজন প্রভাবশালী সম্মানিত নাগরিক। তিনি বিয়ে করেছেন আমেরিকার প্রখ্যাত কবি লংফেলোর মেয়েকে। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম আমেরিকা-ভ্রমণ উপলক্ষে মিঃ থ্‌পের সঙ্গে বসুদম্পতির পরিচয়। শ্রীমতী বুল তখন জীবিত। বর্তমান আমেরিকা-প্রবাসে জগদীশচন্দ্র এই থ্‌পের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং এখান থেকেই বোস্টন ও হার্ভার্ডের বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দের সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয় হয়।

আমেরিকার বিভিন্ন পত্রিকায় সম্পাদকীয় মন্তব্যে, প্রবন্ধে ও কবিতায় জগদীশচন্দ্রের কৃতিত্বের কথা প্রতিফলিত হয়। 'নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্‌' পত্রিকায় 'Song to Sensitive Plant' শীর্ষক একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। হার্ভার্ড, উইস্‌কন্‌সিন, ক্লার্ক, কলাম্বিয়া, ইলিনয়, শিকাগো, আইওয়া, মিশিগান ইত্যাদি প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও জগদীশচন্দ্র ব্রুক্‌লিন ইন্‌স্টিটিউট অব আর্টস অ্যাণ্ড সায়েন্স, নিউইয়র্ক অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স, ফিলাডেল-ফিয়ার আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি অ্যাড্‌ভান্সমেণ্ট অব সায়েন্স ও ফিলসফিক্যাল সোসাইটি, ওয়াশিংটন অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স, ব্যুরো অব এগ্রিকালচার প্রভৃতি সংস্থায় ভাষণ দেন। ওয়াশিংটনে কস্‌মস্‌ ক্লাবে তিনি যে বক্তৃতা দেন, তাতে বিপুল

জনসমাবেশ হয় এবং স্থান সংকুলান না হওয়ায় অনেককে নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে হয়। বোস্টনে টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ক্লাবে বক্তৃতার পর শ্রোতৃবর্গ বসুদম্পতিকে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি বিশিষ্ট মনস্তত্ত্ববিদ ডাঃ স্ট্যান্‌লি হল মনোবিদ্যার পাঠ্যতালিকায় জগদীশচন্দ্রের গ্রন্থসমূহ অন্তর্ভুক্ত করেন। উইস্‌কন্‌সিন বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ-বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক হার্পার লেখেন—''আপনার বক্তৃতা এখানকার জীব-বিজ্ঞানের গবেষণায় নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে। যে সব বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষিশিক্ষা-কেন্দ্রে উদ্ভিদের জৈবক্রিয়া সম্বন্ধে পড়ানো হয়, সেখানে আপনার উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতি রাখা প্রয়োজন বলে মনে করি।" 'সায়েন্টিফিক অ্যামেরিকান' পত্রিকায় ( এপ্রিল, ১৯১৫ ) জগদীশচন্দ্রের গবেষণার উপর প্রশংসাসূচক মন্তব্য প্রকাশিত হয়। কৃষিকার্যে এসব গবেষণার ফলাফল প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে 'ক্রেস্কোগ্রাফ' যন্ত্রকে আলাদীনের মায়াপ্রদীপের চেয়েও বিস্ময়কর বলে বর্ণনা করা হয়।

আমেরিকা পরিত্যাগের পূর্বে বসুদম্পতি টেলিফোনের উদ্ভাবক গ্র্যাহাম বেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই অশীতিপর মার্কিন বিজ্ঞানীর সঙ্গে অপেক্ষাকৃত নবীন ভারতীয় বিজ্ঞানীর সাক্ষাৎকার খুবই সৌহৃদ্যপূর্ণ হয়েছিল। সে দিন বয়োবৃদ্ধ গ্র্যাহাম বেলের মধ্যে যে অপূর্ব মানসিক সজীবতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল, অবলা বসুর দিনলিপির পাতায় তার উল্লেখ আছে।

**জাপানের পথে স্বদেশে প্রত্যাগমন**

ইউরোপ ও আমেরিকায় বর্ষব্যাপী বৈজ্ঞানিক মিশন শেষ হলো, এবার স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পালা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্যে ইউরোপের পথ তখন যথেষ্ট বিপৎসঙ্কুল। তাই বসুদম্পতি আমেরিকা থেকে জাপানের পথে ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মার্চ স্যানফ্রান্সিস্কোর উপকূল ছেড়ে জাহাজ ৭ই এপ্রিল

ইয়াকোহামা বন্দরে পৌঁছায়। সূর্যোদয়ের দেশে জগদীশচন্দ্রের এই প্রথম আগমন এবং সেখানে অল্প কয়েকদিনের অবস্থিতি একেবারে নিরর্থক হয় নি। কতিপয় উদীয়মান জাপানী বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের উদ্ভাবিত পরীক্ষণ-পদ্ধতি গ্রহণ করেন। সেখানকার রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কোকেৎসু ছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রণী। জগদীশচন্দ্রের কিছু কিছু সিদ্ধান্ত তিনি পরীক্ষামূলকভাবে সমর্থন করেন। জগদীশচন্দ্র ১লা মে তারিখে ওয়াসেডি ( Wasede ) বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন। টোকিয়ো ও অন্যান্য দর্শনীয় স্থানগুলি পরিভ্রমণ করে বসুদম্পতি জাপান থেকে ভারতে প্রত্যাগমন করেন। পথে তাঁরা সিংহলে নেমে সেখানকার প্রাচীন বৌদ্ধমন্দিরগুলি পরিদর্শন করেন। সেখান থেকে কলকাতায় ফিরে আসবার পথে রামেশ্বর, মাদুরা, তাঞ্জোর, ত্রিচিনোপলী, শ্রীরঙ্গম প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতের মন্দির-শোভিত শহরগুলি পরিভ্রমণ করেন।

### সদ্যসমাপ্ত বিজ্ঞান-মিশনের সার্থকতা

জগদীশচন্দ্রের বাধাসঙ্কুল জীবনে এবারকার বৈজ্ঞানিক মিশনের যথেষ্ট সার্থকথা আছে। তৃতীয় বৈজ্ঞানিক মিশনে তিনি ইংল্যাণ্ডে যে বিরোধ ও বিদ্বেষের সম্মুখীন হয়েছিলেন, তাতে এবারকার মিশনের এতটা সাফল্য তিনি প্রত্যাশা করেন নি। এতদিন চরম অধ্যবসায়ের সঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজের অখ্যাত গবেষণাগারে তিনি যে একক সাধনা করেছেন, বিজ্ঞানী-সমাজের এক অংশবিশেষের প্রবল বিরোধিতা যার আত্মপ্রকাশের পথ রোধ করেছিল, এবার তা বিশ্ববিশ্রুতি ও বিশ্বস্বীকৃতি লাভ করলো। পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ইতিহাসে ভারতের অবদান আর উপেক্ষণীয় হয়ে থাকবে না। বর্তমান মিশনের মধ্য দিয়েই প্রতীচ্যের বিজ্ঞান-কেন্দ্রগুলির সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়ে ওঠে এবং পারস্পরিক উপলব্ধির পথ সুগম হয়। এখন থেকেই জগদীশচন্দ্রকে রয়্যাল

সোসাইটির সদস্য মনোনীত করবার আন্তরিক চেষ্টা চলতে থাকে। এই ব্যাপারে তাঁর প্রাক্তন শিক্ষাগুরু লর্ড র‍্যালে ও অধ্যাপক ভাইন্‌স্ ছিলেন প্রধান উদ্‌যোক্তা। এই বৈজ্ঞানিক মিশনের ফলে আমেরিকা-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রগণের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

### বিক্রমপুর সম্মিলনীতে সভাপতিত্ব

বিক্রমপুর জগদীশচন্দ্রের পিতৃপুরুষের বাসভূমি। এই জনপদের গৌরবময় প্রাচীন ঐতিহ্য তাঁর জীবনকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপান পরিভ্রমণের শেষে দেশে ফিরে আসবার মাস কয়েক পরে বিক্রমপুর সম্মিলনীর অনুষ্ঠান হয়। সম্মিলনীর সেই অনুষ্ঠানের সভাপতিরূপে জগদীশচন্দ্র যে অগ্নিগর্ভ ভাষণ দেন, তাতে এই জনপদের ঐতিহ্যের কথা, দুর্দশাপীড়িত দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন-সমস্যার কথা আলোচিত হয় এবং তিনি দেশবাসীকে জাতীয় জীবনের কল্যাণ-ব্রতে আত্মনিয়োগ করবার জন্যে উদ্‌বোধিত করেন। এই অভিভাষণ 'বোধন' শীর্ষক প্রবন্ধের আকারে 'অব্যক্ত' গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে। সে বছরেই জগদীশচন্দ্রকে রামমোহন লাইব্রেরীতে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সদ্যসমাপ্ত জাপান ভ্রমণে জগদীশচন্দ্র সে দেশের শিল্পোদ্‌যোগ দেখে মুগ্ধ হন। বিক্রমপুর সম্মিলনী ও রামমোহন লাইব্রেরীতে আয়োজিত সম্মাননা সভা—উভয় স্থলেই তিনি জাপানের শিল্পবাণিজ্যিক সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেন।[১]

---

১। "রামমোহন লাইব্রেরীতে সম্বর্ধনা উপলক্ষে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁহার বক্তৃতায় বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে জাপানীরা যেরূপ সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, তাহার বর্ণনা করিয়া জাপান যে ভারতবর্ষের আশঙ্কার একটি গুরুতর কারণ, তাহার উল্লেখ করেন। আশঙ্কা দুই রকমের, বাণিজ্যিক ও রাষ্ট্রনৈতিক। বাণিজ্যিক আশঙ্কার কথা তিনি খুব খুলিয়া বলিয়াছেন, রাষ্ট্রনৈতিক বিপদ সম্বন্ধে কেবল ইঙ্গিত করিয়াছেন।"—প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩২২।

দশম অধ্যায়

# বসু-বিজ্ঞান-মন্দির

## প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ

পাশ্চাত্যে বৈজ্ঞানিক মিশনের অভূতপূর্ব সাফল্যে ভারত সরকারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ জগদীশচন্দ্রের ভবিষ্যৎ গবেষণা সম্পর্কে অধিকতর সচেতন হয়ে ওঠেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক কীর্তির অকুণ্ঠ স্বীকৃতি ও গবেষণায় সাহায্য করবার আগ্রহের মধ্যে তাঁদের উদার মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। চতুর্থ বৈজ্ঞানিক মিশন শেষ করে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর জগদীশচন্দ্রের গবেষণার প্রতি ভারত-সরকার বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রচুর অর্থ-সাহায্য দেবার সঙ্কল্প করেন। জগদীশচন্দ্রের অবসর গ্রহণের দিন আসন্ন। এমন সময় ভারত সরকারের কাছ থেকে বাংলার প্রাদেশিক শিক্ষা-অধিকর্তার নিকট নিম্নলিখিত মর্মে এক পত্র এসে পৌঁছলো—"অধ্যাপক জে. বি. ফার্মার এবং অধ্যাপক ডাবলিউ-এম. বেলিস যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, আমরা তা বিবেচনা করে দেখলাম। এখন মনে হচ্ছে, অধ্যাপক বসুকে তাঁর গবেষণায় আমরা যে উৎসাহ ও সুযোগ-সুবিধা দিয়েছি, তা খুবই সঙ্গত ও সার্থক হয়েছে। বাংলা সরকার ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী আমাদের কাছে সুপারিশ করেছিলেন, তার সমর্থনে আমরা নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি—

(১) ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস থেকে পাঁচ বছরের জন্যে মাসিক দেড় হাজার টাকা বেতনের একটি অস্থায়ী পদে অধ্যাপক বসুকে নিয়োগ।

(২) এই অস্থায়ী কার্যকালে বার্ষিক অর্থ-সাহায্যের পরিমাণ

আঠারো হাজার থেকে চব্বিশ হাজার টাকায় বৃদ্ধি এবং এককালীন পঁচিশ হাজার টাকা অর্থ-সাহায্য মঞ্জুর।

(৩) লর্ড জর্জ হ্যামিলটন ( ৫ই মে, ১৮৯৮ ) এবং লর্ড এল্‌গিনের ( ১০ই মার্চ, ১৮৯৮ ) সুপারিশ অনুসারে বার্ষিক দু'হাজার টাকা গবেষণাবৃত্তি ও আড়াই হাজার টাকা ভাতা দান।

(৪) পার্বত্য অঞ্চলে একটি পরীক্ষামূলক উদ্যান রচনা।

(৫) অধ্যাপক বসুর তিনজন সহকারীকে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ ও পাঁচ বছরের জন্যে তাঁদের বিদেশে ডেপুটেশনে প্রেরণ।"

দু'বছর আগে অধ্যাপক বসুর যে আবেদন আংশিকভাবে গৃহীত হয়েছিল, কর্তৃপক্ষ এবার তা পুরাপুরি মঞ্জুর করা সঙ্গত মনে করলেন। জগদীশচন্দ্রকে এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ লিখলেন—"ভারতসচিব আপনার জন্যে যে নতুন পদ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত করেছেন, গত রাত্রিতে সে সম্পর্কে শিক্ষা-অধিকর্তার কাছ থেকে আমি এক চিঠি পেয়েছি। আপনাকে তার প্রতিলিপি পাঠালাম। আমার মনে আজ দ্বিবিধ অনুভূতি জাগছে। বুঝতে পারছি না কোন্‌টা প্রথম প্রকাশ করবো। আপনার সঙ্গে আমাদের সব সম্পর্ক ছিন্ন হতে চলেছে, তার জন্যে বেদনাবোধ, না বৈজ্ঞানিক সাধনায় একান্তভাবে মনোনিবেশ করবার যে পূর্ণতর সুযোগ আজ আপনার সামনে উপস্থিত, তার জন্যে আন্তরিক অভিনন্দন। আমি মনে করি, সানন্দ অনুভূতি প্রকাশই শ্রেয়, যদিও দুঃখবোধটা অনেক বেশী বাস্তব।"

প্রেসিডেন্সি কলেজের গভর্নিং বডি নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করেন—"সরকার কর্তৃক অধ্যাপক বসুর গবেষণার মূল্যস্বীকৃতি ও নতুন নিয়োগ উপলক্ষে আমরা তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। সেই সঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপকগোষ্ঠী ও তাঁর মধ্যে দীর্ঘদিনের সক্রিয় যোগাযোগ ছিন্ন হবে জেনে আমরা গভীর দুঃখ প্রকাশ করছি। প্রেসিডেন্সি কলেজ ও ভারতবর্ষের বিজ্ঞান-

সাধনাকে অধ্যাপক বসু বিশ্বব্যাপী মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, আমরা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সে কথা স্মরণ করি। বিজ্ঞান-জগতে ও প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর অমূল্য অবদানের যোগ্য স্বীকৃতি হিসেবে অধ্যাপক বসুকে এই কলেজের 'এমেরিটাস প্রফেসর' নিযুক্ত করা হোক।" কর্তৃপক্ষ গভর্নিং বডির এই প্রস্তাব সমর্থন ও অনুমোদন করেন।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক আয়োজিত বিদায়-অভিনন্দন উপলক্ষে জগদীশচন্দ্র যে প্রতিভাষণ দিয়েছিলেন, তার মর্মার্থ—"জীবদ্দশায় আমার কর্মপ্রয়াসের জন্যে যে অভিনন্দন পেয়েছি, সে আমার দুর্লভ সৌভাগ্য। যে বিরোধ ও দুঃখদুর্দশাকে অতিক্রম করে এসেছি, সেগুলি আজ তুচ্ছ মনে হয়। সহকর্মীদের সৌজন্য ও ছাত্রবৃন্দের সশ্রদ্ধ প্রীতিই জীবনের পরম পুরস্কার হয়ে দেখা দিয়েছে।" এরপর তিনি অধ্যাপনার পবিত্র দায়িত্ব, শিষ্য ও আচার্যের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা আলোচনা করেন।

## বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্‌যোগ

জগদীশচন্দ্রের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন একটি গবেষণা-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা—যেখানে বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণা অব্যাহতভাবে চলবে—যে গবেষণা-মন্দির একদিন বিজ্ঞানের সার্বজাতিক কেন্দ্র হয়ে উঠবে, পুনরুজ্জীবিত হবে ভারতের ঐতিহ্য। ইংল্যাণ্ডের রয়্যাল ইন্‌স্টিটিউশন তাঁর এই পরিকল্পনার উৎস। সরকারী চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর জগদীশচন্দ্র সে স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্যে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর মনে হলো, এতদিনের সামান্য কর্মপ্রয়াসে শুধু পথের বাধা দূর হয়েছে; এবার প্রকৃত কাজ সুরু করতে হবে। বিজ্ঞানের নতুন মহলে জগদীশচন্দ্রের প্রারব্ধ গবেষণা সম্পর্কে জীব-বিজ্ঞানীদের সন্দেহ তখনও দূর হয় নি। সে অসম্পূর্ণ, সংশয়ায়িত গবেষণার

সার্থক পরিসমাপ্তির জন্যে তিনি জীবনের প্রান্তবর্তী দিনগুলি নিয়োগ করবেন। যতদিন না বিজ্ঞান-মন্দির স্থাপনার স্বপ্ন সার্থক হয়, ততদিন এই গবেষণার ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। তাই প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করবার পর তিনি ৯৩, আপার সার্কুলার রোডের বাসভবনে একটি অস্থায়ী পরীক্ষাগার গড়ে তোলেন। এই পরীক্ষাগারে এবং অংশতঃ দার্জিলিঙে তিনি উদ্ভিদ-জীবনের উপর পরিকল্পিত গবেষণায় ব্যাপৃত থাকেন।

বিচিত্রমুখী গবেষণা ও বিজ্ঞান-মন্দির স্থাপনার পরিকল্পনা ছাড়াও বাইরের নানা কাজের ব্যস্ততা ছিল। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী জগদীশচন্দ্র ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে যোগ দেন এবং এই উপলক্ষে 'অদৃশ্য আলোক' (Invisible light) শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন। এর অল্প কিছুদিন পরেই পণ্ডিত মদন মোহন মালবীয় কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে জগদীশচন্দ্র এক ভাষণ দেন।

জগদীশচন্দ্রের পিতৃদেব ভগবানচন্দ্রের স্বদেশ-হিতৈষণা ও সমাজ-উন্নয়নমূলক কর্মধারার আলোচনা প্রসঙ্গে ফরিদপুর শিল্প-প্রদর্শনীর উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্র এই শিল্প-প্রদর্শনীতে বক্তৃতা দেন এবং সমাজ-কল্যাণব্রতে পিতার আত্মোৎসর্গের কাহিনী বর্ণনা করেন।

এই বছরেই জগদীশচন্দ্রকে 'নাইট' উপাধি দেওয়া হয়। এই রাজকীয় সম্মাননা উপলক্ষে ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রবৃন্দ জগদীশচন্দ্রকে অভিনন্দিত করে।

জগদীশচন্দ্র যখন তাঁর বিজ্ঞান-মন্দির স্থাপনার স্বপ্নকে বাস্তব রূপদানের সাগ্রহ প্রতীক্ষায়, রবীন্দ্রনাথ তখন আমেরিকা-প্রবাসে। বিজ্ঞান-মন্দিরের উদ্‌বোধন সম্পর্কে জগদীশচন্দ্রের পত্রের উত্তরে তিনি লিখছেন ( সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর ১৯১৬ )—"তোমার বিজ্ঞান-মন্দিরে

প্রথম সভা উদ্বোধনের দিনে আমি যদি থাক্‌তে পারতুম তা' হ'লে আমার খুব আনন্দ হ'ত। বিধাতা যদি দেশে ফিরিয়ে আনেন তা' হ'লে তোমার এই বিজ্ঞান-যজ্ঞশালায় একদিন তোমার সঙ্গে মিলনের উৎসব হবে একথা মনে রইল। এতদিন যা তোমার সঙ্কল্পের মধ্যে ছিল আজকে তার সৃষ্টির দিন এসেচে। কিন্তু এ ত তোমার একলার সঙ্কল্প নয়, এ আমাদের সমস্ত দেশের সঙ্কল্প, তোমার জীবনের মধ্যে দিয়ে এর বিকাশ হ'তে চলল। জীবনের ভিতর দিয়েই জীবনের উদ্বোধন হয়—তোমার প্রাণের সামগ্রীকে তুমি আমাদের দেশের প্রাণের সামগ্রী ক'রে দিয়ে যাবে—তার পর থেকে সেই চিরন্তন প্রাণের প্রবাহে আপনিই সে এগিয়ে চল্‌তে থাক্‌বে।···কেবল মাত্র অভিমান দিয়ে ত কোনো সত্য বস্তু আমরা সৃজন করতে পারিনে। কিন্তু এ যে তোমার চিরদিনের সত্য সাধনা—এর মধ্যে তুমি যে আপনাকে দিয়েচ, আপনাকে পেয়েচ—তুমি যে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির মত তোমার মন্ত্রকে অন্তরে প্রত্যক্ষ দেখতে পেয়েচ, এইজন্যে বাইরে তাকে প্রকাশ কর্‌বার পূর্ণ অধিকার ঈশ্বর তোমাকে দিয়েচেন। সেই অধিকারের জোরে আজ তুমি একলা দাঁড়িয়ে তোমার মানস-পদ্মের বিজ্ঞান-সরস্বতীকে দেশের হৃদয়-পদ্মের উপরে প্রতিষ্ঠিতা কর্‌চ। তোমার মন্ত্রের গুণে, তোমার তপস্যার বলে দেবী সেই আসনে অচলা হবেন এবং প্রসন্ন দক্ষিণ হস্তে তাঁর ভক্তদের নব নব বর দান কর্‌তে থাক্‌বেন।"[১]

অধ্যাপক ভাইনস্‌কে লিখিত একটি সমসাময়িক পত্রে (১৫ই নভেম্বর, ১৯১৬) জগদীশচন্দ্রের ভাবধারার একটা সুস্পষ্ট রূপ ধরা পড়েছে— "আমি যে বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠিত করতে যাচ্ছি, তার জন্যে প্রথমেই আপনার শুভেচ্ছা কামনা করি। আগামী জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে এই গবেষণা-কেন্দ্র সাধারণভাবে খোলা হবে। বর্তমানের দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি পেতে হলে মানুষকে বৃহৎ কর্মসাধনে

১। 'চিঠিপত্র', ষষ্ঠ খণ্ড (বিশ্বভারতী), পৃঃ ৬৪-৬৫

ব্রতী হতে হবে। একদিন পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে প্রীতিবন্ধনের একটা সৌন্দর্য ছিল। আমি আশা করি, সেদিন আবার ফিরে আসবে। যেখানে বিজ্ঞানের নামে এক সঙ্কল্প সাধনের জন্যে বহুসংখ্যক কর্মীর সহযোগ ঘটবে; এমন একটি মিলন-প্রাঙ্গণ গড়ে তোলবার মধ্য দিয়েই সে বিশ্বজনীন প্রীতিবন্ধন সম্ভব হবে। বিদেশী হয়েও আমি আপনাদের বিদ্যালয়গুলিতে যে অকৃপণ দাক্ষিণ্য ও রয়্যাল সোসাইটি থেকে যে উৎসাহ পেয়েছি, তা হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। যাহোক, ভারতবর্ষে এমন একটি গবেষণা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল, যাতে এই দেশের তরুণতর বিজ্ঞান-কর্মীরা আমার মত বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন না হয়। তাই আমার স্ত্রী ও আমি এই গবেষণা-মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্যে সর্বস্ব উৎসর্গ করে দিচ্ছি। আমার জীবদ্দশায় আমি স্বোপার্জিত অর্থে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মধারাকে অব্যাহত রাখতে পারবো। যদি পাশ্চাত্ত্য দেশে আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণা পূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করে তবে আমি আশা করি, আমার মৃত্যুর পরে অপর কেহ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যকে সফল করতে এগিয়ে আসবেন।”

কলকাতায় বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠা ছাড়া জগদীশচন্দ্র আরও দুটি পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। উন্মুক্ত পরিবেশে উদ্ভিদ-বিষয়ক গবেষণার জন্যে এই মহানগরীর বাইরে একটি পরীক্ষা-কেন্দ্র স্থাপন করবার প্রয়োজন ছিল। এর জন্যে কলকাতার অনতিদূরে গঙ্গা-তীরবর্তী ফলতায় স্থান নির্বাচন করা হয়। অপর পরিকল্পনাটি ছিল দার্জিলিঙের শৈলশিখরে একটি পরীক্ষাগার স্থাপন। এর জন্যে সরকার যে অর্থ-সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা উল্লেখ করা হয়েছে। ভবিষ্যৎ গবেষণার পরিকল্পনা যাতে সার্থক হয়, সেই উদ্দেশ্যে জগদীশচন্দ্র তখন উচ্চাকাঙ্খী তরুণ কর্মীর সন্ধান করছেন—যাঁরা একনিষ্ঠ সাধনায় নবপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-মন্দিরের মহান ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখবেন। তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছা এমন এক শিষ্যগোষ্ঠী গড়ে তোলবার, যাঁরা

উত্তর-জীবনে মৌলিক গবেষণার জন্যে বিজ্ঞানী-সমাজের স্বীকৃতি পাবেন। নব্যবিজ্ঞানের সাধনায় একান্ত বিমুখ বলে ভারতবাসীর অপবাদ। জগদীশচন্দ্র দীর্ঘদিনের সেই অপবাদ দূর করবার দায়িত্ব তুলে দিতে চান এই শিষ্য-প্রশিষ্যদের উপর।

বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের নির্মাণকার্য তখন সমাপ্তির পথে। জগদীশচন্দ্র তাঁর প্রিয় ছাত্র অধ্যাপক নগেন্দ্রচন্দ্র নাগকে নবপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-মন্দিরে যোগ দেবার জন্যে আহ্বান করেন। অধ্যাপক নাগকে লিখিত একটি পত্রে বিজ্ঞান-মন্দিরের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে জগদীশচন্দ্রের চিন্তাকুল ভাব প্রকাশ পেয়েছে।

"আমি যদি আরও পাঁচ বছর বেঁচে থাকি, তবে এই বিজ্ঞান-মন্দিরকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষণা-কেন্দ্ররূপে গড়ে তুলবো। কিন্তু জানি না ভবিষ্যতে কি হবে। আমি সম্প্রতি অসুখ থেকে সেরে উঠেছি। অতিরিক্ত পরিশ্রমে রোগের পুনরাক্রমণ হতে পারে। কিন্তু উপায় নেই, জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে বিজ্ঞান-মন্দিরের উদ্‌বোধন করতে হবে। মৌর্য-যুগের স্থাপত্য দেখে প্রত্যেকে বিস্মিত হয়েছে; ভিতরকার অলঙ্করণও কম সুরুচিসম্পন্ন নয়। ইতিমধ্যে বাংলার বাইরের কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তি বিজ্ঞান-মন্দির সম্পর্কে আগ্রহ ও উৎসাহ দেখিয়েছেন। সঙ্গে পশ্চিম প্রেসিডেন্সির শ্রীলালুভাই লিখিত একখানি পুস্তিকা পাঠালাম। ঐ অঞ্চলে শ্রীলালুভাই-এর যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি আছে। তিনি আশা করেন, বক্তৃতানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করা যাবে। আমি বর্তমানে যে পরিমাণ অর্থের সংস্থান করতে পেরেছি, তা বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রয়োজনের তুলনায় কিছু অতিরিক্ত নয়। জমি ও গবেষণা-ভবনের জন্যে দু'লাখ টাকা আর এক লাখ টাকার এন্‌ডাউমেণ্ট। এই সঞ্চিত অর্থ থেকে মাসিক যে আয় হবে, তা মেরামতি কাজ, ট্যাক্স, বিদ্যুতের খরচা ইত্যাদিতে শেষ হয়ে যাবে। সব কিছু নির্ভর করছে আমার জীবনের স্থায়িত্বের উপর। ভবিষ্যতে এই বিজ্ঞান-মন্দির যখন

একটা অমিত শক্তির উৎস হয়ে উঠবে, তখন হয়তো অনেকে এর সঙ্গে যুক্ত থেকে নিজেকে স্মরণীয় করবার জন্যে আগ্রহশীল হয়ে উঠবেন।"

**বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ**

সাহিত্য-পরিষদে তখন প্রবীণ ও নবীন দলের মধ্যে প্রবল বিরোধ দেখা দিয়েছে। প্রবীণ দলে ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, ব্যোমকেশ মুস্তফী ; দ্বিতীয় দলে ছিলেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎকুমার রায়, হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত ও সুরেন্দ্রনাথ কুমার। বার্ষিক অধিবেশন আসন্ন। প্রত্যেক দলই নিজেদের মনোনীত সভাপতি নির্বাচনের জন্যে তৎপর হয়ে উঠেছেন। অধিবেশনে সভাপতির পদে আচার্য জগদীশচন্দ্রের নাম প্রস্তাবিত হলো, তাঁর অজ্ঞাতসারে। এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে মুহূর্তকালের জন্যে সকলে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর উভয় দলের মিলিত হর্ষ-ধ্বনির মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে জগদীশচন্দ্র পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। সভার শেষে প্রবীণ ও নবীন, উভয় দলই তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন, যেন এই পদ গ্রহণে তিনি অসম্মত না হন। জগদীশচন্দ্র দু'বছর পরিষদের সভাপতি ছিলেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণার মধ্যেও পরিষদের উন্নতি তাঁর বিশেষ চিন্তার বিষয় ছিল। তিনি পরিষদের প্রতি অধিবেশনে উপস্থিত থাকতেন। তাঁরই উদ্‌যোগে পরিষদ-ভবনে নিয়মিত বক্তৃতার প্রবর্তন হয়। তিনি নিজেও বহুবার তাতে অংশ গ্রহণ করেছেন। বার্ষিক অধিবেশনে প্রবীণ ও নবীনদের উদ্দেশ্যে জগদীশচন্দ্র বলেছিলেন—

"প্রবীণ ও নবীনদের মধ্যে একটা বৈষম্য আছে। প্রবীণ অতি সাবধানে চলিতে চাহেন। কিন্তু পৃথিবীর গতি অতি দ্রুত, যদিও বার্ধক্য তাহার শরীরে জড়তা আনয়ন করে। মন তো তাহার অনেক উপরে, সে তো চির-নবীন। মন কেন সাহস হারাইবে? অন্যদিকে নবীন অভিজ্ঞতা অভাবে হয়তো অতি দ্রুত চলিতে চাহেন এবং বাধার

কথা ভাবিয়া দেখেন না। যাঁহারা বহুকাল ধরিয়া কোন অনুষ্ঠানকে স্থাপিত করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই প্রয়াসের ইতিহাস ভুলিয়া যান। প্রবীণ ইহাতে অকৃতজ্ঞতার ছায়া দেখিতে পান। সে যাহা হউক, ধরিত্রী প্রবীণকেও চায়, নবীনকেও চায়। প্রবীণ ভবিষ্যতের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনে যেন উদ্বিগ্ন না হন, আর নবীনও যেন প্রবীণের এতদিনের নিষ্ঠা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন।"[১]

সাহিত্য-পরিষদে প্রদত্ত জগদীশচন্দ্রের দ্বিতীয় ভাষণ 'আহত উদ্ভিদ' শীর্ষক প্রবন্ধের আকারে 'অব্যক্ত' গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে।

### বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা—তার লক্ষ্য ও আদর্শ

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর—ঐ দিন সন্ধ্যায় জগদীশচন্দ্রের দীর্ঘ-সঙ্কল্পিত বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্রমেতিহাসে এ একটি স্মরণীয় ঘটনা। বিজ্ঞান-সাধনার প্রাথমিক পর্বে জগদীশচন্দ্র সুযোগ-সুবিধার একান্ত অভাব বোধ করেছেন। তখন থেকেই তাঁর মনে এমন একটি পরীক্ষাগার স্থাপনের পরিকল্পনা জাগে, যেখানে তিনি নিজ স্বাধীনভাবে গবেষণা করতে পারবেন এবং তরুণ ছাত্রবৃন্দকে নিজের ভাবধারা ও আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ করা সম্ভব হবে। এ শুধু অলস কল্পনা নয়। তাকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্যে জগদীশচন্দ্র নিজের সামান্য উপার্জনের কিছু কিছু অংশ সঞ্চয় করতে থাকেন। এর জন্যে তিনি ও তাঁর সহধর্মিণী অনেক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকে নিজেদের বঞ্চিত করেছেন। তাঁদের ব্যক্তিগত সঞ্চয় থেকে বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রাথমিক নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। সম্পূর্ণ নিজের উদ্যমে ও ব্যক্তিগত অর্থে এমন একটি গবেষণা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার এই একক দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় মুগ্ধ হয়ে দেশের সরকার ও জনসাধারণ একদিন এগিয়ে এসেছিলেন, বিজ্ঞান-মন্দিরকে সমৃদ্ধ করেছিলেন তাদের অকৃপণ দানে। এই

১। "নবীন ও প্রবীণ"—অব্যক্ত

সম্পর্কে জগদীশচন্দ্র অধ্যাপক নাগকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তার মর্ম—
"এই প্রতিষ্ঠানের জন্যে সব কিছু মুখ্যতঃ আমাকেই করতে হয়েছে। আমি নিশ্চিত জানতাম, আমার এই প্রাথমিক প্রয়াস যেদিন সফল হবে, সেদিন জনসাধারণের কাছ থেকে উদার সাহায্য পাব। উদ্‌যোগের প্রথম পর্বে যদি এই সাহায্য মিলতো, তবে আমি সমগ্র পরিকল্পনাকে আরও সার্থক রূপ দিতে পারতাম। বহিরঙ্গের তুলনায় প্রকৃত কাজ অনেক বেশী মূল্যবান। নতুন তথ্যানুসন্ধানের ফলাফল লিপিবদ্ধ করে রয়্যাল সোসাইটিতে যে একাধিক নিবন্ধ পাঠানো হয়েছিল, তার জন্যে আমরা উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন পেয়েছি। সরকারী মহল এখন প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। এই বিজ্ঞান-মন্দিরকে স্থায়ী রূপ দেবার জন্যে তাঁরা সর্বপ্রকার সাহায্য করতে আগ্রহান্বিত। ইতিমধ্যে আমার ছাত্র-কর্মীদের জন্যে কিছু কিছু গবেষণাবৃত্তি মঞ্জুর করা হয়েছে। ভারতসচিব জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে সরকারের পক্ষ থেকে আর্থিক-সাহায্যের পরিমাণ নির্ভর করবে, জনসাধারণ কি রকম অর্থদান করে তার উপর।"

### বিজ্ঞান-মন্দিরের স্থাপত্য ও পরিবেশ-চিত্র

মৌর্য-যুগের ভারতীয় স্থাপত্যশৈলী অনুসারে ধূসর বেলেপাথরে নির্মিত মূল গবেষণা-ভবন মন্দিরের রূপ পরিগ্রহ করেছে। বিজ্ঞান-মন্দির ও তার বহিরঙ্গনে সর্বত্র জগদীশচন্দ্রের শিল্পী মনের স্বাক্ষর ছড়িয়ে আছে। প্রবেশপথের পাশে অনতিবিস্তৃত উদ্যান; সেখানে লজ্জাবতীর মত স্পর্শকাতর ও স্বতঃস্পন্দনশীল বিভিন্ন উদ্ভিদ রোপিত। একদিকে ক্ষুদ্র জলাশয় ও কৃত্রিম প্রস্রবণ—তার উপরে এক নারীমূর্তি মন্দিরে প্রদীপ বয়ে নিয়ে চলেছে। বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের উদ্‌বোধন উৎসবে যাঁর অনুপস্থিতি সবাই গভীর বেদনার সঙ্গে অনুভব করেছিলেন, তিনি হলেন ভগিনী নিবেদিতা। স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্না হয়ে তিনি ভারতবর্ষের কাছে

আত্মনিবেদন করেছিলেন। জগদীশচন্দ্র বহুদিন পূর্বে বিজ্ঞান-মন্দির স্থাপনার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাকে বাস্তব রূপ দেবার জন্যে ঐকান্তিক উৎসাহ তিনি পেয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতার কাছ থেকে। সে স্বপ্নের সার্থক পরিণতি তিনি ( নিবেদিতা ) দেখে যেতে পারেন নি। ভগিনী নিবেদিতার অপার্থিব আত্মার পুণ্য সান্নিধ্য অনুভব করবার জন্যে, তাঁর মহতী অনুপ্রেরণায় সঞ্জীবিত হবার উদ্দেশ্যে জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রাঙ্গণে তাঁর এই ভাবমূর্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

মন্দিরে প্রবেশ করেই প্রথমে একটি আয়তকক্ষ। সেখানে জগদীশচন্দ্রের উদ্ভাবিত যন্ত্রসমূহ সাজানো রয়েছে। এই কক্ষের সঙ্গে প্রশস্ত বক্তৃতা-গৃহ। মঞ্চের উপর দেয়ালের ঊর্ধ্বভাগে প্রখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বসুর অঙ্কিত এক রূপক চিত্র "অন্বেষণ"—অসি হাতে এক দৃপ্ত পুরুষমূর্তি—মানুষের প্রজ্ঞা, সঙ্গিনী বঁধুর হাতে বাঁশী—সে কল্পনা। নীচে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রে উৎকীর্ণ সূর্য-দেবতার মূর্তি। সপ্তাশ্বযোজিত রথে তাঁর পরিক্রমা সুরু হয়েছে, অন্ধকার বিদীর্ণ করে বালার্ক-রশ্মি বিশ্বভুবন উদ্ভাসিত করে তুলছে। জ্ঞানের আলোকে অজ্ঞানতিমির বিনষ্ট হচ্ছে—এই চিত্র তারই রূপক ব্যঞ্জনা। জগদীশচন্দ্র তরুণ বয়সে অজন্তার গুহামন্দিরে প্রাচীন ভারতের পটুয়া অঙ্কিত এই কালজয়ী চিত্র দেখেছিলেন। সম্রাট অশোক জগতের মুক্তির জন্যে অম্লানচিত্তে সব কিছু বিসর্জন দিয়েছিলেন—অবশেষ ছিল অর্ধামলক মাত্র। বিজ্ঞান-মন্দিরের সর্বত্র সে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রতীক অর্ধামলক-চিহ্নের সার্থক অলঙ্করণ। বিজ্ঞান-ভবনের উদ্‌বোধনের দিনে জগদীশচন্দ্র বলেছিলেন—"রিক্তহস্তে আসিয়াছিলাম, রিক্তহস্তেই ফিরিয়া যাইব; ইতিমধ্যে যদি কিছু সম্পাদিত হয়, তাহা দেবতার প্রসাদ বলিয়া মানিব। আর একজনও এই কার্যে তাঁহার সর্বস্ব নিয়োগ করিবেন, যাঁহার সাহচর্য্য আমার দুঃখ ও পরাজয়ের মধ্যেও বহুদিন অটল রহিয়াছে।" তাঁর এই প্রত্যাশা পূর্ণ করেছিলেন সহধর্মিণী ও উত্তরসাধিকা শ্রীযুক্তা অবলা বসু। নিষ্পাপ দধিচীর অস্থি
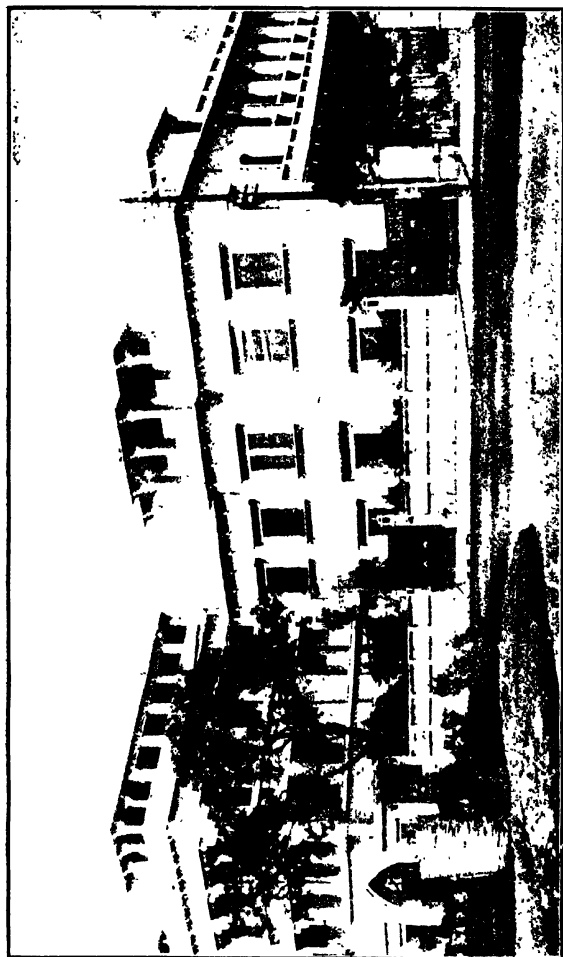
বসু-বিজ্ঞান-মন্দির

দিয়ে নির্মিত হয়েছিল ইন্দ্রায়ুধ বজ্র। পতাকাস্বরূপ সে বজ্রচিহ্ন মন্দিরশীর্ষে বিধৃত। অন্যায়, অসত্যকে বিনাশ করবার সুদৃঢ় সঙ্কল্পের অভিব্যক্তি। বিজ্ঞান-মন্দিরের পিছনে প্রাঙ্গণের পশ্চিমে প্রশস্ত উদ্যান। সেখানে তৈরী হয়েছিল কৃত্রিম নদী আর তার উপর সেতু। এমনি অনেক কিছুর মধ্যে জগদীশচন্দ্র শৈশব ও কৈশোরের অম্লান স্মৃতিকে রূপায়িত করেছেন। জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানমানসের সঙ্গে যে শিল্পী ও কবিমানস অঙ্গাঙ্গী বিধৃত হয়েছিল, গবেষণা-মন্দিরের চিত্রকল্প পরিবেশ তারই অভিব্যক্তি। বিজ্ঞান-মন্দিরের বার্ষিক সভায় জগদীশচন্দ্র একবার বলেছিলেন[১]—"বিজ্ঞান সম্পর্কীয় কিছু জিনিষ বা ঘরবাড়ী, প্রতিষ্ঠান আদিকে বিশ্রী করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। বিজ্ঞান যেমন সত্য, সৌন্দর্য্যও তেমনি সত্য। সুতরাং বিজ্ঞানের সহিত সুষমার বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী নহে।"

### বিজ্ঞান-মন্দিরের উদ্‌বোধন

সুচিত্রিত প্রশস্ত বক্তৃতাকক্ষে শুভ সান্ধ্য মুহূর্তে বিজ্ঞান-মন্দিরের অনুষ্ঠান হয়। সেদিন মন্দির-প্রাঙ্গণ রবীন্দ্রনাথ রচিত সঙ্গীতে মুখরিত হয়ে উঠে— "মাতৃমন্দির-পূণ্য-অঙ্গন, করো মহোজ্জ্বল আজি হে।" তাম্রফলকে উৎকীর্ণ নিবেদন পত্র প্রতিষ্ঠাতার অন্তরতম আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্যোতক।

ভারতের গৌরব ও জগতের
কল্যাণ কামনায়
এই বিজ্ঞান মন্দির
দেবচরণে নিবেদন করিলাম।

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু
১৪ই অগ্রহায়ণ, সংবৎ ১৯৭৪।

---

১। বিবিধ প্রসঙ্গ, প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ—১৩২৯, পৃঃ ৪৩৮।

বিজ্ঞান-মন্দিরের উদ্‌বোধন উপলক্ষে জগদীশচন্দ্র এক মর্মস্পর্শী ভাষণ* দিয়েছিলেন। সে দীর্ঘ ভাষণে তিনি বিজ্ঞান-মন্দিরের লক্ষ্য ও আদর্শের পূর্ণ ছবি তুলে ধরেছিলেন দেশবাসীর সামনে।

জগদীশচন্দ্রের এই সৃষ্টিকে প্রতীচ্যের পত্রিকাসমূহ কিভাবে অভিনন্দিত করেছিল, 'লণ্ডন টাইম্‌স্‌'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধের নিম্নমুদ্রিত আংশিক উদ্ধৃতি থেকে তার আভাস পাওয়া যাবে।

"সার জগদীশ বিজ্ঞানের অধ্যাপনাকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন প্রায় একযুগ আগে। তখন সার্বজনীন ধারণা ছিল—ভারতবাসীদের মানসিক সংগঠনের এমনি একটা বিশেষত্ব আছে, যার জন্যে তারা একান্তভাবে প্রকৃতি-চর্চায় বিমুখ এবং আধ্যাত্মিক চিন্তায় মগ্ন। বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি থাকলেও তার সুষ্ঠু বিকাশের উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা সে সময়ে ছিল না। সুতরাং ভারতীয় শিক্ষাধারা পুরাপুরি সাহিত্যের খাতে বয়ে চলেছিল—তার রূপান্তর সম্ভব হয় নি। ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক নবজাগরণে জগদীশচন্দ্রের প্রভাব ও অবদান অনেকখানি। বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের কার্য-বিবরণী ( Transactions ) থেকে বোঝা যায়, এই বিশিষ্ট বাঙ্গালী বিজ্ঞানীর নেতৃত্বে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের গবেষণায় বিজ্ঞান-ভাণ্ডারে কত অমূল্য তথ্য সংযোজিত হচ্ছে এবং বিজ্ঞান অনুশীলনের ক্ষেত্রে প্রাচ্য-মন আর পাশ্চাত্য-মনের মধ্যে কোনও মৌলিক পার্থক্য নেই। কে যেন লিখেছিলেন—ভারতীয় মনের অন্তর্নিহিত স্বকীয়তা গবেষণাধারায় ও তত্ত্বে খানিকটা রূপান্তর আনতে পারে, কিন্তু তাতে সে গবেষণা বা তত্ত্ব ভারতবর্ষ ও ইউরোপে একই স্বীকৃতি পাবে। সার জগদীশচন্দ্র বসুর গবেষণায় দেখা গেছে, একমাত্র ভারতবর্ষের ধ্যানী মন এই বিশ্বের অসংখ্য ঘটনার মধ্যে একটা সংহতি ও ঐক্য উপলব্ধি করতে পারে। এই ধ্যানপরায়ণতা থেকেই আসে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সত্য-সন্ধানের মানসিক একাগ্রতা।"

---

* এই ভাষণ 'নিবেদন' শীর্ষক প্রবন্ধাকারে 'অব্যক্ত' গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে।

'অ্যাথেনিয়াম' পত্রিকা লিখেছিলেন—"এই বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা শুধু ভারতবর্ষের ইতিহাসে নয়, বিজ্ঞানের ইতিহাসেও একটি স্মরণীয় ঘটনা। •গবেষণার ফলাফল সম্বলিত কার্য-বিবরণীই তার পরিচয়।"

**বিজ্ঞান-মন্দিরের আর্থিক সংস্থান**

বিজ্ঞান-মন্দিরের উদ্‌বোধন হয়ে গেছে। এবার তার সংরক্ষণ ও স্থায়িত্বের কথা ভেবে জগদীশচন্দ্র উদ্‌বিগ্ন। তিনি যথাসর্বস্ব ট্রাষ্টির হাতে সমর্পণ করেছেন সত্য, কিন্তু এই বিজ্ঞান-মন্দিরকে একটি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান-কেন্দ্র রূপে গড়ে তোলাই তাঁর জীবনের স্বপ্ন। এই সামান্য অর্থে সে স্বপ্ন সার্থক করা সম্ভব নয়। তাই তিনি দেশবাসীর কাছে সক্রিয় সহযোগিতার জন্যে আবেদন করেন। সে আবেদনে অনেকেই সাড়া দেন। জনকল্যাণ ও শিক্ষাপ্রসারে কাশিম-বাজারের মহারাজা সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর উৎসাহ ও পৃষ্ঠ-পোষকতার বিষয় বাংলাদেশে কারোরই অবিদিত নেই। তিনি বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের জন্যে ছ'লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হন। পাতিয়ালা, বরোদা, কাশ্মীর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যের রাজন্যবর্গও যথাসাধ্য অর্থ-সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। বোম্বাই-এর শ্রেষ্ঠিগণ ও জনসাধারণের আমন্ত্রণে জগদীশচন্দ্র ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই ও পুণা পরিভ্রমণ করেন ও বহুস্থানে বক্তৃতা দেন। এই পরিভ্রমণকালে জগদীশচন্দ্র বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেন এবং তাঁর অর্থ-সংগ্রহের পরিকল্পনাও বহুলাংশে সফল হয়। এই ব্যাপারে তাঁকে যাঁরা অকৃপণভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁদের মধ্যে শেঠ মূলরাজ খাটাউ ও শ্রীবোমানজীর নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের জন্যে একটি স্থায়ী তহবিল গঠনকল্পে প্রচুর অর্থদান করেন। এই দানগ্রহণ উপলক্ষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে জগদীশচন্দ্র শ্রীবোমানজীকে লিখেছিলেন—

"আপনি এই গবেষণা-মন্দিরের লক্ষ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে জানতে

চেয়েছেন। আপনি মনে করেন, দেশকে যাঁরা ভালবাসেন তাঁরা এই মহান কর্মে সহযোগিতা করবেন। বাইশ বছর আগে যখন আমি গবেষণার কাজ আরম্ভ করি, তখন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় ভারতবাসীদের মৌলিকতা এবং জ্ঞানচর্চার একটি বৃহৎ কেন্দ্র সংগঠনের ক্ষমতা সম্পর্কে লোকের মনে গভীর সন্দেহ ছিল। আমি মনে করি, সে অপবাদ আমি দূর করতে পেরেছি। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আমার তত্ত্বসমূহ সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করেছে ; শুধু তাই নয়, আজ পাশ্চাত্য দেশ থেকে বহু স্নাতকোত্তর কর্মী এই বিজ্ঞান-মন্দিরে কাজ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। ভারতীয়দের চিন্তা-প্রসূত বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানের নতুন পথের সঙ্গে তাঁরা পরিচিত হতে চান। বিজ্ঞান-মন্দিরের এই স্বীকৃতিই ভারতবর্ষকে পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভের অনুপ্রেরণা জোগাবে।

"অনেকে বলে থাকেন—বিজ্ঞান-সাধনায় আমি যে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছি, তা একান্তভাবে আমার ব্যক্তিগত কৃতিত্ব—এটা জাতিগত যোগ্যতার পরিচায়ক নয়। ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানের মর্যাদাকে যদি স্থায়ী রূপ দিতে হয়, তবে একদল যোগ্য উত্তরসাধক সৃষ্টি করে যেতে হবে, যাঁরা আমার গবেষণাধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবেন। সে উদ্দেশ্যেই বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা।

"আমার স্বোপার্জিত অর্থে পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্ব সুরু হয়েছে মাত্র। এই মন্দিরের বৈজ্ঞানিক কর্মধারাকে আমি বহুদূর প্রসারিত করতে চাই। তার জন্যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, টাটা ইন্‌স্টিটিউটের জন্যে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয়েছে। আমার বিজ্ঞান-মন্দিরের কর্মসীমা অনেক বেশী ব্যাপক। বহুমুখী বিজ্ঞানে আমরা এক সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গীর অবতারণা করতে চাই। সেই হবে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ অবদান।

"আমি নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করছি, আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে পরম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোনও ভারতীয় এমন গভীরভাবে চিন্তা

করতে পারেন, সে ধারণা আমার ছিল না। সেদিন পর্যন্ত আপনার সঙ্গে আমার পরিচয়ের সৌভাগ্য হয় নি। আপনার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে যেদিন আপনি বিজ্ঞান-মন্দিরের জন্যে এক লক্ষ টাকা আমার হাতে তুলে দিলেন সেদিন আমি উপলব্ধি করলাম, ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক প্রগতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আর দুশ্চিন্তার কারণ নেই।"

জগদীশচন্দ্র বিশেষ আমন্ত্রণে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাতে বোম্বাই-এর লাট সভাপতিত্ব করেছিলেন। সভাপতি ও শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁকে আন্তরিক স্বাগত সম্ভাষণ জানান। নব-প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-মন্দিরের লক্ষ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে তিনি বলেন— "বিজ্ঞান-প্রগতিকে সর্বসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করাই আমার উদ্দেশ্য। এই বিজ্ঞান-মন্দিরে যে সব নতুন নতুন আবিষ্কার হবে, তার শুভফল ভোগে সব মানুষের সমান অধিকার থাকবে। এক মহত্তর উপায়ে আমি পৃথিবীকে সেবা করে যেতে চাই। বহু শতাব্দী আগে নালন্দা ও তক্ষশীলার জ্ঞানকেন্দ্রে পৃথিবীর নানাদেশের মানুষের জন্যে দ্বার উন্মুক্ত ছিল। সে ঐতিহ্যকে আমি পুনরুজ্জীবিত করবো। সে স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করবার পথে আমি যে সক্রিয় সহানুভূতি ও সহযোগিতা পেয়েছি তার জন্যে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি।" বোম্বাই ও পুনার ছাত্র-সমাজ জগদীশচন্দ্রের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এবং তাঁর মহৎ পরিকল্পনার কাজে যথাসাধ্য অর্থ-সাহায্য প্রদানেও কার্পণ্য করে নি। জগদীশচন্দ্র সানন্দে সে দান গ্রহণ করেছিলেন।

বোম্বাই থেকে কলকাতা প্রত্যাগমনের পথে নাগপুরের জনসাধারণ ও ছাত্র-সমাজ বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের জন্যে অর্থদান এবং জগদীশচন্দ্রের প্রতি তাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

### ট্র্যান্‌জ্যাক্‌শন্‌স্ অব দি ইন্‌স্টিটিউট

বিদেশী জার্ন্যালে গবেষণা-পত্র প্রকাশ করবার বাধা-বিঘ্ন সম্পর্কে জগদীশচন্দ্রের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল। স্থির হয় যে, বিজ্ঞান-

মন্দিরের কর্মধারা ও গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করবার জন্যে তার নিজস্ব একটি মুখপত্র থাকবে। Proceedings of the Royal society-তে প্রকাশিত নিবন্ধাদির মাপ্‌কাঠিতে বিচার করেই মুখপত্রের জন্যে নিবন্ধাদি মনোনীত হবে। সরকার এই মুখপত্র বা ট্র্যান্‌জ্যাক্‌শন্‌স্‌ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সম্পর্কে জগদীশচন্দ্র লর্ড সিংহকে লিখেছেন—বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য গবেষণাধারাকে অব্যাহত রাখা। এই বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন হয়েই ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী সরকারের সঙ্গে পত্রালাপ করি। উদ্দেশ্যকে সফল করবার যে সব সম্ভাব্য পন্থা রয়েছে, বিজ্ঞান-মন্দিরের পরিবর্তে সরকারের হাতে ট্র্যান্‌জ্যাক্‌শন্‌স্‌ প্রকাশের দায়িত্ব অর্পণ করা তার মধ্যে অন্যতম। প্রকাশিত নিবন্ধসমূহ পৃথিবীর বিজ্ঞানী-মহলের তীক্ষ্ণতম সমালোচনার মধ্য দিয়ে নিন্দা বা প্রশংসা অর্জন করবে। এমনি করেই বিজ্ঞান-মন্দিরে সম্পাদিত গবেষণার প্রকৃত মূল্য বিচার হবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রগতি সাধনে দেশীয় সরকার যে প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, তা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করুক, সেটাও আমার কাম্য।”

নবনির্মিত বিজ্ঞান-মন্দিরে যে প্রাণময় সাধনার উদ্‌বোধন হয়, তা জগদীশচন্দ্রের পূর্বতন গবেষণাসমূহকে দৃঢ়তর ও গভীরতর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এই বিজ্ঞান-মন্দির থেকে প্রকাশিত ট্র্যান্‌জ্যাক্‌শন্‌স্‌ পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক মুখপত্রগুলির মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। প্রথম কয়েক বছর জগদীশচন্দ্রের সক্রিয় তত্ত্বাবধানে তাঁর শিষ্যবর্গ যে সব গবেষণা করেন, ট্র্যান্‌জ্যাক্‌শন্‌স্‌-এ মুখ্যতঃ তাই প্রকাশিত হয়, কালক্রমে এসব প্রতিভাধর তরুণ শিষ্যের মৌলিক গবেষণা বিজ্ঞানী-মহলের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করে। বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের গবেষণাধারা আজ সুদূরপ্রসারী। জগদীশচন্দ্র তাঁর আজীবন সাধনায় যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গিয়েছেন, যোগ্য উত্তর-সাধক ও শিষ্যবর্গের কর্মনিষ্ঠায় তা অম্লান ও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। নবীন

বিজ্ঞান-কর্মীরাও পূর্বাচার্যদের পথ অনুসরণ করে এই মন্দিরের দীপকে অনির্বাণ রাখবে। বিজ্ঞান-মন্দিরের উদ্‌বোধনের দিনে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ করে জগদীশচন্দ্র বলেছিলেন—

"হে সৌম্য, ব্রহ্মের চরণে তোমাদিগকে দান করিতেছি। কর্ম কর, কর্মই বীর্য, বীর্যবান হও। তেজের সহিত ব্রহ্মবর্চসের সহিত আপনাদিগকে যুক্ত কর। ব্রতাচরণে নিদ্রিত হইও না, মৃত্যুকে প্রাপ্ত হইও না, মৃত্যুর বশীভূত হইও না। সেবার কর্মে তোমরা মিত্র হও।" এই সঞ্জীবনী মন্ত্র স্মরণে রেখে নবীন বিজ্ঞান-কর্মীরা ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি ও জগতের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হবে।

একাদশ অধ্যায়

# রয়্যাল সোসাইটির সদস্য

"চিরসহিষ্ণু এই উদ্ভিদ রাজ্য নিশ্চলভাবে আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান। উত্তাপ ও শৈত্য, আলো ও অন্ধকার, মৃদু সমীরণ ও ঝটিকা, জীবন ও মৃত্যু ইহাদিগকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। বিবিধ শক্তিদ্বারা ইহারা আহত হইতেছে, কিন্তু আহতের কোন ক্রন্দন ধ্বনি উত্থিত হইতেছে না। অতি সংযত, মৌন ও অক্রন্দিত জীবনেরও এক মর্ম্মভেদী ইতিহাস আছে।"

## নির্বাক জীবনের অভিব্যক্তি

বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা, তার সংরক্ষণ ও স্থায়িত্বের জন্যে অর্থসংগ্রহ ও যোগ্য উত্তরসাধকের সন্ধান প্রভৃতি নানা কর্মব্যস্ততার মধ্যেও জগদীশচন্দ্র সক্রিয় তথ্যানুসন্ধানে কেমন করে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন, সে এক বিস্ময়ের কথা। এই সময়ে তিনি ক্রেস্কোগ্রাফ নামে যে যন্ত্র উদ্ভাবন করেন, তাতে উদ্ভিদ-দেহের স্পন্দন কোটিগুণ বর্ধিত হয়ে ধরা পড়ে। এই যন্ত্রে নির্বাক উদ্ভিদ-জীবন সম্পর্কে যে সাঙ্কেতিক লিপি গৃহীত হয়, তার মর্মোদ্ধার করে জগদীশচন্দ্র রয়্যাল সোসাইটিতে কয়েকটি নিবন্ধ প্রেরণ করেন। বিজ্ঞানী-মহলে এই নিবন্ধগুলি অশেষ মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়। এ-সম্পর্কে ইংল্যাণ্ড থেকে জগদীশচন্দ্রের কাছে একাধিক অভিনন্দন পত্র আসে। অধ্যাপক ভাইন্‌স্‌ লেখেন—"প্রতিপক্ষ এবার নিশ্চয়ই পরাজয় মেনে নেবে। উদ্ভিদ-দেহের স্পন্দন সম্বন্ধে আমি বক্তৃতা দিচ্ছি; অনেক জায়গায় তোমার দেওয়া ব্যাখ্যাই উল্লেখ করেছি। তোমার সাম্প্রতিক আবিষ্কারে এক নতুন পথ খুলে গেল।" পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানী-সমাজে জগদীশচন্দ্রের গবেষণার সমাদৃতি সম্পর্কে লর্ড কারমাইকেলও এই সময়ে এক পত্র লিখেছিলেন।

অধ্যাপক নাগ তখন সহকারী পরিচালক হিসেবে বিজ্ঞান-মন্দিরে যোগ দিয়েছেন। জগদীশচন্দ্র একটি পত্রে তাঁকে লিখেছিলেন —"কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে খবর পেলাম—ওখানকার কয়েক-জন বিজ্ঞান-কর্মী আমাদের গবেষণাগারে কাজ করতে ইচ্ছুক। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ক্রান্তীয় অঞ্চলে (সম্ভবতঃ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে) একটি গবেষণাগার স্থাপনের উদ্‌যোগ করছে। আমি আশা করি, এই বিষয়ে আমরা অগ্রগামিতা রক্ষা করতে পারবো। সুতরাং ট্র্যানজ্যাক্‌শন্‌স্‌-এর পরবর্তী সংখ্যাকে আরও বেশী তথ্যসমৃদ্ধ ও চিত্তাকর্ষক করে তুলতে হবে।"

মাটির সঙ্গে মূলের বন্ধনকে উপেক্ষা করে উদ্ভিদ স্বচ্ছন্দে স্থান থেকে স্থানান্তরে চলতে-ফিরতে পারে না। তবু তার দেহের অংশ-বিশেষে বৃদ্ধিজনিত সচলতা আছে, বিচিত্র তার ছন্দ। খাদ্যরসের সন্ধানে মূল মৃত্তিকাতলে প্রসারিত হয়, আর আলো-বাতাসের জন্যে কাণ্ড যায় উর্ধ্বদিকে। সূর্যমুখী সারাক্ষণ আলোর জন্যে উন্মুখ, মৃদুতম উদ্দীপনায় লজ্জাবতীর পাতা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে, কুঞ্জলতার আকর্ষ নিবিড় আলিঙ্গনে আশ্রয়কে জড়িয়ে বাড়তে থাকে। কোথাও দ্রুত, উচ্ছ্বসিত, কোথাও শ্লথগতি, সুস্মিত উদ্ভিদের এরূপ অঙ্গবিন্যাসের একটা সুসঙ্গত ব্যাখ্যা নির্দেশ করাই জগদীশচন্দ্রের সেই সময়কার গবেষণার লক্ষ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যে তিনি যেসব যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করেন, তার মধ্যে ক্রেস্কোগ্রাফ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমসাময়িক গবেষণার ফলাফলের সঙ্কলন মুখ্যতঃ বিজ্ঞান-মন্দিরের পত্রিকায়[১] প্রকাশিত হয়।

### পঞ্চমবার ইউরোপ যাত্রা

উদ্ভিদ-জীবন সম্পর্কে নতুন গবেষণার বিবরণ প্রকাশিত হওয়ার পর পশ্চিমের বিজ্ঞানী-মহলে স্বভাবতঃই কৌতূহল সঞ্চারিত হয়।

১। Transactions of the Bose Research Institute, Vol. I (1918), Vol. II (1919).

জগদীশচন্দ্র স্বীয় মতবাদের প্রচার ও স্বীকৃতির জন্যে ইউরোপ যাত্রার সঙ্কল্প করেন। অন্য একটি কারণে এই বিদেশ-যাত্রার পরিকল্পনা ত্বরান্বিত হয়। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার জগদীশচন্দ্রকে পাঁচ বছরের জন্যে সাময়িক গবেষণা-বৃত্তি মঞ্জুর করেছিলেন। সেই নির্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে আসছে। জগদীশচন্দ্রের ইচ্ছা, যাতে এই গবেষণা-বৃত্তির সময় প্রসারিত করা যায়। বিজ্ঞান-মন্দিরের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের কথাও তিনি ভেবে দেখেছেন। সম্ভব হলে তিনি এ-প্রসঙ্গে ইংল্যাণ্ডে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করা সঙ্গত মনে করলেন। অধ্যাপক নাগকে লিখিত এক পত্রে জগদীশচন্দ্রের মানসিক উদ্‌বেগ প্রকাশ পেয়েছে—"আমি এক আসন্ন সঙ্কট স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আগামী এক বছরের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার ঘাটতি পূরণের জন্যে নির্বিচারে ব্যয়-সঙ্কোচন নীতি গ্রহণ করবে। সে ব্যয়সংক্ষেপ থেকে বিজ্ঞান-মন্দিরকে রক্ষা করবার জন্যেই ইংল্যাণ্ড যাত্রা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।"

এই যাত্রার উদ্দেশ্য কতটা সার্থক হবে, সে সম্বন্ধে পরিচিত মহলে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। অনেকেই বলেছিলেন, জগদীশচন্দ্রের পক্ষে যুদ্ধোত্তর ইংল্যাণ্ডে তাঁর গবেষণা বা বিজ্ঞান-মন্দির সম্পর্কে কোনও আগ্রহ সঞ্চার করা সম্ভব হবে না। এসব নৈরাশ্যজনক পূর্বাভাসকে উপেক্ষা করে জগদীশচন্দ্র ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি ইংল্যাণ্ডে এসে পৌছলেন। যে ধারণা নিয়ে তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করেছিলেন, এখানে পৌছবার পর তা ভ্রান্ত প্রমাণিত হলো। জগদীশচন্দ্র ও তাঁর আবিষ্কৃতিকে অভিনন্দিত করবার জন্যে সমগ্র ইংল্যাণ্ড যেন সাগ্রহ প্রতীক্ষায় ছিল। ইংল্যাণ্ডে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই জগদীশচন্দ্র রয়্যাল ইনষ্টিটিউশন, কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়, লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজ, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা দেবার জন্যে আমন্ত্রিত হন এবং সর্বত্রই তাঁর বক্তৃতা সমাদৃত হয়।

**ইণ্ডিয়া অফিসে বক্তৃতা**

বিজ্ঞান-মন্দিরে সরকারী অর্থ-সাহায্য যাতে অব্যাহত থাকে, সে সম্পর্কে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনাই এবারকার ইংল্যাণ্ড ভ্রমণের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। জগদীশচন্দ্র এই মর্মে ভারতসচিব মণ্টেগুর কাছে এক আবেদনপত্র পেশ করেন। ভারতসচিব যাতে তাঁর গবেষণার মূল্য উপলব্ধি করতে পারেন, সে উদ্দেশ্যে তিনি ইণ্ডিয়া অফিসে এক বক্তৃতা সভার আয়োজন করেন। ইণ্ডিয়া অফিসের ইতিহাসে এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা। জগদীশচন্দ্রের গবেষণাধারা সম্পর্কে মণ্টেগু অবহিত ছিলেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে সহকারী ভারতসচিব হিসেবে তিনি যখন এদেশে আসেন, তখন কলকাতায় জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। ইণ্ডিয়া অফিসে আয়োজিত বক্তৃতা সফল হলে বিজ্ঞান-মন্দিরের জন্যে সরকারী অর্থ-সাহায্য পাওয়ার পক্ষে যে কোন অসুবিধা হবে না, সে সম্পর্কে জগদীশচন্দ্র নিশ্চিত ছিলেন। ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে এই বক্তৃতা হয়, সভাপতিত্ব করেন ব্যালফুর। জগদীশচন্দ্র বিরোধী বিজ্ঞানীদলের অধ্যাপক ফার্মার ও অধ্যাপক ব্ল্যাকম্যানকে এই সভায় আমন্ত্রণ করেছিলেন—তাঁদের মত পরিবর্তন করতে পারবেন, এই আশায়। 'ম্যাগ্‌নেটিক ক্রেস্কোগ্রাফ' যন্ত্রের মাধ্যমে তিনি নির্বাক উদ্ভিদের ইন্দ্রিয়াতীত জৈব লক্ষণের উপর যে আলোকপাত করেন, তাতে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী গভীর বিস্ময় বোধ করেন। এই বক্তৃতার সফলতা সম্পর্কে অধ্যাপক নাগকে লিখিত পত্র—"বিজ্ঞান-মন্দির সম্পর্কে এখানে ব্যাপক আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে। গত সন্ধ্যায় ভারতসচিব আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। সরকারের পক্ষ থেকে সর্বপ্রকার সাহায্যের আশ্বাস তিনি দিয়ে গেলেন। আমার গবেষণার প্রতি ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী-সমাজের সপ্রশংস মনোভাবের কথা তিনি তারযোগে ভারত সরকারকে জানিয়ে দেবেন। আমার উপর কর্তৃপক্ষের গভীর আস্থা। এই অবস্থায় তাঁদের কাছে

অপব্যয়িত হয় এমন কোনও অর্থ চাওয়া সমীচীন হবে না। আমি নিজেকে প্রতিটি কর্মীর প্রতিভূ স্বরূপ মনে করি। আমি চাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গবেষণা কেন্দ্ররূপে এই বিজ্ঞান-মন্দির গড়ে উঠুক, নয়তো এখানেই সব কিছুর পরিসমাপ্তি হোক। সাময়িক সাফল্যের জন্যে আমি উন্মুখ নই। বিভিন্ন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান থেকে প্রস্তাব এসেছে, কিন্তু আবিষ্কারকে পণ্য করে অর্থলাভের কোনও ক্ষুদ্র ইচ্ছা আমার নেই। মণ্টেগুর তারবার্তা পেয়ে ভারত সরকার যন্ত্রপাতির জন্যে এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন। সুতরাং অর্থ-সংগ্রহ এখন আর তেমন দুরূহ নয়। সরকারী সাহায্যের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান-মন্দিরের উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হচ্ছে, সে সম্পর্কে আমাদের সচেতন হতে হবে। একটা ক্ষণস্থায়ী চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে আত্মপ্রসাদ লাভ নয়, বিশুদ্ধ গবেষণার মধ্য দিয়ে অবিস্মরণীয় হওয়াই আমাদের লক্ষ্য।"

ইণ্ডিয়া অফিসে জগদীশচন্দ্র যে বক্তৃতা দেন ইউরোপের বিভিন্ন দেশসমূহে ও আমেরিকায় তার সংক্ষিপ্ত সার পাঠানো হয়। ইংল্যাণ্ডের পত্রিকাগুলিতে এই বক্তৃতার যে বিস্তৃত বিবরণী প্রকাশিত হয়, তা আন্তরিক গুণগ্রাহিতার পরিচায়ক। 'লণ্ডন টাইমস্' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে আংশিক উদ্ধৃতি—"ভারতীয় দর্শনের স্মরণাতীত অতীন্দ্রিয়তাবাদ ও পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের পরীক্ষণ-নির্ভরতা, এই দুয়ের মধ্যে যে সার্থক পরিণয় সাধিত হতে পারে, সার জগদীচন্দ্র বসু তার সুন্দর নিদর্শন। আমরা ইউরোপে যে সময় আদিম যুগের যুক্তিবিরহিত মনগড়া বিজ্ঞান (Empirical Science) নিয়ে আত্ম-প্রসন্ন ছিলাম, তখন প্রাচ্যের সূক্ষ্মদর্শী মানুষ সৃষ্টির বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে সেই পরম ঐক্যের সন্ধান করেছে। জগদীশন্দ্র বিজ্ঞানের খাতিরেই নয়, মানুষের কল্যাণের জন্যে বিজ্ঞানের অনুশীলন করছেন। বিজ্ঞান-ভাণ্ডারে তিনি যে সব তথ্য সংযোজনা করেছেন, তা সর্বজন-স্বীকার্য। ভারতবর্ষ ও গ্রেট ব্রিটেন তাদের প্রতিভাকে মিলিত করে উভয়েই সমৃদ্ধ হতে পারে। জগদীশচন্দ্রের

মধ্যে তার যে শুভসূচনা দেখা গেছে, তাকে আমরা সর্বাগ্রে স্বাগত জানাই।”

‘নিউ ষ্টেট্স্ম্যান’ পত্রিকায় অ্যাবারডিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টম্সন লিখেছিলেন—“আপাত বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান, জীব ও অজৈব পদার্থের মর্মানুভূতিকে সম্পর্কযুক্ত করা এবং পদার্থ-বিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী মিল সম্পর্কে দূরদর্শন—এ সবকিছুই ভারতীয় প্রতিভার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। সে তত্ত্বানুসন্ধানের নায়ককে আজ আমাদের মধ্যে স্বাগত জানিয়ে গর্ববোধ করছি।”

জগদীশচন্দ্র ব্লুম্স্বেরী স্কোয়ারে তাঁর বাসায় একটি পরীক্ষাগার স্থাপন করেছিলেন। ইংল্যাণ্ডের বিশিষ্ট বিজ্ঞানিবৃন্দের অনেকেই আগ্রহের সঙ্গে এই পরীক্ষাগার পরিদর্শন করেন। জগদীশচন্দ্র লীড্স্ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবার জন্যে যে সাদর আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন, সে কথা উল্লেখ করবার বিশেষ সার্থকতা আছে। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাধ্যক্ষ ছিলেন সার মাইকেল স্যাড্লার। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে যে কমিশন গঠিত হয়েছিল, তার সভাপতি হিসেবে সার মাইকেল স্যাড্লার ভারতবাসীর কাছে সুপরিচিত।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারী লীড্স্ বিশ্ববিদ্যালয়ে জগদীশচন্দ্র একটি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতা যথাযোগ্য সমাদর লাভ করে। সার মাইকেল স্যাড্লার বলেন—“কঠিন বাধা-নিষেধে শৃঙ্খলিত পরীক্ষা-পদ্ধতি বা ইহুদিদের প্রধান সভা ‘স্যানহীড্রিম’ কর্তৃক প্রণীত পাঠ্যসূচীর মধ্যে কোনও বৃহৎ বৈজ্ঞানিক কীর্তির অবকাশ নেই। তা একমাত্র বাধাহীন তথ্যানুসন্ধানের দ্বারাই সম্ভব। জগদীশচন্দ্র ও তাঁর গবেষণা-মন্দির ভারতবাসীদের কাছে এক নতুন পথের আলোক-নির্দেশ।”

## অ্যাবারডিন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মাননা

জগদীশচন্দ্রের এই ইংল্যাণ্ড প্রবাসের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা—অ্যাবারডিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক এল. এল. ডি উপাধিলাভ। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক আর্থার টম্‌সন এক পত্রে (৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২০) জগদীশচন্দ্রকে জানান, "বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভায় আজ সন্ধ্যায় প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে—শারীরবিজ্ঞানে আপনার অবদান, ক্রেস্কোগ্রাফ ইত্যাদি যন্ত্রের উদ্ভাবন ও প্রাচ্যদেশে বিজ্ঞানে প্রগতির জন্যে আপনার নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টার স্বীকৃতিতে আপনাকে সম্মানসূচক এল. এল. ডি উপাধি প্রদান করা হবে। আমি আশা করি, ২৩শে মার্চ আপনি সমাবর্তন সভায় উপস্থিত থাকবেন।" এই পত্রের নির্দেশমত জগদীশচন্দ্র নির্ধারিত অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারেন নি। তাঁর অনুপস্থিতিতেই তাঁকে এই উপাধি প্রদান করা হয়।

## রয়্যাল সোসাইটির সদস্যপদে নির্বাচন

জগদীশচন্দ্রের সাম্প্রতিক ইংল্যাণ্ড ভ্রমণে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা—রয়্যাল সোসাইটির সদস্যপদে নির্বাচন। চতুর্থ বৈজ্ঞানিক মিশনের সার্থকতা আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, তখন থেকেই অধ্যাপক র‍্যালে ও অধ্যাপক ভাইনস্‌ তাঁর এই সম্মান-প্রাপ্তির জন্যে বিশেষভাবে চেষ্টা করতে থাকেন। দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে তাঁদের অকৃত্রিম চেষ্টা শেষ পর্যন্ত সফল হয়। বৃটিশ সাম্রাজ্যে রয়্যাল সোসাইটির সদস্যপদকে বৈজ্ঞানিক জীবনের উচ্চতম সম্মান বলে মনে করা হয়ে থাকে। জগদীশচন্দ্রের মত যোগ্য ব্যক্তিকে সে সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে সোসাইটির অহেতুক শৈথিল্যে অনেকেই যখন সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়েছেন—ঠিক সেই মুহূর্তেই এই অপ্রত্যাশিত সংবাদ ঘোষণা করা হয়েছিল। একদিন জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-কৃতিত্বের মূল্য স্বীকার করতে সোসাইটি কুণ্ঠিত হয়েছিলেন, দ্বিধাগ্রস্ত

হয়ে শেষ মুহূর্তে স্থগিত রেখেছিলেন তাঁর নিবন্ধ প্রকাশ। আর সেই সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন জগদীশচন্দ্রের বিরোধী জীব-বিজ্ঞানীরা। আশা-নিরাশায় উদ্বেল জগদীশচন্দ্রের সংগ্রাম ও সাধনার সে সুদীর্ঘ অধ্যায়ে সোসাইটির সিদ্ধান্ত ঘোষণা এক নাটকীয় পরিণতি এনে দিল। রয়্যাল সোসাইটির মনোনয়ন সম্পর্কে জগদীশচন্দ্র অধ্যাপক নাগকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তার মর্মার্থ—"তুমি কল্পনা করতে পারবে না, কি রকম বাধা-বিপত্তির সঙ্গে যুঝতে হয়েছে। এদেশে বর্তমান রাজনৈতিক বিক্ষোভের কথা ভেবে বন্ধুবর্গ গোড়াতে আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, আমার বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত প্রচারের তেমন সুবিধা হবে না। পরম বিস্ময়ের কথা, আমি সে পরিকল্পনায় অভাবনীয় সাফল্য লাভ করেছি। রয়্যাল সোসাইটির সদস্যপদের জন্যে মনোনয়নের কথাই ধরা যাক, সেটাও কম বিস্ময়কর নয়। আমার বিরোধী যে জীব-বিজ্ঞানী একদিন আমার গবেষণার ফলাফল নিজের নামে প্রকাশ করেছিলেন, তিনি এখনও শারীরবিজ্ঞানিগণকে আমার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। সদস্য নির্বাচন পর্বটা খুবই গোপনীয় এবং সেটা সম্পাদিত হয় বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রতিনিধিদের রিপোর্টের ভিত্তিতে। প্রত্যেক প্রতিনিধিই চেষ্টা করেন, বিভাগীয় কর্মীকে সমর্থন করতে। বিজ্ঞানের কোন্ বিভাগে আমার স্থান, সে সম্পর্কে প্রতিনিধিগণ নিশ্চিত ছিলেন না। পদার্থবিদ্‌গণ মনে করতেন, আমি শারীরবিজ্ঞানী, আর শেষোক্ত বিজ্ঞানী-গোষ্ঠীর ধারণা ছিল তার বিপরীত। আমার মনোনয়নের পক্ষে সে এক দুস্তর বাধা। এসব ব্যাপার আমি মনোনয়নের পরে শুনেছি। অবশ্য বিষয়টা এমনি গোপনীয় যে, আগে থাকতে কিছু জেনে ফেললে আমার মনোনয়ন বাতিল হয়ে যেত। যাহোক, এখন জানতে পারলাম জীব-বিজ্ঞানী, পদার্থবিদ, এমন কি, মনোবিজ্ঞানী পর্যন্ত আমাকে সমর্থন করেছেন।" অধ্যাপক ওয়ালারের বিরোধী কার্যকলাপ সম্বন্ধে চিঠির অন্যত্র জগদীশচন্দ্র লিখেছিলেন "গত

বৃহস্পতিবার রয়্যাল সোসাইটি অব মেডিসিনে এক সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এই সোসাইটি ও তার সদস্যদের বেশ নামডাক আছে। অন্যতম সদস্য হিসেবে ডক্‌টর ওয়ালারেরও যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি। নানা কাল্পনিক সন্দেহের অবতারণা করে তিনি আমার কাজের মূল্য লাঘব করবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। আগামী রবিবার রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে অভিনন্দিত করতে আসছেন।"

রয়্যাল সোসাইটির নিয়ম অনুসারে মনোনয়ন সম্পর্কিত ঘোষণাকে পরবর্তী এক সভায় চূড়ান্তভাবে সমর্থন করা হবে। যদিও ব্যাপারটা নেহাৎ নিয়মতান্ত্রিক, তথাপি জগদীশচন্দ্রের আশঙ্কা হয়েছিল যে, বিরোধীদলের চেষ্টায় এই মনোনয়ন হয়তো বাতিল হয়ে যেতে পারে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মে জগদীশচন্দ্র যথারীতি রয়্যাল সোসাইটির সদস্যপদের জন্যে চূড়ান্তভাবে মনোনীত হন। ২০শে মে আনুষ্ঠানিক-ভাবে সদস্যপদে বৃত হওয়ার কথা। সে দিন জগদীশচন্দ্রকে সোসাইটির সভাপতির সঙ্গে করমর্দন করতে হবে এবং একখানি স্মারক গ্রন্থে নিজের নাম লিপিবদ্ধ করতে হবে। সে গ্রন্থের নামের তালিকার শীর্ষে রয়েছে প্রথম চার্লসের স্বাক্ষর।

২০শে মে 'লণ্ডন টাইম্‌স্‌' পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হলো—"আজ আনুষ্ঠানিকভাবে জগদীশচন্দ্র রয়্যাল সোসাইটির সদস্যপদে নির্বাচিত হবেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কৃতিত্বের জন্যে ভারতীয় হিসেবে তিনিই এই সম্মানের দ্বিতীয় অধিকারী হলেন। ইতিপূর্বে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গাণিতিক গবেষণায় ডিগ্রীপ্রাপ্ত শ্রীনিবাস রামানুজন রয়্যাল সোসাইটির সদস্যপদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্রায় উনিশ বছর আগে জগদীশচন্দ্র রয়্যাল সোসাইটিতে উদ্ভিদের চেতনা সম্পর্কে প্রথম গবেষণা-পত্র প্রেরণ করেন। এই নিবন্ধ অপ্রকাশিত থাকে। বহু বছরের নিরবচ্ছিন্ন একাগ্র চেষ্টায় তথ্যানুসন্ধানের নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে।

জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বকে পূর্ণ স্বীকৃতি দানে রয়্যাল সোসাইটির এই যে দীর্ঘ বিলম্ব, তার পিছনে জাতিভেদের কোনও সঙ্কীর্ণ প্রশ্ন নেই। তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রকৃতি ও মূল্য নির্ণয় সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়েছে, তাকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিরোধ স্পর্শ করে নি।"

রয়্যাল সোসাইটির অনুষ্ঠান সম্পর্কে জগদীশচন্দ্র লিখেছেন—"এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে অধ্যাপক ভাইন্‌স্ সস্ত্রীক এসেছেন অক্সফোর্ড থেকে। একসঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজন করেছি। কয়েক সপ্তাহ ধরে দৈনিক দু'ঘণ্টার বেশী ঘুমাবার অবকাশ পাই নি। প্রতিটি মুহূর্ত দারুণ উৎকণ্ঠার মধ্যে কেটেছে। সেদিন মধ্যাহ্নভোজের পর আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না, তাই চেষ্টা করছিলাম ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নেবার। ভাইন্‌স্-দম্পতি আগেই বেরিয়ে গেলেন রয়্যাল সোসাইটিতে। কথা রইলো, শ্রীমতী অবলা আমাকে চারটার সময় ঘুম থেকে ডেকে তুলবেন, যাতে আমরা সাড়ে চারটার মধ্যে বারলিংটন হাউসে পৌঁছাতে পারি।"

কিন্তু বসুপত্নী সেদিন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। জগদীশচন্দ্রকে যখন জাগানো হলো, তখন ঠিক সাড়ে চারটা। অনুষ্ঠানের জন্যে শ্রীযুক্তা বসু বিশেষ পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। কিন্তু কোনও রকমে বেশ পরিবর্তন করে সেদিন বসু-দম্পতিকে বেরোতে হলো। একখানি ট্যাক্সিতে করে যখন তাঁরা বারলিংটন হাউসে পৌঁছালেন তখন অনুষ্ঠান শেষ হতে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড বাকী। জগদীশচন্দ্র লিখছেন—"দেখলাম, অধ্যাপক ভাইন্‌স্ উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটাছুটি করছেন; দ্রুতপদে প্রবেশ করলাম অনুষ্ঠান-কক্ষে। জনসম্মেলন আমার সম্বর্ধনায় মুখর হয়ে উঠলো। আমাকে স্মারক-গ্রন্থে স্বাক্ষর দিতে হবে, তখন খেয়াল হলো চশমা ফেলে এসেছি। ভগবান জানেন সেদিন কোথায় কি ভাবে স্বাক্ষর করেছিলাম।"

রয়্যাল সোসাইটি কর্তৃক এই সম্মাননার সংবাদ বিভিন্ন মহলে সানন্দে গৃহীত হলো। মণ্টেগু রোগশয্যা থেকে অভিনন্দন-পত্র পাঠালেন। 'নেচার' পত্রিকার সম্পাদক এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে জগদীশচন্দ্রকে অভিনন্দন জানান। লণ্ডনে ন্যাশন্যাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে যে সম্বর্ধনা করা হয়, তার উত্তরে জগদীশচন্দ্র বলেন—"কোনও রকম বিরোধের সঙ্গে নিজেদের জড়িত না করে আমরা দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে কাজ করে যাব। শুধু স্বদেশকে উন্নত করাই নয়, মানবজাতির কল্যাণও আমাদের লক্ষ্য।"

## বিরোধী জীব-বিজ্ঞানীদের চ্যালেঞ্জ ও তার প্রত্যুত্তর

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে রয়্যাল ইন্‌স্টিটিউশনে বক্তৃতার পর অধ্যাপক ওয়ালার 'টাইম্‌স্' পত্রিকায় একখানি পত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রে উদ্ভিদ-দেহের স্পন্দন-পরিমাপক ক্রেস্কোগ্রাফ যন্ত্র সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা হয় এবং আরও বলা হয় যে, অধ্যাপক বসু যেন তাঁর নিজস্ব পরীক্ষাগার ছাড়া অন্য কোথাও এই ক্রেস্কোগ্রাফ যন্ত্রের সূক্ষ্ম পরিমাপক ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। অনেকে জগদীশচন্দ্রকে এই চিঠির চ্যালেঞ্জ উপেক্ষা করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু জনৈক বিশিষ্ট শারীরবিজ্ঞানী 'টাইম্‌স্' পত্রিকায় অনুরূপ আর একখানি পত্র প্রকাশ করায় জগদীশচন্দ্রের পক্ষে নির্লিপ্ত হয়ে বসে থাকা সম্ভব হলো না। তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে এক পরীক্ষা প্রদর্শনের আয়োজন করলেন এবং যন্ত্রের পরিমাপক শক্তি প্রত্যক্ষভাবে দেখে যাবার জন্যে ইংল্যাণ্ডের খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের আহ্বান করলেন। ২৩শে এপ্রিল এই যন্ত্র-প্রদর্শনী দেখবার পর সংশয়-শূন্য বিজ্ঞানীরা 'টাইম্‌স্' পত্রিকায় যে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, সে সম্পর্কে 'নেচার'-এ ( ৬ই মে ) নিম্ন-উদ্‌ধৃত মন্তব্য ছাপা হয়—"সার জগদীশচন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত ক্রেস্কোগ্রাফ যন্ত্র সম্পর্কে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন—যন্ত্রের লিপিতে যা উদ্ভিদ-দেহের বৃদ্ধি-জ্ঞাপক

বলে মনে করা হচ্ছে, তা প্রকৃতপক্ষে পদার্থের আণবিক পরিবর্তনের জন্যে। লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে সার জগদীশ কর্তৃক এক পরীক্ষা প্রদর্শনের পর লর্ড র‍্যাম্লে, বেলিস্,, ব্ল্যাকম্যান, ক্লার্ক, ক্লিন্‌টন প্রমুখ অধ্যাপকগণ ৪ঠা মে তারিখের 'টাইম্‌স্' পত্রিকায় দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছেন যে, ক্রেস্কোগ্রাফ যন্ত্রে উদ্ভিদ-দেহের বৃদ্ধি দশ লক্ষ থেকে কোটি গুণ বর্ধিত আকারে নির্ভুলভাবে লিপিবদ্ধ হয়—এই বিষয়ে আর সংশয়ের অবকাশ নেই।" সার ডব্লিউ. এইচ. ব্র্যাগ ও অধ্যাপক এফ. ডব্লিউ. অলিভার অন্যত্র ক্রেস্কোগ্রাফ যন্ত্র দেখেছিলেন। তাঁরা বলেছেন যে, এই যন্ত্রে গৃহীত লিপি প্রকৃতই উদ্ভিদ-দেহের স্পন্দনের প্রতিচ্ছবি।"

'টাইম্‌স্' পত্রিকায় বিরোধী পক্ষের পত্র দু'খানি প্রকাশিত হবার পর যথেষ্ট অসুবিধা সত্ত্বেও জগদীশচন্দ্রকে এই পরীক্ষা প্রদর্শনের আয়োজন করতে হয়েছিল। নিজের বৈজ্ঞানিক সত্ত্বা ও প্রতিভাকে অবমানিত হতে দেখে কারও পক্ষে নীরব থাকা সম্ভব নয়, সব অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠে প্রতিবাদ ঘোষণা করা যাঁর প্রকৃতি, সেই জগদীশচন্দ্রের পক্ষে তো নয়ই! এ শুধু আত্মসমর্থন ও আত্মরক্ষার প্রশ্ন নয়, বিরোধ ও সংশয়ের আবিলতা থেকে মুক্ত করে বিজ্ঞানের চিরন্তন সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা এবং সেই সঙ্গে বিশ্বসমাজে ভারতবর্ষের মর্যাদা বৃদ্ধির প্রশ্ন। এই বিষয়ে স্থিরসঙ্কল্প হয়ে পরীক্ষা প্রদর্শনের পূর্বদিন, অর্থাৎ ২২শে এপ্রিল জগদীশচন্দ্র 'টাইম্‌স্' পত্রিকার সম্পাদককে একখানি চিঠি লেখেন—"সমালোচনা যখন শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন তা জ্ঞানের প্রগতিকে রোধ করে। আমার গবেষণার বিচিত্র ধরণ থেকে স্বভাবতঃই কতকগুলি অবাঞ্ছিত বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, গত বিশ বছরে কোন কোন মহলের স্বেচ্ছাকৃত অপব্যাখ্যার জন্যে এই বিরোধ আরও শোচনীয় হয়ে উঠেছে। আমার পথে যে সব প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয়েছিল, তাকে আমি এখন সম্পূর্ণ উপেক্ষা

করতে বা ভুলে থাকতে পারি। আমার গবেষণা যদি কোনও প্রচলিত মতবাদকে ধূলিসাৎ করে ব্যক্তিবিশেষের বিদ্বেষ ও উষ্মার কারণ হয়ে থাকে, তাতে আমার পক্ষে বিব্রত বোধ করবার কিছুই নেই। এদেশের বিজ্ঞানী-সমাজের কাছ থেকে সামগ্রিকভাবে যে অকুণ্ঠ অভিনন্দন পেয়েছি, তাকে অন্তরে গ্রহণ করে আমি পরম আনন্দিত।"

## বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা ও সম্বর্ধনা

প্রতিপক্ষের বিরোধিতা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে; জগদীশচন্দ্র সাময়িকভাবে মানসিক অশান্তি ভোগ করেছেন মাত্র। ইংল্যাণ্ডের বৃহত্তর জনসমাজে তাঁর নাম বিশেষ পরিচিত হয়ে ওঠে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা করবার আমন্ত্রণ আসে। পার্লামেন্টের সদস্যদের কাছে জগদীশচন্দ্রকে এক বক্তৃতা দিতে হয়। ৫ই মে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাবে বক্তৃতার পর ইউনিভার্সিটি কলেজের প্রভোস্ট সার রিচার্ড গ্রেগরি বলেন—"ছাত্রমহল একান্ত আগ্রহে অধ্যাপক বসুর বক্তৃতা শুনেছে, নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণও তাঁদের মধ্যে এমন উৎসাহ সঞ্চার করতে পারেন নি।" ১৭ই মে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে ইউনিভার্সিটি কলেজে জগদীশচন্দ্র এক ভাষণ দেন। শ্রোতৃমণ্ডলীর আগ্রহাতিশয্যে তাঁকে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দেড় ঘণ্টা বেশী সময় বক্তৃতা দিতে হয়েছিল। বক্তৃতাশেষে সভাপতি বলেছিলেন—"দিগ্‌দর্শন ও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মতই অধ্যাপক বসুর আবিষ্ক্রিয়াসমূহ বৈজ্ঞানিক প্রগতির ইতিহাসে বৈপ্লবিক রূপান্তর আনবে।"

'নেচার' পত্রিকার সম্পাদক কথাপ্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্রকে বলেছিলেন, তাঁর গবেষণাকে কেন্দ্র করে যে চাঞ্চল্য ও আগ্রহের সঞ্চার হয়েছে, বিজ্ঞানের ইতিহাসে তা দুর্লভ। পরিহাসচ্ছলে তিনি বিরোধী জীব-বিজ্ঞানীদের এর জন্যে সব কিছু প্রশংসা ও কৃতিত্ব

অর্পণ করেছিলেন। তিনি 'নেচার' পত্রিকায় প্রকাশ করবার জন্যে জগদীশচন্দ্রকে দুটি প্রবন্ধ লিখতে অনুরোধ করেন এবং উপযুক্ত দক্ষিণা দিতে প্রতিশ্রুত হন।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের প্রখ্যাত অধ্যাপক কারভেথ্ রীড্। তাঁর মতে, 'মনোবিজ্ঞানের দিক থেকেও অধ্যাপক বসুর গবেষণা যথেষ্ট মূল্যবান।' অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে অধ্যাপক রীডের আমন্ত্রণে জগদীশচন্দ্র মনোবিজ্ঞান সমিতিতে ( Psychological society ) "স্নায়বিক উত্তেজনার নিয়ন্ত্রণ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ইংল্যাণ্ডে রথামষ্টেড এক্স্পেরিমেণ্টাল ষ্টেশন ( Rothamstead Experimental Station ) পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কৃষি-গবেষণা-কেন্দ্র। জগদীশচন্দ্রের গবেষণায় এখানে যথেষ্ট আগ্রহ সঞ্চারিত হয়। ৪ঠা জুন কৃষি-গবেষণা-কেন্দ্রের পরিচালক ডক্টর রাসেল জগদীশচন্দ্রকে সম্বর্ধিত করেন। সেই উপলক্ষে এখানকার কর্মিবৃন্দ জগদীশচন্দ্রের বাসগৃহ সংলগ্ন পরীক্ষাগার পরিদর্শন করেন। ইংল্যাণ্ডের লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানী-মহলে ও তরুণ ছাত্রসমাজে জগদীশচন্দ্রের গবেষণা সম্পর্কে ব্যাপক কৌতূহল সঞ্চারিত হয়।

এই সময়ে জগদীশচন্দ্রের কাছে অনেক ইংরেজ ছাত্র বিজ্ঞান-মন্দির পরিদর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এদের মধ্যে অক্স্ফোর্ডের তরুণ ছাত্র হাক্স্লির নাম উল্লেখযোগ্য। এই অল্ডুস্ হাক্স্লি বর্তমান যুগে পাঠকমহলে একজন সুপরিচিত গ্রন্থকার। তিনি বসু-বিজ্ঞান-মন্দির পরিদর্শন করেন এবং এখানকার গবেষণা-প্রণালী সম্পর্কে অভিজ্ঞতার কথা 'Jesting Pilate' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। জগদীশচন্দ্রের রচনাবলীর সমালোচনা প্রসঙ্গে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে হাক্স্লি লিখেছিলেন—অধ্যাপক বসু জীব-জগৎ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে রূপান্তর এনে দিয়েছেন।

রয়্যাল সোসাইটি কর্তৃক সম্মাননায় ও ইংল্যাণ্ডের বিদগ্ধ সমাজের অকুণ্ঠ অভিনন্দনে অনেকে মনে করেছিলেন, জীব-বিজ্ঞানীদের

বিরোধী কর্মতৎপরতার উপর বুঝি বা যবনিকাপাত হলো। জগদীশচন্দ্র কিন্তু মোটেই নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। বিরোধী বিজ্ঞানী-মহল সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন। অধ্যাপক নাগকে একখানি পত্রে তিনি লিখেছিলেন—"আমার কাজ সম্পূর্ণ শেষ না করে ইংল্যাণ্ড পরিত্যাগ করতে ভরসা পাই না। সেই বিরোধী জীব-বিজ্ঞানী এখন হয়তো অজ্ঞাতবাসে রয়েছেন, কখন সুযোগ বুঝে আত্মপ্রকাশ করে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মিথ্যা সংশয়ের আলোড়ন তোলেন, ঠিক নেই।" জগদীশচন্দ্রের আশঙ্কা একেবারে মিথ্যা হয় নি।

### প্যারিসের বিজ্ঞানী-সমাজে

প্যারিসে জগদীশচন্দ্র শারীরবিজ্ঞান কংগ্রেসে ( Physiological Congress ) আমন্ত্রিত হয়ে আসেন। এখানে দার্শনিক বের্গসঁর সঙ্গে দেখা। তিনি জগদীশচন্দ্রের গবেষণার অন্যতম গুণগ্রাহী। জগদীশচন্দ্র প্রথমে বায়োলজিক্যাল সোসাইটি ও পরে শারীরবিজ্ঞান কংগ্রেসে বক্তৃতা দেন। এখানেও বিরোধী পক্ষ জগদীশচন্দ্রের গবেষণা ও আবিষ্কারের মূল্য খর্ব করবার চেষ্টায় ত্রুটি করেন নি।

সরবোঁর এক পরীক্ষাগৃহে জগদীশচন্দ্র ক্রেস্কোগ্রাফ যন্ত্রে উদ্ভিদ-দেহের স্পন্দন কোটি গুণ বর্ধিত আকারে লিপিবদ্ধ করেন। এরপর এক বিশেষ সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে ফরাসী বিজ্ঞান-অ্যাকাডেমির অনেক সদস্য উপস্থিত ছিলেন। ফরাসী শারীর-বিজ্ঞানীরা জগদীশচন্দ্রকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। প্যারিসের শারীরবিজ্ঞান কংগ্রেসে ইউরোপের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেক অধ্যাপক এসেছিলেন। জগদীশচন্দ্রকে তাঁরা নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাদর আমন্ত্রণ জানান। এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারলে ইউরোপে জগদীশচন্দ্র তাঁর বৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রচারের যথেষ্ট সুযোগ পেতেন। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে তাঁকে সত্বর লণ্ডনে ফিরে আসতে হয়।

প্যাট্রিক গ্যাডিস

**প্যাট্রিক গেডিস্ কর্তৃক জগদীশচন্দ্রের জীবনী প্রকাশ**

এই সময় অধ্যাপক প্যাট্রিক গেডিস্ জগদীশচন্দ্রের জীবন ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইংল্যাণ্ডের লংম্যান্স্ কর্তৃক "Life & Works of Sir Jagadish Chandra Bose" নামে এই পুস্তকখানি প্রকাশের ফলে জগদীশচন্দ্র ও তাঁর বহুবিতর্কিত গবেষণাধারা সম্পর্কে কৌতূহলী সাধারণ মানুষ একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র দেখতে পায়। জগদীশচন্দ্রের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার পক্ষে এই গ্রন্থ একটি সার্থক মাধ্যম বলে প্রমাণিত হয়। 'মার্কারি' নামে সাময়িক পত্রে ইংল্যাণ্ডের জনৈক প্রথিতযশা বিজ্ঞানী এই গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—

"সার জগদীশচন্দ্রের ইংল্যাণ্ড ভ্রমণে অনেকে প্রথম জানতে পারে যে, ভারতবর্ষে এমন একজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানীর অবির্ভাব হয়েছে, ইউরোপের পুরোবর্তী বিজ্ঞানীদের সঙ্গে একই পংক্তিতে যাঁর স্থান। আজ অধ্যাপক গেডিসের গ্রন্থে এক মহান জীবনের আলেখ্য দেখতে পেলাম, যেখানে অধ্যাপক বসুর অভিনব বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও জীবনের বিচিত্র রূপ আমাদিগকে উদ্‌বোধিত করে তোলে।"

সার অলিভার লজ, ইনস্টিটিউট অব প্যারিসের সদস্যবৃন্দ এবং আরও অনেক খ্যাতনামা বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি লেখেন। কোনও ফরাসী কলেজের কর্তৃপক্ষ এই বলে দুঃখ প্রকাশ করে চিঠি লেখেন যে, সেখানকার জীব-বিজ্ঞানের ছাত্রগণ জগদীশচন্দ্রের বিস্ময়কর পরীক্ষাগুলি দেখবার সুযোগ পায় নি। এই সময় ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনে একটা বিশেষ বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। এই বক্তৃতার পরে জগদীশচন্দ্র ইউরোপের বিভিন্ন বিজ্ঞান-অনুশীলন-কেন্দ্রে আমন্ত্রণ রক্ষা করবার অবকাশ পান। সম্ভবতঃ সেপ্টেম্বর মাসে তিনি স্টক্‌হোমে পৌছেন। স্থানীয় সংবাদপত্রসমূহে এই খবর ঘোষণা করা হয়। স্টকহোমের ফিজিক্যাল সোসাইটিতে ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে প্রদত্ত ভাষণ শ্রোতৃমণ্ডলী কর্তৃক যথেষ্ট সমাদৃত

হয়। সভাপতি অধ্যাপক কার্ল বেনেডিক্স্ জগদীশচন্দ্রকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানিয়ে বলেন—"হার্ৎসের আবিষ্কারের পর আপনি বিদ্যুৎ-তরঙ্গ নিয়ে যে গবেষণা করেছেন, তার ফলে বহু আগে থেকে আপনার নাম আমাদের অনেকের কাছে সুপরিচিত। কয়েকদিন আগে পদার্থ-বিজ্ঞানের একটি পুরনো বইয়ের অংশবিশেষ চোখে পড়লো। আমারই হাতে চিহ্নিত করা, সাধারণ বইয়ের মধ্যে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সমবর্তন সম্পর্কে আপনি যে গবেষণা করেছিলেন, তার উল্লেখ রয়েছে সেখানে। উত্তরকালে আপনার দৃষ্টি পড়েছে প্রাণময় প্রকৃতির উপর। আপনার গবেষণায় আজ উদ্ভিদ ও জড় পদার্থের অনেক অজ্ঞাত রহস্য আমাদের প্রতীতিগম্য হয়েছে।"

### জার্মান উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী হেবারল্যান্ট্

জগদীশচন্দ্রের গবেষণার ফলে অনেকের বৈজ্ঞানিক মতবাদেই আঘাত লেগেছিল। জার্মেনীর সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী হেবারল্যান্ট্ তাঁদের অন্যতম। স্বভাবতঃই অধ্যাপক হেবারল্যান্ট্ ও তাঁর সমর্থক বিজ্ঞানী-গোষ্ঠী জগদীশচন্দ্রের তথ্যসমূহ প্রসন্ন মনে স্বীকার করতে চান নি। তাঁদের সন্দেহ নিরসন করে স্বীয় মতবাদের সার্বজনীন স্বীকৃতির জন্যে জগদীশচন্দ্র বার্লিনে আসেন। তাঁর এই বার্লিন পরিভ্রমণ সার্থক হয়। বক্তৃতার পর জগদীশচন্দ্রের গবেষণার মৌলিকত্ব সম্পর্কে বিরোধী বিজ্ঞানীদের সব সন্দেহ দূরীভূত হয়। বার্লিনে এসে জগদীশচন্দ্র প্রথম যে অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন, তাতে আন্তরিকতার স্পর্শ ছিল না। একদিন যাঁরা ছিলেন প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী, আজ তাঁরাই অকৃত্রিম বন্ধু। বক্তৃতার পরদিন অধ্যাপক হেবারল্যান্ট্ জগদীশচন্দ্রের প্রশংসায় মুখর—"গতকাল সন্ধ্যায় আমরা এক দুর্লভ বিজ্ঞান-আলোচনা শোনবার সুযোগ পেয়েছিলাম। একজন ভারতীয় মনীষী পদার্থের সংবেদনশীলতা সম্পর্কে তাঁর গবেষণার ফলাফল প্রাঞ্জলভাষায় আমাদের কাছে বিবৃত করেন। আমাদের চোখে

আর একবার স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়লো, কত বিচিত্ররূপে উদ্ভিদ বাইরের উত্তেজনায় সাড়া দেয়। এটা একটা আকস্মিক ঘটনা নয় যে, একজন ভারতীয় বিজ্ঞানসাধক পদার্থের সংবেদনশীলতা পরিমাপের পদ্ধতিতে এমন পূর্ণতা সম্পাদন করেছেন। অধ্যাপক বসুর মধ্যে রয়েছে প্রাচীন ভারতের সেই অন্তর্দৃষ্টি—যে অন্তর্দৃষ্টি প্রত্যেক সজীব পদার্থের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম সংবেদনার সন্ধান পায়। বিশেষ আত্মিক শক্তির বলে প্রাচীন ভারতবর্ষীয় চিন্তানায়কগণ দার্শনিক অনুধ্যান ও নির্বিকল্প অন্তর-সমীক্ষার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন। একটা লক্ষণীয় বিষয় এই যে, তাঁদের নব্য প্রতিনিধির মধ্যে সেই একই আত্মিক শক্তি ভিন্নরূপে প্রকাশ পেয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের সেই ধারক, আমাদের আজকের অতিথি অধ্যাপক বসু বর্তমান যুগে জড়-বিজ্ঞানের অনুশীলনে অদ্ভুত পরীক্ষণ-ক্ষমতা ও সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। আমরা জার্মানরাও বহুদিন দার্শনিক চিন্তায় নিমগ্ন হয়েছিলাম। সেই সঙ্গে যথেষ্ট অভিনিবেশ সহকারে প্রত্যক্ষ-ভাবে প্রকৃতি-চর্চাও করেছি। সেদিক থেকে ভারতবাসী ও জার্মানদের মধ্যে ঐতিহ্যগত মিল রয়েছে। এই কারণেই জার্মান সাম্রাজ্যের রাজধানীতে অধ্যাপক বসুকে সংবর্ধনা জানাতে অধিকতর আনন্দ অনুভব করছি। বার্লিন শহরে আগমন করবার জন্যে তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি, বসুদম্পতি এখান থেকে মধুর স্মৃতি নিয়ে ফিরে যাবেন।" এর অল্প কিছুদিন পরেই জগদীশচন্দ্রের একাধিক গবেষণা-গ্রন্থ জার্মান ও ফরাসী ভাষায় অনুদিত হয়।

**ভারতসচিব মণ্টেগু**

পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানী-সমাজে এই অকুণ্ঠ স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান-মন্দিরে সরকারী অর্থ-সাহায্যের পথও সুগম হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে এই ব্যাপারে উৎকণ্ঠা নিয়েই জগদীশচন্দ্র ইংল্যাণ্ডে এসেছিলেন। ভারতসচিব মণ্টেগুর সঙ্গে পত্রালাপ ও ইণ্ডিয়া

অফিসে বক্তৃতা-সভায় ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়ে তাঁর সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। মণ্টেগু ভেবে দেখলেন, বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের স্থায়িত্বের জন্যে সরকার যদি অর্থ-সাহায্য করেন, তবেই শুধু অধ্যাপক বসুর প্রতিভাকে স্বীকার করা নয়, পৃথিবীতে বিজ্ঞানের প্রগতিসাধনে সহযোগিতাও করা হবে। এই অর্থ-সাহায্য যাতে মঞ্জুর হয়, মণ্টেগু আন্তরিকভাবে তার জন্যে চেষ্টা করেন। তবে এই বিষয়ে ভারত সরকারের তরফ থেকেই উদ্‌যোগের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু যে কর্মচারীর উপর এই অর্থ-সাহায্য সম্পর্কে যোগাযোগ ও অনুসন্ধানের ভার দেওয়া হয়েছিল, দুর্ভাগ্যবশতঃ কি এক অজ্ঞাত কারণে জগদীশচন্দ্র তাঁর বিরাগভাজন হয়েছিলেন। ফলে অবাঞ্ছিত বিলম্বে ভারতসচিব ও জগদীশচন্দ্র উভয়েই যথেষ্ট বিরক্ত ও উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। জগদীশচন্দ্র মনস্থির করেছিলেন, এই বিষয়ে একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না করে ভারতবর্ষে ফিরবেন না। কিন্তু নানা কারণে একান্ত বাধ্য হয়ে তাঁকে ডিসেম্বর মাসের প্রথমদিকে ইংল্যাণ্ড পরিত্যাগ করতে হয়। এই সময় মণ্টেগু ভারত সরকারের নিকট লিখিত এক পত্রে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে সরকারী অর্থ-সাহায্য সম্পর্কে দৃঢ়ভাবে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন। সে পত্রের অংশবিশেষ উদ্‌ধৃত করা হলো—

"লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার পরিকল্পিত বিজ্ঞান-মন্দিরকে অর্থ-সাহায্য করা খুবই সমীচীন বোধ করেছিলেন। আসন্ন শাসনসংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান সরকার সে সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত হতে চান। তাঁদের যুক্তি—'এই বিজ্ঞান-মন্দিরে অনুসৃত গবেষণাধারা একান্তভাবে দুরূহ তত্ত্বের অনুশীলনে সীমাবদ্ধ। এই কারণে তাকে প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য করবার মধ্যে কোনও যুক্তি নেই। অধিকন্তু শিক্ষা-কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী এই গবেষণা-মন্দিরে শিক্ষাদান ব্যবস্থার দিকে আরও বেশী দৃষ্টি দেওয়া উচিত এবং ভবিষ্যতে

বাংলা প্রদেশের একজন দায়িত্বসম্পন্ন মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে এই প্রতিষ্ঠানকে সরকারী শিক্ষানীতির নিয়ন্ত্রণাধীন করা সঙ্গত।'

"আমি সরকারের এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করতে পারছি না। সার জগদীশচন্দ্র বসুর গবেষণায় ভবিষ্যৎ উপযোগিতার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে, অবশ্য যদি না বিজ্ঞান-মন্দিরের কর্মধারাকে সঙ্কুচিত ও ভিন্নমুখী করা হয়। তবে অদূর ভবিষ্যতে শিল্পে ও কৃষিতে এই গবেষণার ফলাফলের কতটা সার্থক প্রয়োগ সম্ভব হবে, এখন তা নিশ্চিত বলা যায় না। অপরপক্ষে এই গবেষণাধারাকে যদি অব্যাহতভাবে চলতে দেওয়া যায়, তবে নিঃসন্দেহে একদিন তা ফলপ্রসূ হবে।

"অধ্যাপক ফার্মার ও উইলিয়াম বেলিসের মতামতের প্রতি আমি ভারত সরকারকে নতুন করে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করছি। এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, ব্যবহারিক বিজ্ঞানে গবেষণা সহজেই স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নজরে পড়ে। সুতরাং আর্থিক সাহায্যের জন্যে তা স্থানীয় সরকারের উপরেই নির্ভর করতে পারে। কিন্তু অধ্যাপক বসুর তত্ত্বীয় গবেষণা যা, সর্বদেশের বিজ্ঞানী-সমাজে সাগ্রহে আলোচিত হয়, তার আবেদন কোন বিশেষ সঙ্কীর্ণ স্থানে সীমাবদ্ধ থাকে না এবং প্রয়োজনীয় অর্থের জন্যে তাকে স্বভাবতঃই কেন্দ্রীয় সরকারের মুখাপেক্ষী হতে হয়। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে পরিকল্পিত বিজ্ঞান-মন্দির সরকারী সাহায্য পাবার যোগ্য বিবেচিত হয়েছিল। অন্তর্বর্তীকালে যা কিছু ঘটেছে, তাতে এই প্রতিষ্ঠানের দাবী কিছুমাত্র কমে নি বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি আশা করি, সরকার এই বিষয়ে দ্বিমত হবেন না। সার জগদীশচন্দ্র বসু নিজে এই বিজ্ঞান-মন্দিরের জন্যে প্রায় ছ'লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন। নিয়মিত বা এককালীন সাহায্য হিসেবে সরকার আজ পর্যন্ত যত টাকা মঞ্জুর করেছেন, অধ্যাপক বসুর একক দান তার চেয়ে বেশী। রয়্যাল সোসাইটির সদস্যপদে নির্বাচনের মধ্যেই তাঁর কৃতিত্ব ও পরীক্ষাসমূহের চূড়ান্ত মূল্যায়ন

হয়ে গেছে। লর্ড র‍্যালের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর আমি বুঝতে পেরেছি, বিজ্ঞান-মন্দিরে অর্থ-সাহায্যের বিষয়ে বিবেচনার জন্যে প্রস্তাবিত কমিটিকে শুধু পক্ষপাতশূন্য হলেই হবে না, এই প্রতিষ্ঠানের কর্মিগণ বিজ্ঞান-প্রগতির জন্যে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছেন কিনা, সেটা বিচার করে দেখবার যোগ্যতাও তার থাকা চাই। অবশ্য এই প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের গবেষণায় যদি কোন তত্ত্বের অবতারণা হয়, তা কতখানি যুক্তিসিদ্ধ, সে সম্পর্কে কমিটির কাছ থেকে কোনও অভিমত আশা করা সঙ্গত নাও হতে পারে। এখানকার গবেষণা সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে নেওয়ার কোন রকম পরিকল্পনা আমি সমর্থন করি না। আমার মতে, উপরে আলোচিত প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত এক কমিটির তত্ত্বাবধানে গবেষণা পরিচালিত হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

"সার জগদীশচন্দ্র বসুর ব্যক্তিত্ব এবং বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আন্তরিক নিষ্ঠাই আমাদের পক্ষে নিশ্চিন্ত হবার পক্ষে যথেষ্ট। কারণ, তাঁর পরিচালনায় বিজ্ঞান-মন্দিরের গবেষণাকার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হবে।

"আমি জানতে পারলাম, সার জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের সব কর্মী ও গবেষক ছাত্রকে পরিচালিত করবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি নিয়ম-কানুনের খসড়া তৈরী করেছেন। আমার মনে হয়, এই সুচিন্তিত নিয়মগুলি বিজ্ঞানের প্রগতির জন্যে নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা ও শৃঙ্খলা রক্ষার সহায়ক হবে। এই প্রসঙ্গে আমি তার এক প্রতিলিপি পাঠালাম।"

বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের গবেষণার প্রকৃতি ও মূল্য নির্ণয়ের জন্যে জগদীশচন্দ্র নিম্নলিখিত খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের নিয়ে এক কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেছিলেন—অধ্যাপক ভাইন্‌স্, লর্ড র‍্যালে, স্যার জন্ ফার্মার, অধ্যাপক অলিভার এবং অধ্যাপক কোহেন।

ভারতসচিব মণ্টেগুর উপরিউক্ত পত্রের মর্মানুযায়ী ভারত

সরকারের কর্তৃপক্ষ বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে বাৎসরিক একলক্ষ টাকা অর্থ-সাহায্য মঞ্জুর করেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন, যদি এই গবেষণা-মন্দিরের কর্মধারা আরও প্রসারিত হয় তবে অর্থ-সাহায্য বৃদ্ধি করা হবে, অবশ্য জনসাধারণ কি পরিমাণ অর্থদান করে, সেই অনুপাতে।

ইংল্যাণ্ড-প্রবাসেই জগদীশচন্দ্র পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এক আমন্ত্রণপত্র পেলেন, সেখানে সমাবর্তন উপলক্ষে ভাষণ দিতে হবে। কিন্তু ভারতবর্ষে ফিরতে অপ্রত্যাশিত বিলম্ব হওয়ায় তাঁর পক্ষে এই আমন্ত্রণ রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসের প্রথমদিকে জগদীশচন্দ্র পঞ্চম বৈজ্ঞানিক মিশন সমাপ্ত করে স্বদেশে এসে পৌছুলেন। অল্প কয়েকদিন পরেই ( ২৫শে জানুয়ারী ) টাউনহলে আয়োজিত এক জনসভায় তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হলো। উদ্‌যোক্তা ছিলেন কলকাতার তদানীন্তন শেরিফ।

দ্বাদশ অধ্যায়

# বিবিধ

**নির্বাক জীবনের অন্তঃপুরে**

জগদীশচন্দ্রের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান-মন্দিরের গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এখানকার কর্মিগণ ম্যাগ্‌নেটিক রেডিওমিটার, কন্‌ডাক্‌টিভিটি ব্যালান্স, ইলেক্‌ট্রিক প্রোব, ট্র্যান্‌স্‌পিরোগ্রাফ, রেকর্ডার ফর দি অ্যাসেণ্ট অব স্যাপ, ফটোসিন্‌থেটিক রেকর্ডার প্রভৃতি যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। নির্বাক জীবনের যে অন্তঃপুর এতদিন মানুষের কাছে অনধিগম্য ছিল, এসব যন্ত্রের মাধ্যমে মরমী বিজ্ঞানী তার বিচিত্র কাহিনী প্রকাশ করেন। উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনধর্মে যে মৌলিক অভিন্নতা রয়েছে, তার সংশয়াতীত প্রমাণ সংগৃহীত হতে লাগলো বহুমুখী পরীক্ষার ভিতর দিয়ে। এসব গবেষণার সার্থকতা সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র জনৈক বন্ধুকে লিখছেন—

"আমি ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে আসবার পর বিশেষ উল্লেখযোগ্য কতকগুলি আবিষ্কার হয়েছে। নিঃসংশয়ে বলা চলে, সার্থক বৈজ্ঞানিক গবেষণার পরিমাণের দিক থেকে বিজ্ঞান-মন্দিরের সঙ্গে অন্য কোন গবেষণা-কেন্দ্রের তুলনা হয় না। ফ্রান্স ও জার্মেনীর বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকেরা তাঁদের দেশীয় ভাষায় আমার গবেষণার ফলাফল লিপিবদ্ধ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আমি কখনও আশা করি নি, এত অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের গবেষণা এরূপ ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করবে। এখানকার গবেষণাধারাকে আরও নানাদিকে পরিব্যাপ্ত করবার কথা চিন্তা করছি।"

এই সময়ে ইউরোপের বিজ্ঞান-কর্মিগণ জগদীশচন্দ্রকে তাঁর নবলব্ধ

তথ্যসমূহ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করবার জন্যে সাগ্রহ অনুরোধ জানান। জগদীশচন্দ্রও গবেষণার ফলাফল বিভিন্ন সোসাইটির মুখপত্রে খণ্ডিত-ভাবে প্রকাশ না করে গ্রাহ্য-আয়তনের গ্রন্থে সন্নিবেশিত করাই শ্রেয়ঃ মনে করলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শতাধিক পরীক্ষা সম্পাদন ও সেগুলিকে লিপিবদ্ধ করে তিনটি সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ নিঃসন্দেহে দুরূহ ব্যাপার। লংম্যান্‌স্, গ্রীন অ্যাণ্ড কোম্পানি কর্তৃক প্রকাশিত এই পুস্তক তিনখানি হলো—Transactions of the Bose Institute ( Vols. III & IV ), Physiology of the Ascent of sap ( 1923 ) এবং The Physiology of Photosynthesis (1914)।

জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞান-মন্দিরের নবতম আবিষ্কার ও তার মূল্য সম্পর্কে অকৃত্রিম বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক শেঠ মূলরাজ খাটাউকে লিখছেন—"আপনার হয়তো স্মরণ থাকতে পারে, আমি একদিন বলেছিলাম, উদ্ভিদের জীবনধর্ম ও বৃদ্ধির উপর পূর্ণ আলোকপাত ছাড়া কৃষি-বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়। ভারতবর্ষ ও আমেরিকায় কৃষিবিভাগ নিষ্ফলভাবে অজস্র অর্থ ব্যয় করছে। উদ্ভিদের জীবন-প্রক্রিয়ার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন এবং প্রাণী ও উদ্ভিদ-জীবনের মধ্যে ঐক্যের সন্ধানই বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রধান লক্ষ্য। আমাদের তথ্যানু-সন্ধানের ফলে শুধু কৃষিই নয়, চিকিৎসা ও অন্যান্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বহুবিধ উন্নতি সাধিত হবে। আপনি সে সম্ভাবনার বিষয় উপলব্ধি করেই উদ্ভিদ-জীবন সম্পর্কে গবেষণায় অর্থদানে উদ্‌যোগী হয়েছেন। আপনি হয়তো জানেন, বেতার-টেলিগ্রাফের কতকগুলি আনুষঙ্গিক তথ্য আমার বীক্ষণাগারেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। বহুসংখ্যক কর্মীর দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের সম্মিলিত চেষ্টায় বেতার-যোগাযোগ ব্যবস্থায় যুগান্তর আনয়ন সম্ভব হয়েছে। আমার এক সাম্প্রতিক আবিষ্কারে খাদ্য-পরিপাক ও পুষ্টি-বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা গেছে। তার ফলে প্রাণী ও উদ্ভিদ-জীবন, উভয়েরই কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। এই জাতীয়

গবেষণা তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে এবং তার জন্যে সারা বিশ্ব ভারতবর্ষের কাছে ঋণী হয়ে থাকবে।"

## বিশ্বভারতীর ভাইস-প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ

রবীন্দ্রনাথ এই সময় জগদীশচন্দ্রকে বিশ্বভারতীর ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণের জন্যে আমন্ত্রণ জানান—"বিশ্বভারতীকে এইবার সাধারণের হাতে সমর্পণ করে দিচ্চি। তোমাকে এর ভাইস-প্রেসিডেন্টের আসনে বসাতে চাই। সম্মতি লিখে পাঠিয়ো। বেশী কিছু দায়িত্ব নেই, কেবল তোমার নামের সঙ্গে যোগ না থাকলে চলবে না—সময় যদি পাও এই সূত্রে কাজের যোগও ঘটবে। ভেবেছিলুম দার্জিলিঙে তোমাদের পাড়ায় ঘুরে আসব, অমনি তোমাকে বিশ্বভারতীর Constitution দেখিয়ে সভ্য করে আসব।" জগদীশচন্দ্র এই আমন্ত্রণে বিশ্বভারতীর উপাচার্যের ( ভাইস্-প্রেসিডেন্ট ) পদ গ্রহণে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

## ইউরোপে ষষ্ঠ বৈজ্ঞানিক মিশন

জগদীশচন্দ্রের সদ্যপ্রকাশিত তিনখানি পুস্তকে তাঁর যন্ত্রসমূহ ও সম্ভাবনাপূর্ণ গবেষণার পরিচয় পেয়ে পাশ্চাত্ত্যের বিজ্ঞানী-সমাজ খুবই উৎসাহিত হয়ে ছিলেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে জগদীশচন্দ্র ষষ্ঠ বৈজ্ঞানিক মিশন নিয়ে ইংল্যাণ্ডে পৌছেন। পূর্ববর্তী মিশনে ক্রেস্কোগ্রাফ যন্ত্রের মত এবার ফটোসিন্থেটিক রেকর্ডার সম্পর্কে বিজ্ঞানী-মহলে বিশেষ আগ্রহের সঞ্চার হয়। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত বক্তৃতা-সভায় তিনি এই যন্ত্রের ক্রিয়াকৌশল প্রদর্শন করেন। প্রখ্যাত ভৌতরসায়ন-বিজ্ঞানী অধ্যাপক ডনান্ শারীরবিজ্ঞানের গবেষণায় এই যন্ত্রের প্রয়োগ ও জগদীশচন্দ্রের সৃজনী প্রতিভার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। উদ্ভিদ-দেহে পত্রহরিৎ ( সবুজ কণা বা ক্লোরোফিল ) সূর্যালোকের সহায়তায় জল ও অঙ্গারাম্ল (Carbon dioxide) থেকে

খাদ্য সংশ্লেষিত করে। এই প্রক্রিয়ার পারিভাষিক নাম আলোক-সংশ্লেষণ (Photosynthesis)। এই বিষয়ে অধ্যাপক ব্ল্যাকম্যান ও তাঁর সহকর্মিগণ বিশেষ গবেষণা করেছেন। তাঁরাও জগদীশচন্দ্রের ফটোসিন্‌থেটিক রেকর্ডার দেখে বিস্মিত হন। এই বক্তৃতা উপলক্ষে 'টাইম্‌স্' পত্রিকায় (২৪শে নভেম্বর, ১৯২৩) বসু-বিজ্ঞান-মন্দির ও জগদীশচন্দ্রের গবেষণা সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়।

তিনি লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজ (১৫ই নভেম্বর, ১৯২৩), লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয় (২০শে নভেম্বর, ১৯২৩), লণ্ডন ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্স (২৬শে নভেম্বর, ১৯২৩), রয়্যাল সোসাইটি অব মেডিসিন (৬ই ডিসেম্বর) ও আরও অনেক বিজ্ঞান-অনুশীলন-কেন্দ্রে বক্তৃতা দেন। বলা বাহুল্য, সর্বত্রই তাঁর বক্তৃতাসমূহ শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে সমাদৃত হয়। ইণ্ডিয়া অফিসে (৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৪) তিনি যে বক্তৃতা দেন, তার বিশেষ তাৎপর্য আছে। তৎকালীন ভারতসচিব লর্ড অলিভিয়ার এই বক্তৃতা-সভার আয়োজন করেন। পূর্ববর্তী ভারত-সচিব মণ্টেগুর মত তিনিও জগদীশচন্দ্রের একজন গুণগ্রাহী ছিলেন। বিজ্ঞানের এই আলোচনা-সভায় ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্‌ডের সাগ্রহ উপস্থিতি ও ভাষণ একান্ত বিরল ঘটনা। শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে ভারতের প্রাক্তন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ এবং বার্ণাড-শ-ও ছিলেন। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা কর্তৃক বিজ্ঞানের মূল্যবোধ ও ও বিজ্ঞানকে স্বীকৃতি দানের এই বোধ হয় প্রথম ঘটনা। সে দুর্লভ কৃতিত্বের জন্যে 'নেচার' পত্রিকার সম্পাদক জগদীশচন্দ্রকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। ইংল্যাণ্ডের পত্রিকাসমূহে ইণ্ডিয়া অফিসে আয়োজিত বক্তৃতা-সভার বিস্তৃত বিবরণী প্রকাশিত হয়।

## ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল কো-অপারেশন কমিটির সদস্য মনোনীত

জগদীশচন্দ্রের প্রতিভা সম্পর্কে স্বদেশে ঊর্ধ্বতন সরকারী-মহল যে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন, এই সময় তার এক পরিচয় পাওয়া

গেল। ইণ্ডিয়া অফিসে বক্তৃতার অল্প কিছুদিন পরে সেখানকার কর্তৃপক্ষ জগদীশচন্দ্রকে এই মর্মে এক চিঠি লেখেন যে, লীগ অব নেশন্‌স্-এর শাখা ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল কো-অপ্যারেশন কমিটিতে একজন ভারতীয় প্রতিনিধি নেওয়া হবে। ব্রিটিশ প্রতিনিধি লর্ড পারস্থর জগদীশচন্দ্রের নাম প্রস্তাব করেন। এই সদস্যপদ গ্রহণ করতে তিনি সম্মত আছেন কিনা, কর্তৃপক্ষ তা জানতে চান।

লীগ অব নেশন্‌স্ ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে এই ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল কো-অপারেশন কমিটি গঠন করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে তোলাই ছিল এই সংস্থার উদ্দেশ্য। প্রথিতযশা শিল্পী, সাহিত্যিক ও বিজ্ঞানীদের নিয়ে এই কমিটি গঠিত হতো। জগদীশচন্দ্রের সম্মতিক্রমে কর্তৃপক্ষ তাঁকে এই সম্মানসূচক সদস্যপদে নির্বাচিত করেন।

ইতিমধ্যে প্যারিস থেকে জগদীশচন্দ্রের কাছে সাদর আমন্ত্রণ আসে। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় ও ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামে বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। মার্চ মাসের গোড়ার দিকে তিনি এই আমন্ত্রণ রক্ষা করবার জন্যে ফ্রান্সে উপস্থিত হন। প্রখ্যাত উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী অধ্যাপক মলিয়ার্ড তখন সরবোঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-পরিষদের ডীন। তাঁর সভাপতিত্বে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে জগদীশচন্দ্র এক বক্তৃতা দেন। আলোক-সংশ্লেষণ সম্পর্কিত গবেষণায় অধ্যাপক ম্যাংগিনের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। তিনি জগদীশচন্দ্রের মৌলিক আবিষ্কারের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন। উদ্ভিদ-দেহে ঊর্ধ্বমুখী রস-সঞ্চালন (Ascent of sap) সম্পর্কে জগদীশচন্দ্র যে গবেষণা করেন, তার উপর College de France-এ সেখানকার শারীরবিজ্ঞানের অধ্যাপক কয়েকটি বক্তৃতা দেন। শারীরবিজ্ঞান বিভাগে গবেষণা-কর্মীদের সুবিধার জন্যে জগদীশচন্দ্রের 'Comparative Electro-Physiology' নামক গ্রন্থখানি ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়। এই সময় তাঁর একাধিক গ্রন্থ জার্মেনী ও ফ্রান্সের বিশিষ্ট প্রকাশনা-সংস্থা কর্তৃক

ভাষান্তরিত হয়। রাশিয়াতেও কিছু কিছু অনুবাদ প্রকাশিত হতে থাকে।

মার্চ মাসের শেষের দিকে লীগ অব নেশন্‌স্ ব্রুসেল্‌সে এক বিজ্ঞান-কংগ্রেসের আয়োজন করে। জগদীশচন্দ্রকে এই সম্মেলনে যোগদান করবার জন্যে আহ্বান করা হয়। কিন্তু সময়াভাবে তাঁর পক্ষে এই আমন্ত্রণ রক্ষা করা সম্ভব হয় নি; এপ্রিল মাসের প্রথম ভাগে তিনি স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করেন।

**গবেষণা-গ্রন্থ প্রকাশ**

প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনধর্মের মধ্যে অন্তর্নিহিত ঐক্যের সন্ধানে জগদীশচন্দ্রের গবেষণার তৃতীয় অধ্যায় আরম্ভ হয়েছে। তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই অধ্যায় প্রসারিত। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি বিভিন্নমুখী গবেষণার মধ্য দিয়ে উদ্ভিদের জৈব-প্রক্রিয়ার স্বরূপ নির্ণয়ে প্রয়াসী হন। এই সময়কার গবেষণার মূল বিষয় হলো, প্রাণী-দেহের মত উদ্ভিদ-দেহেও রস-সংবহনতন্ত্র ও স্নায়ুসূত্রের সন্ধান এবং নিখুঁত পরীক্ষার সাহায্যে সেই জৈব লক্ষণসমূহ আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য করা। লংম্যান্‌স্ কোম্পানি কর্তৃক প্রকাশিত 'The Nervous Mechanism in Plants' গ্রন্থে এই নতুন গবেষণার বিষয় সন্নিবেশিত হয়। জগদীশচন্দ্র এই গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ করেন। জগদীশচন্দ্র লিখেছেন—(২১শে এপ্রিল, ১৯২৬)—"Nervous Mechanism in Plants তোমার নামে উৎসর্গ করিলাম।" এর অব্যবহিত পরেই কবি বিদেশযাত্রা করেন। ডিসেম্বরে শান্তিনিকেতনে প্রত্যাগমনের পর এই গ্রন্থ তাঁর হস্তগত হয়। সে প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র (২৮শে ডিসেম্বর, ১৯২৬)—

"বহুদিন পরে দেশে ফিরে আসবার আনন্দ যখন ম্লান হয়ে এসেছিল এমন সময়ে আমার নামে উৎসর্গ করা তোমার যে বই আমার অনুপস্থিতিকালে এখানে এসেছিল সেইটি হাতে আসাতে তখনি বুঝতে

পারলুম এইখানেই আমাদের সত্য, এই আলো এই প্রাণ, এই ভারতের নিত্য পরিচয়। এই বইখানির মধ্যে তোমার বন্ধুত্বের বাণী পেয়ে ভারি আনন্দ হল। তোমার আশ্চর্য কীর্ত্তির বিবরণ মাঝে মাঝে পেয়েছি—সে কীর্ত্তি আজ সমস্ত বাধা লঙ্ঘন করে পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হয়েছে। এতে মনে কত আনন্দ ও গৌরব অনুভব করি বলে শেষ করতে পারিনে।"

**পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন-উৎসবে ভাষণ**

জগদীশচন্দ্র যখন উদ্ভিদ-দেহে প্রাণধর্মের এই একাগ্র সন্ধানে ব্যাপৃত, তখন তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হন—সেখানে সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দেবার জন্যে। ইতিপূর্বে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আর একবার আমন্ত্রণ এসেছিল, কিন্তু জগদীশচন্দ্র সে আমন্ত্রণ রক্ষা করবার অবকাশ পান নি; তাই তিনি সানন্দে এবারকার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। এই উপলক্ষে তিনি পাঞ্জাবে বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেন। ১৯শে ডিসেম্বর (১৯২৪) তিনি সমাবর্তন উৎসবে যে ভাষণ দেন, তাতে তাঁর গবেষণার কথা ছাড়াও তরুণ ছাত্রসমাজের উদ্দেশ্যে উপসংহারে বলেছিলেন—

"বৈদিক যুগের এক মহীয়সী নারীর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল—যেনাহং নামৃতা স্যাম তেনাহং কিম্ কুর্যাম। অতীতে বহু জাতির উত্থান হয়েছে, যারা নিজের শৌর্যে বিশ্বসাম্রাজ্যের অধিকার লাভ করেছে। তাদের পার্থিব শক্তির খণ্ড কাহিনী মাত্র ইতিহাসের পাতায় ক্ষীণস্মৃতি স্বরূপ বেঁচে আছে। কিন্তু বস্তু-জগতের মধ্যে আরও অনেক কিছুর প্রোজ্জ্বল প্রকাশ হয়, যা সবকিছু বিনাশের উর্দ্ধে কালজয়ী হয়ে থাকে। সে হলো মানুষের চিন্তাধারা—পার্থিব সম্পদ নয়, সুকৃতি এবং ভাব ও আদর্শের উদার উজ্জীবনের মধ্যেই মানবতার মহত্তম প্রতিষ্ঠা।"

পরের বছর ২১শে ডিসেম্বর তারিখে জগদীশচন্দ্র কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দেন।

### কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ গ্রহণের আহ্বান

এই সময়ে জগদীশচন্দ্রকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ গ্রহণের জন্যে আহ্বান করা হয়। কিন্তু তিনি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে এই সাদর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন, এই কর্মভার তাঁর নিরবচ্ছিন্ন সাধনা ও জীবনের সঙ্কল্প পরিপূরণের অনুকূল হবে না।

### গবেষণা-লব্ধ নতুন মতবাদের স্বীকৃতি

জগদীশচন্দ্রের নতুন গবেষণায় পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে যে বিস্ময়বোধ জেগেছিল, ভ্যান বিউরেন থর্ণের সমালোচনা-পত্রে তা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি মন্তব্য করেছেন—"যে যুক্তিধারা অনুসরণ করে অধ্যাপক বসু উদ্ভিদের জীবনধর্ম সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন, তাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক পদ্ধতির উপর তার প্রতিষ্ঠা। সেখানে বিস্ময় থাকতে পারে, কিন্তু অতীন্দ্রিয় কল্পনার আভাসমাত্র নেই। পূর্বতন বিজ্ঞানীদের তত্ত্বসমূহ গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং পরিশেষে দ্ব্যর্থহীন পরীক্ষা ও যুক্তির সাহায্যে সেগুলি খণ্ডিত হয়েছে।"

সত্যসন্ধ বিজ্ঞানী হিসেবে জগদীশচন্দ্র যে সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করেন, প্রসঙ্গতঃ সে কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে জার্মেনীতে 'Menschen and Menschenwerke' (এ-যুগের মানুষ ও তার কর্মপ্রয়াস) নামে ইংরেজী, ফরাসী ও জার্মান ভাষায় একখানি এন্‌সাইক্লোপিডিয়া প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যাঁরা পথিকৃৎ, এই গ্রন্থে তাঁদের যুগান্তকারী কর্মধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। জগদীশচন্দ্রের গবেষণার আনুপূর্বিক বিবরণের শেষে

এই ত্রিভাষিক গ্রন্থে মন্তব্য করা হয়েছে—"এই মহান ভারতীয় মনীষীর মধ্যে সত্যানুসন্ধানের প্রবল স্পৃহা ও জগতের মূলান্বেষী দৃষ্টি, এই উভয়ের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে।" সমসাময়িক অপর এক গ্রন্থ 'The History of our Time'। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী অধ্যাপক টিমিরিয়েজেফ্ এই গ্রন্থে জগদীশচন্দ্রের গবেষণা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

### বিজ্ঞান-প্রচারে জগদীশচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী

এই সময় 'ম্যান্‌চেষ্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকার সম্পাদকের অনুরোধ-ক্রমে জগদীশচন্দ্র উক্ত পত্রিকায় তাঁর নতুন গবেষণা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠান। প্রবন্ধের সঙ্গে তিনি সম্পাদককে নিম্নলিখিত মর্মে এক চিঠি দিয়েছিলেন—"দু-বছর আগে ইউরোপ ভ্রমণের সময় আমি উপলব্ধি করেছিলাম—বিবেক-বর্জিত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে মানুষ আজ এক অজ্ঞাত সঙ্কটের সম্মুখীন। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে গোপনীয়তা রক্ষার চেষ্টা এবং নীতিবিরুদ্ধ কলাকৌশল সভ্যতাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। আপনারা ন্যায়পক্ষ সমর্থন ও মানুষে মানুষে সম্পর্ককে গ্লানিমুক্ত করবার চেষ্টা করে আসছেন। আজ মানুষের মধ্যে একাত্মবোধ বা সমস্বার্থবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে, সে জন্যেও আপনাদের চেষ্টার অন্ত নেই। আপনাদের পত্রিকার সমৃদ্ধি কামনা করি।" জগদীশচন্দ্র মনে করতেন—বিজ্ঞান এক পবিত্র স্বর্গীয় দান—বিশ্বাস করতেন তার শুভঙ্কর রূপে। বিজ্ঞানের নারকীয় বীভৎসতা অবিবেকী মানুষের নিজের সৃষ্টি। স্বদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি ও মানুষের কল্যাণের জন্যে সে শুভঙ্কর বিজ্ঞানের প্রাণময় সাধনা ছাড়া জগদীশচন্দ্রের আর কোন ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য ছিল না। ইংল্যাণ্ড থেকে জনৈক ভদ্রলোক জগদীশচন্দ্রকে অনুরোধ করেছিলেন—কোনও ইংরেজী পত্রিকায় তাঁর গবেষণা সম্পর্কে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখবার জন্যে। মোটা পারিশ্রমিকের লোভও দেখিয়েছিলেন।

কিন্তু জগদীশচন্দ্র তাঁর গবেষণা-লব্ধ নতুন জ্ঞান প্রচারের পক্ষপাতী হলেও সংবাদপত্রের পাতায় এ নিয়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টির মনোবৃত্তিকে ঘৃণা করতেন। এই বিষয়ে তিনি যে উচ্চ আদর্শ অনুসরণ করতেন, উক্ত ভদ্রলোককে লিখিত পত্রোত্তরে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

"সত্য মাত্রেরই একটা অলৌকিক সৌন্দর্য আছে। তাকে আকর্ষণীয় করবার জন্যে কোনও হীন চেষ্টার প্রয়োজন নেই। এতদিনে আমার লেখার সঙ্গে অনেকের নিশ্চয়ই পরিচয় হয়েছে। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি 'ম্যান্‌চেষ্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকায় আমার এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার কথা। আমি আশা করি, সে প্রবন্ধ সাধারণ মানুষের পক্ষে যথেষ্ট সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য করে লেখা হয়েছে। নিছক কৌতূহল মেটানো ছাড়া আমার আর কোনও উদ্দেশ্য নেই। যদি আপনা থেকে কোনও অর্থ আসে তবে আমার বিজ্ঞান-মন্দিরের জন্যে নিঃসঙ্কোচে তা গ্রহণ করব। দেখবেন কোন-কিছুই যেন শুধুমাত্র অর্থকরী কৌশলে পর্যবসিত না হয়। স্বদেশের মর্যাদা যাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হয়, সেটাই আমাদের লক্ষ্য।" ইতিমধ্যে তাঁর নতুন গবেষণায় কথা আমেরিকাতেও যথেষ্ট প্রচারিত হয়েছে। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকা এবং অপর একটি প্রকাশনা-সংস্থা জগদীশচন্দ্রকে লোকরঞ্জক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ লিখতে অনুরোধ জানায়। পারিশ্রমিক হিসেবে তারা প্রচুর অর্থ দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছিল। কিন্তু জগদীশচন্দ্র তাঁর আদর্শ থেকে কিছুমাত্র বিচ্যুত হন নি।

**বিজ্ঞান-মন্দির সম্প্রসারণের জন্যে অর্থ-সঙ্গতির চেষ্টা**

জগদীশচন্দ্রের নতুন আবিষ্কারের ফলে বহুবিস্তীর্ণ অনুসন্ধানের পথ খুলে যায়। স্বভাবতঃই বিজ্ঞান-মন্দিরের কর্মধারার প্রসারণ ও-গবেষণায় স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধির একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের বর্তমান আর্থিক সংস্থানে এই সম্প্রসারণ-কার্য সম্ভব

নয়। তাই জগদীশচন্দ্র সরকার ও জনসাধারণের কাছে অর্থ-সাহায্যের আবেদন জানান। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে সরকার পক্ষ থেকে যখন একলক্ষ টাকা সাময়িক অর্থ-সাহায্য মঞ্জুর করা হয়, তখন ভারতসচিবের পত্রে ভবিষ্যতে তার পরিমাণ বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করা হবে, এরূপ আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। এরপরে ঐ সাময়িক সাহায্য বৃদ্ধির পরিবর্তে ঐ পরিমাণ অর্থই বিজ্ঞান-মন্দিরের জন্যে ভারত সরকার নিয়মিত বার্ষিক সাহায্য হিসাবে মঞ্জুর করেন। বার্ষিক এই একলক্ষ টাকা সরকারী সাহায্য ১৯৩১-'৩২ সন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর জগদীশচন্দ্র দার্জিলিং-এ দরবার কক্ষে এক বক্তৃতা দেন। সভাপতি ছিলেন বাংলার তৎকালীন গভর্ণর লর্ড লিটন। লেডী লিটনও উপস্থিত ছিলেন। লর্ড লিটন বলেন—"দেশীয় তরুণ সম্প্রদায়কে নব্যবিজ্ঞানের মন্ত্রে উদ্‌বোধিত করবার পক্ষে জগদীশচন্দ্র যোগ্যতম আচার্য ও বিজ্ঞান-মন্দির সবচেয়ে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ।" এই বিজ্ঞান-মন্দির সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা অনুক্ত থাকলেও মাননীয় গভর্ণরের ভাষণে তার আভাস সুস্পষ্ট।

এই সময় পাশ্চাত্যের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান-প্রগতির ক্ষেত্রে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের ভূমিকা সম্পর্কে ভারত সরকারকে তাঁদের সপ্রশংস অভিমত জানান। এর ফলে আশা করা গিয়েছিল যে, সরকারী অর্থ-সাহায্যের পরিমাণ বর্ধিত হবে। এই সময়ে ভারত সরকারের শিক্ষা-কমিশনারকেও বিজ্ঞান-মন্দির পরিদর্শনে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বার্ষিক সাহায্যের পরিমাণ কিছুমাত্র বর্ধিত হয় নি। তবে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে তিনি যে আবেদন করেছিলেন, তা ব্যর্থ হয় নি। আবেদনে যাঁরা সাড়া দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে রাও সাহেব কুমার কে. পি. সিং, মেসার্স বিড়লা ব্রাদার্স, পাটনার ওঙ্কার জালান প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই

সময়ে কাশ্মীরের মহারাজা বসু-বিজ্ঞান-মন্দির পরিদর্শন করেন এবং প্রচুর অর্থ-সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সম্পূর্ণরূপে সে প্রতিশ্রুতি রক্ষার পূর্বেই অপ্রত্যাশিতভাবে মহারাজা পরলোকগমন করেন।

### প্রেসিডেন্সি কলেজে সম্বর্ধনা

অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণের পরেও জগদীশচন্দ্র এমেরিটাস অধ্যাপক হিসেবে প্রেসিডেন্সি কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে এই অধ্যাপনা বিষয়ক সম্পর্কের চল্লিশ বছর পূর্ণ হয়। সেই উপলক্ষে কলেজের ছাত্র-পরিষদের পক্ষ থেকে জগদীশচন্দ্রের সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়। ১৯শে জানুয়ারী তারিখের এই অনুষ্ঠানে জগদীশচন্দ্র ছাত্র ও অধ্যাপকমণ্ডলীর সম্মিলিত প্রীতি ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য গ্রহণ করে তাঁদের প্রশস্তির উত্তরে বলেন—"আমার বিজ্ঞান-সাধনার ইতিহাস থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, সমকালীন অনভিজ্ঞতার বাধা অতিক্রম করে কোন নতুন মতবাদের স্বীকৃতিলাভ কতখানি ধৈর্য ও আয়াসসাধ্য! বিরোধ-সংঘাতের মধ্যে বা তার প্রাচীন ঐতিহ্যগত কোন বিকল্প পথে, যে ভাবেই ভারতবর্ষ মুক্তিলাভ করুক না কেন, তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনও সংশয় থাকতে পারে না। কারণ ভারতীয় সংস্কৃতিতে এমন কিছু সুপ্ত শক্তি আছে, যার জন্যে তা কালের আবর্তে বা পৃথিবীর বুকে বিনাশী পরিবর্তনের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। ভারতীয় সংস্কৃতি নীল-উপত্যকা, অ্যাসিরিয়া ও ব্যাবিলনের সভ্যতার উত্থান, পতন ও পূর্ণবিলুপ্তি দেখেছে এবং অতীতের মত আজও সে ধ্রুববিশ্বাস নিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পানে তাকিয়ে আছে।"

### সপ্তম বৈজ্ঞানিক মিশন

ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল কো-অপারেশন কমিটির সদস্য হিসেবে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্র ইউরোপ যাত্রার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু

সময়ের অভাবে তিনি এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন নি। আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি যে কমিটির অধিবেশনে যোগ দিতে পারেন নি, সে জন্যে তৎকালীন সভাপতি অধ্যাপক গিল্‌বার্ট মারে ও সম্পাদকের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে চিঠি দেন। জগদীশচন্দ্র ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল্‌ কো-অপারেশন কমিটির অধিবেশনে যোগ দিতে আসবেন, এই প্রত্যাশায় ইউরোপের অনেক প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে আমন্ত্রণ করেছিলেন, তাঁর নতুন গবেষণার বিষয় শোনবার আগ্রহ প্রকাশ করে। সুতরাং পরবর্তী বছরে এপ্রিল মাসে জগদীশচন্দ্র কমিটির অধিবেশনে যোগ দেবার অভিপ্রায়ে যখন ইউরোপ যাত্রা করেন, তাকে প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক মিশনই বলা চলে।

জগদীশচন্দ্র লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়, সোসাইটি অব আর্টস্‌ ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীষ্মকালীন অধিবেশনে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দেন। তিনি রয়্যাল সোসাইটি অব মেডিসিন-এ বক্তৃতা দিতে আহূত হন। অক্সফোর্ডে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনে প্রদত্ত বক্তৃতা ইউরোপ ও আমেরিকার সংবাদপত্রগুলিতে সর্বাধিক প্রচার লাভ করে। নিউইয়র্ক টাইম্‌স্‌, লণ্ডন স্পেক্টেটর, ম্যান্‌চেষ্টার গার্ডিয়ান, নেচার, মর্নিং পোস্ট প্রভৃতি পত্রিকায় সেদিন প্রাণী, উদ্ভিদ ও জড়ের বিচিত্র জীবনের প্রতি জগদীশচন্দ্রের সমদৃষ্টি সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত আলোচনা হয়। 'স্পেক্টেটর' পত্রিকা লিখেছিলেন—"সমকালীন চিন্তাধারার উপর অধ্যাপক বসুর প্রভাব অপরিমেয়। প্রাচ্যের এক মানুষ আজ নতুন করে সেই পুরাতন অতীন্দ্রিয় সম্ভাবনার কথায় আমাদের মনকে আলোড়িত করে দিয়ে গেল—যে জগৎ অদৃশ্য, নীরব, তাকেও আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত করা যায় এবং তার ভাষাকেও শ্রুতিগোচর করা যায়। আত্মবোধ সীমার অন্তরালে এখনও অনেক অনুপলব্ধ শক্তি রয়েছে, মানুষের মনকে তার সন্ধান করতে হবে।"

**ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্ট্যান্‌লি বল্‌ডুইনের সঙ্গে আলোচনা**

পূর্ববর্তী মিশনে ভারতসচিব লর্ড অলিভিয়ার কর্তৃক আয়োজিত ইণ্ডিয়া অফিসের বক্তৃতা-সভায় তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্‌ড্‌ উপস্থিত ছিলেন। সেখানে জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর সশ্রদ্ধ গুণগ্রাহিতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। বর্তমান মিশনে বল্‌ডুইনের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের দীর্ঘ অন্তরঙ্গ আলোচনা হয়। বল্‌ডুইন বলেন—"ভারতবর্ষের মানসিক উন্নয়নের অভিব্যক্তিতে ব্রিটিশ জনগণ গর্ব বোধ করছে। তারা চায় ইংল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে যে সম্পর্ক, তা উভয়ের সম্মান ও সমৃদ্ধিতে সার্থক হোক। সম্প্রতি লর্ড আরউইন ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হয়েছেন। জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসেবে ভারতের ঐতিহ্যকে মনেপ্রাণে উপলব্ধি করে তিনি সে দেশের কল্যাণ সাধনের যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।" আলোচনা প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্র প্রধানমন্ত্রীকে বলেছিলেন—"অপরিমিত প্রাকৃতিক সম্পদ ও সুদক্ষ তরুণ সম্প্রদায় থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক দুর্গতি শোচনীয়। এই দেশের সমৃদ্ধি সাধনের জন্যে শাসকগোষ্ঠীর এমন একটি পরিকল্পনা তৈরী করা উচিত, যাতে তরুণ ভারতবাসী ব্যাপকতর কর্মক্ষেত্রের সন্ধান পায়।"

জগদীশচন্দ্রের সম্মানার্থে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন এক ভোজসভার আয়োজন করেন। এই সময় ইংল্যাণ্ডের খ্যাতনামা বিজ্ঞানিবৃন্দ, মন্ত্রিসভার সদস্য ও সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ মিলিতভাবে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের গবেষণা সম্প্রসারিত করবার জন্যে ভারত সরকার যাতে অকৃপণভাবে সাহায্য করেন, সেই মর্মে ভারতের বড়লাটের কাছে এক স্মারক-লিপি পেশ করেন। এই স্মারক-লিপিতে স্বাক্ষর করেন—সার চার্লস্‌ শেরিংটন (রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি), অধ্যাপক স্টারলিং, সার জেম্‌স্‌ ফ্রেজার, লর্ড র‍্যালে, সার অলিভার লজ্‌, লর্ড ডসন্‌, সার সেণ্ট ক্লেয়ার টম্‌সন (রয়্যাল সোসাইটি অব মেডিসিনের সভাপতি), অধ্যাপক ডনান, অধ্যাপক কোহেন, সার

আর্থার শিপ্‌লি, সার হামফ্রি রোসেস্টার ( রয়্যাল সোসাইটি অব ফিজিসিয়ান্‌স্‌-এর সভাপতি ), জুলিয়ান হাক্‌স্‌লি ( কিংস্‌ কলেজের প্রাণী-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ), সার আর্., এ. গ্রেগরি ( 'নেচার' পত্রিকার সম্পাদক ), লর্ড বার্নহাম ( সম্পাদক, ডেইলি টেলিগ্রাফ ), এইচ. এ. গাইনে ( সম্পাদক, ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান ), জে. এ. স্পেন্‌ডার ( সম্পাদক, ওয়েস্ট মিন্‌স্টার গেজেট ) এবং আরও অনেকে।

প্যারিসের সরবোঁ ও ন্যাচার্যাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামে জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা, বিশিষ্ট শারীরবিজ্ঞানী ও মেডিক্যাল ফ্যাকাল্‌টির সদস্যগণের প্রভূত প্রশংসা লাভ করে। দার্শনিক বের্গসঁ বলেন—"মূক উদ্ভিদ আজ তার অব্যক্ত জীবন-কাহিনী বলতে উন্মুখ। প্রকৃতি অবশেষে তার দীর্ঘদিনের সযত্ন রক্ষিত রহস্য প্রকাশ করেছে। ডারউইনের 'ন্যাচার্যাল সিলেক্‌সন' তত্ত্বে ( Theory of Natural Selection ) সংঘর্ষই মূলকথা ; কিন্তু প্রকৃতিতে ও জীবনের নিরবচ্ছিন্ন ধারায় যে একটা সঙ্গতি-সৌন্দর্য প্রচ্ছন্ন রয়েছে, জগদীশচন্দ্রের গবেষণা তারই উপর আলোকপাত করেছে।"

## বেলজিয়ামে রাজকীয় সম্মাননা

ব্রুসেল্‌সে জগদীশচন্দ্র যে রাজকীয় সম্মান লাভ করেন, বর্তমান বৈজ্ঞানিক মিশনে তা অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বেলজিয়ামের রাজদম্পতি তাঁদের কলকাতা-ভ্রমণ উপলক্ষে বসু-বিজ্ঞান-মন্দির পরিদর্শন করেন। সেই সময় এখানকার গবেষণায় মুগ্ধ হয়ে তাঁরা জগদীশচন্দ্রকে ব্রুসেল্‌স্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে (Foundation Universitaire) বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ করেছিলেন। রাজা লিওপোল্ডের আদেশে জগদীশচন্দ্র কর্তৃক পরীক্ষা প্রদর্শনের জন্যে প্রাসাদ-উদ্যানে বিশেষ যত্নের সঙ্গে বিভিন্ন উদ্ভিদ রোপিত ও পরিবর্ধিত করা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায় রাজা লিওপোল্ড সভাপতিত্ব করেন।

জগদীশচন্দ্রের সম্মানার্থে এক বিশেষ ভোজসভার আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলনে তিনি মন্ত্রী-পরিষদের সদস্যগণ, সম্মানিত রাজঅতিথিবর্গ এবং বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ লাভ করেন। জগদীশচন্দ্রকে তাঁর বৈজ্ঞানিক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ রাজকীয় উপাধি 'Order de Leopold' দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

### ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল কো-অপারেশন কমিটির অধিবেশন

২৬শে জুলাই (১৯২৬) জগদীশচন্দ্র ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল কো-অপারেশন কমিটির অধিবেশনে যোগদান করেন। সদস্য নির্বাচিত হবার পর কমিটির অধিবেশনে এই তাঁর প্রথম উপস্থিতি। সম্পাদক তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে নবনির্বাচিত সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে বলেন—"আজ আমরা জগদীশচন্দ্রের মধ্যে প্রাচ্য-সভ্যতার এক মহান প্রতিনিধিকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। সে সভ্যতাকে আমরা সাংস্কৃতিক সহযোগিতার অঙ্গীভূত করতে চাই।" পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ভাবধারার স্বচ্ছন্দ বিনিময় ও সাংস্কৃতিক বিকাশের পথ সহজ করা, এই ছিল কমিটির মুখ্য উদ্দেশ্য। সে বহুধা বিভক্ত কর্মধারার অন্যতম বিজ্ঞান ও গ্রন্থপঞ্জী সঙ্কলন বিভাগে জগদীশচন্দ্রকে সদস্য নির্বাচিত করা হয়।

ইন্‌টারন্যাশন্যাল ইন্‌স্টিটিউট অব ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল কো-অপারেশন লীগ অব নেশন্‌স্-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অপর একটি সংস্থা। তার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ফরাসী ইতিহাসবেত্তা মঁসিয়ে লুশেইর জগদীশচন্দ্রের সম্বর্ধনার জন্যে এক বিশেষ সভার আয়োজন করেন। জগদীশচন্দ্রকে স্বাগত জ্ঞাপন প্রসঙ্গে তিনি বলেন—"অধ্যাপক বসুর গবেষণায় জীবনের ঐক্য-সন্ধান আমাদিগকে মুগ্ধ করেছে। এ-থেকে উপলব্ধি করতে পারি, সাংস্কৃতিক জীবনের মধ্যেও একটা ঐক্য আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের অধিবাসীদের মনোজগতে কোনও সীমারেখা

বা বিচ্ছেদ নেই। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন-সূত্ররূপে আজ আমাদের মধ্যে ভারতবর্ষের এই বিজ্ঞান-তপস্বী উপস্থিত। ভারতবর্ষকে এতদিন স্বপ্নবিলাসের দেশ বলে মনে করতাম। আজ বুঝতে পারছি, অন্তর্মুখী দর্শন, প্রতীচ্যের সৃজনী প্রতিভার সঙ্গে সমন্বিত হয়ে সে বিজ্ঞানের এক অনাবিষ্কৃত বিস্তীর্ণ জগতে অভিযান সুরু করেছে। সে অভিযানের পুরোধা একজন ভারতীয়। যে এশিয়ায় একদিন মানবসভ্যতার প্রোজ্জ্বল অভ্যুদয় ঘটেছিল, সাংস্কৃতিক সহযোগ পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে আজ আমরা সেই এশিয়ার সমৃদ্ধ ভাবজগতে উত্তীর্ণ হবো।"

**জেনিভা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা**

ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল কো-অপারেশন কমিটির অধিবেশন শেষ হবার পর জেনিভা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে জগদীশচন্দ্র সেখানে এক বক্তৃতা দেন। সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশস্ত বক্তৃতা-কক্ষে সম্মিলিত শীর্ষস্থানীয় বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক আইনস্টাইন ও অধ্যাপক লোরেন্‌ৎস্। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর অধ্যাপক র‍্যাপার্ড স্বাগত ভাষণে বলেন—"অর্থনীতিবিদ্ হিসেবে সার জগদীশের বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করবার দুঃসাহস আমার নেই। শুধু বলতে পারি, প্রাচ্যের এই মনস্বী প্রতীচ্যের বিজ্ঞান-কর্মীদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার যে আগ্রহ দেখিয়েছেন, তাতে সত্যসন্ধানী মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক একাত্মবোধেরই প্রকাশ হয়েছে।" অধ্যাপক আইনস্টাইন বলেন—"জগদীশচন্দ্র পৃথিবীকে যে সব অমূল্য তত্ত্ব উপহার দিয়েছেন, তার যে কোনটির জন্যে বিজয়-স্তম্ভ' স্থাপন করা উচিত।" অধ্যাপক লোরেন্‌ৎস্ বলেন—"পদার্থ, উদ্ভিদ ও শারীরবিজ্ঞানীর অতি দুর্লভ সমন্বয় হয়েছে জগদীশচন্দ্রের মধ্যে। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার এক মহান প্রতিনিধিরূপে তিনি সর্বত্র অভিনন্দিত।"

জগদীশচন্দ্রের জেনিভা পরিদর্শনের ফলে এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সহযোগ আরও ঘনিষ্ঠ হবে এবং বিজ্ঞানের অনুশীলনে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পরস্পরের নিকট সান্নিধ্যে আসবে—এই আশা প্রকাশ করে অধ্যাপক র‍্যাপার্ড ভারতসচিবের কাছে পত্র লেখেন।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে জগদীশচন্দ্র ইউরোপে আর একটি সার্থক বৈজ্ঞানিক মিশন সমাপ্ত করে ভারতে ফিরে আসেন।

## ত্রয়োদশ অধ্যায়

### ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশন

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে লাহোরে ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। জগদীশচন্দ্র এই অধিবেশনের মূল সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। পাঞ্জাবের গভর্ণর সার ম্যাল্‌কম হেইলি এই বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানীকে রাজভবনে আতিথ্য গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। জগদীশচন্দ্র পাঞ্জাবে যথাযোগ্য সম্বর্ধনা লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশনের উদ্‌বোধন করেন সার ম্যাল্‌কম হেইলি। নাতিদীর্ঘ ভাষণে তিনি ইংল্যাণ্ডের একটি পত্রিকা থেকে উদ্‌ধৃতি দিয়ে বলেন—"ধ্যানপ্রবণ আত্মদর্শী প্রাচ্যের মানুষ হয়েও জগদীশচন্দ্র আধুনিক জড় ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানে অনন্যসাধারণ মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। বিজ্ঞান-সাধনায় তিনি যে বিশ্বজনের অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করেছেন, তার চেয়েও অনেক বেশী উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, কৃতী উত্তরসাধক সৃষ্টির জন্যে তাঁর আন্তরিক প্রয়াস। শিষ্যগোষ্ঠীর অক্লান্ত চেষ্টায় শুধু যে বিজ্ঞান-জগৎ সমৃদ্ধ হবে তাই নয়, আধুনিক জগতের সভ্যতায় ভারতের স্থান অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন হবে।" এরপর তিনি জগদীশচন্দ্রকে মূল সভাপতি হিসেবে উদ্বোধনী ভাষণ দিতে আহ্বান করেন।

সভাপতির ভাষণ প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্র বলেন—"খুবই স্বাভাবিক, শতাব্দীর এক-তৃতীয়াংশ ধরে আমি যে তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত রয়েছি, তার ধারাবাহিক পরিচয় আজ এই অধিবেশনে তুলে ধরবো। দীর্ঘায়িত অন্বেষণের ফলে সকল জীবনের মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য ঐক্যের সন্ধান লাভ সম্ভব হয়েছে। তারই অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে বলা যায়, বিভিন্ন মানুষের কর্মপ্রয়াসের মধ্যেও একটা ঐক্য নিহিত আছে। মানুষের মনোজগতে কোনও সীমা বা বিচ্ছেদ-রেখা নেই। জীব-জগতের

বিবর্তনের ইতিহাস শুধু নিয়ত সংঘর্ষের মধ্যে আত্মরক্ষার প্রয়াস—প্রাকৃতিক নিয়মের এই ব্যাখ্যা ভ্রান্ত, জীবনের অভিব্যক্তিতে পারস্পরিক নির্ভরতা ও সহযোগের প্রভাব কম নয়! জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রগতি বিশেষ একটা জাতির একক কৃতিত্ব, এই ধারণার মত অসত্য আর কিছুই নেই। যুগ-যুগান্তর ধরে একটা নিরবচ্ছিন্ন চিন্তাধারা সামগ্রিকভাবে মানুষের ঐতিহ্যকে মহিমান্বিত করে তুলেছে। পারস্পরিক নির্ভরতার উপলব্ধিই মানুষের সঙ্গে মানুষের গ্রন্থিবন্ধন অটুট রেখেছে, অকাল অবক্ষয় থেকে রক্ষা করেছে আমাদের সভ্যতাকে। একদিন এই প্রদেশের তক্ষশীলায় গ্রীক ও প্রাচ্যের আর্যগণের মধ্যে সংস্কৃতির বিনিময় হয়েছিল। আজ বহু শতাব্দী পরে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আবার মিলিত হয়েছে। এই সান্নিধ্যের উদ্দীপনায় উভয়ে উভয়কে কতটা পূর্ণতার পথে নিয়ে যেতে পারে, তাথেকেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার প্রকৃত মহত্ত্বের পরীক্ষা হবে।”

জগদীশচন্দ্র বিশেষ আমন্ত্রণে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতা দেন। বিষয় ছিল “প্রাণী ও উদ্ভিদের নাড়ীর স্পন্দনের উপর উপক্ষার ও সর্পবিষের প্রভাব”। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন সার ম্যাল্‌কম হেইলি। বক্তৃতার উপসংহারে জগদীশচন্দ্র বলেন—“পাঞ্জাব ও বাংলা, ভারতবর্ষের দূরপ্রান্তস্থিত এই দুই প্রদেশের মধ্যে বহু প্রাচীন স্মৃতিবন্ধন রয়েছে। একদিন তক্ষশীলায় বহু জ্ঞানান্বেষী বাঙ্গালীর সমাবেশ হয়েছিল। আজ পঁচিশ শতাব্দী পরে তার পুনরাবৃত্তি।

## ইউরোপে অষ্টম বৈজ্ঞানিক মিশন

ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল কো-অপারেশন কমিটির বাৎসরিক অধিবেশনে যোগ দেবার জন্যে জগদীশচন্দ্র পুনরায় ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইউরোপ যাত্রা করেন। ৬ই মে তিনি মার্শেল্‌স্-এ পৌছেন। ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চলের Montpellier, Bordeux প্রভৃতি কয়েকটি বিশ্ব-

বিদ্যালয়ে তিনি বক্তৃতা দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ নাগরিকদের কাছে তিনি সাদর অভ্যর্থনা লাভ করেন। বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক রোমাঁ রোঁলার আমন্ত্রণে বসু-দম্পতি প্যারিসে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেন। এর কিছুদিন পরে রোঁমা রোঁলা জগদীশচন্দ্রকে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Jean Christopher' উপহার দিয়ে প্রীতি ও অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

ফ্রান্স থেকে জগদীশচন্দ্র আসেন ইংল্যাণ্ডে। তাঁর সদ্যপ্রকাশিত গ্রন্থ 'Plant Autographs and their Revelations' যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে 'ডেইলি এক্স্প্রেস' পত্রিকায় জগদীশচন্দ্রকে বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনে নিউটন ও গ্যালিলিওর সঙ্গে তুলনা করা হয়। 'ডেইলি নিউজ' পত্রিকায় প্রখ্যাত সমালোচক রবার্ট লিন্ড্ ও 'স্পেক্টেটরে' অ্যালডুস্ হাক্স্লি এই গ্রন্থের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন। 'স্যাটার-ডে রিভিয়ু'-তে এই গ্রন্থকে বর্তমান শতাব্দীর অন্যতম উল্লেখযোগ্য রচনা বলে অভিনন্দিত করা হয়। জুন মাসে জগদীশচন্দ্র ইন্টারন্যাশন্যাল হোমিওপ্যাথিক কংগ্রেস উপলক্ষে লণ্ডনে কিংস্‌সয় হলে 'Mechanism of Life' শীর্ষক এক বক্তৃতা দেন। এই সময় বার্নার্ড-শ তাঁকে একপ্রস্থ বই উপহার দেন। তাতে লেখা ছিল 'From the least to the greatest of living biologists. G. Bernard shaw to Sir Jagadish Bose.'

অল্প কিছুদিন পরেই জগদীশচন্দ্র ইংল্যাণ্ড থেকে জেনিভা যাত্রা করেন। জুলাই মাসের মধ্যে ইন্টেলেক্চুয়াল কো-অপারেশন কমিটির অধিবেশন পর্ব শেষ হয়। জেনিভা যাওয়ার পথে জগদীশচন্দ্র লোকার্নোতে 'ইন্টারন্যাশন্যাল কনফারেন্স অন এডুকেশন'-এ বক্তৃতা দেন। ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্যে তিনি কিছুদিন

জেনিভা হ্রদের তীরে তেরিতেতে ( Territet ) বিশ্রাম গ্রহণ করেন। কাজের চাপে জগদীশচন্দ্রকে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনের সঙ্কল্প ত্যাগ করতে হয় এবং তিনি ভারতবর্ষে ফিরে আসেন।

### হিন্দু-ভেষজশাস্ত্রের প্রতি আগ্রহ

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা-পদ্ধতিতে সূচিকাভরণ নামে সর্পবিষঘটিত একপ্রকার ঔষধের উল্লেখ আছে। প্রায় সহস্র বৎসর যাবৎ হৃদ্‌যন্ত্রের উত্তেজক হিসেবে এর ব্যবহার হয়ে আসছে। জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদ-স্পন্দনের উপর সূচিকাভরণের অনুরূপ ক্রিয়া লক্ষ্য করেন। এরূপ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে হিন্দু-ভেষজশাস্ত্রের প্রতি তাঁর মনে আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হয়। ইউরোপ থেকে প্রত্যাবর্তনের অল্প কিছুদিন পরে জগদীশচন্দ্র মাদ্রাজ[১] ও মহীশূর[২] বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর আবিষ্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার জন্যে আহূত হন। তখন হিন্দু-ভেষজ-বিজ্ঞানে গবেষণামূলক নিবন্ধ রচনার জন্যে তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পুরস্কারের প্রবর্তন করেন। এই সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতা পরিচালনের উদ্দেশ্যে যে কমিটি গঠিত হয়, জগদীশচন্দ্রের অকৃত্রিম বন্ধু মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ছিলেন তার অন্যতম সদস্য। দুর্লভ পাণ্ডিত্যের অধিকারী আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনুরূপ সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গী জগদীশচন্দ্রেরও বৈশিষ্ট্য। ভাবজগতের এই সাধর্ম্যই দর্শন ও বিজ্ঞানের এই দুই ঋষিকল্প পুরুষকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"জগদীশচন্দ্র যেন মায়াদণ্ড স্পর্শে বহুযুগের সুপ্তি-জড়িমা থেকে

---

১। বক্তৃতার বিষয় "Invisible Light" এবং "Surge of Life"

২। সমাবর্তন উৎসব ( ৩রা নভেম্বর, ১৯২৭ )

ভারতবর্ষকে মুক্তি দিয়েছেন। তিনি যে বিজ্ঞানের অনুশীলন করেছেন তা পাশ্চাত্ত্যের বস্তুসর্বস্ব বিজ্ঞান নয়, এর মধ্যে ভারতবর্ষের অন্তর্দৃষ্টি ও ঐক্যসাধনের সনাতনী কল্পনার সার্থকতম প্রকাশ হয়েছে।"

উদ্ভিদ-জীবন সম্পর্কে দীর্ঘ ধারাবাহিক অনুসন্ধানে সম্প্রতি যে সব চমকপ্রদ ফলাফল লক্ষ্য করা গিয়েছে, বিজ্ঞান-মন্দিরের বাৎসরিক অনুষ্ঠান সভায় ( ৩০শে নভেম্বর, ১৯২৭ ) তিনি সেগুলি প্রকাশ করেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে জড় ও উদ্ভিদের চেতনা সম্পর্কে প্রথম ঘোষণার পর থেকে বিভিন্ন-মুখী গবেষণার মধ্যে এক নবসৃষ্ট বিজ্ঞান কি ভাবে পূর্ণতার পথে এগিয়ে চলেছে, এই ভাষণে তার আনুপূর্বিক ইতিহাস বিবৃত করা হয়।

৬ই ডিসেম্বর ( ১৯২৭ ) কলকাতায় 'Congress of the Far Eastern Association of Tropical Medicine'-এর সপ্তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনের প্রতিনিধিদের কাছে জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞান-মন্দিরে পরীক্ষা সহযোগে এক ভাষণ দেন।

### গবেষণা-গ্রন্থ সম্পর্কে অভিমত

এই সময়ে লংম্যান্স্ কোম্পানি কর্তৃক জগদীশচন্দ্রের নবতম বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ 'Motor Mechanism of Plant' ( ১৯২৮ ) প্রকাশিত হয়। ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন পত্রিকায় এই গ্রন্থের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়। 'লণ্ডন ডেইলি নিউজ' পত্রিকায় রবার্ট লিন্ড্ ইতিপূর্বে প্রকাশিত জগদীশচন্দ্রের অন্যান্য গ্রন্থের সমালোচনা করেছেন। বর্তমান গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে যা লিখেছিলেন, তার অংশবিশেষ উদ্ধৃতিযোগ্য।

"মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন বিজ্ঞানী তাঁদের আবিষ্ক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের কল্পনাকে উজ্জীবিত করেছেন, সার জগদীশচন্দ্র বসু তাঁদের

অন্যতম। তিনি উদ্ভিদ-জগতে প্রাণীর জীবনলীলার এক অবিকল প্রতিরূপের সন্ধান দিয়েছেন এবং বিশ্বের যাবতীয় প্রাণময় বস্তুর মধ্যে যে ঐক্য প্রচ্ছন্ন রয়েছে, তাকে আমাদের বোধগম্য করিয়েছেন। একজন অবৈজ্ঞানিকের পক্ষে তাঁর আবিষ্কার মূল্যায়নের চেষ্টা নিরর্থক। কিন্তু এটুকু নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, সাধারণ মানুষ আজ এমন এক বিস্ময়ের জগতে উপনীত হয়েছে, যেখানে বিজ্ঞান ও কাব্যের তুলভ মিলন ঘটেছে।

"বিশ বছর আগে জগদীশচন্দ্রের গবেষণা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা একেবারে সংশয়মুক্ত ছিলেন না। তাঁর কোন আবিষ্কারই শুধুমাত্র কল্পনা-নির্ভর নয়। তিনি সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে তাঁর মতবাদের সমর্থনে যে সব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন, তার পরে কারও মনে সন্দেহের অবকাশ আছে বলে জানি না। বিদ্যুৎ, আলোক, তাপ, মাদকদ্রব্য প্রভৃতি বাইরের উত্তেজনায় উদ্ভিদ-দেহে যে বিচিত্র অনুভূতি জাগে, এই গ্রন্থে সে সম্পর্কে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তথ্যের প্রাঞ্জল সঙ্কলন করা হয়েছে। প্রাণের উচ্ছলতা, ক্লান্তি ও নিদ্রার আবেশ এবং মৃত্যুর আক্ষেপ—সব কিছু মিলিয়ে উদ্ভিদ-জীবনের পূর্ণাঙ্গ কাহিনী আমাদের দৃষ্টির সামনে মূর্ত হয়ে ওঠে।"

## ইউরোপ যাত্রা ঃ নবম বৈজ্ঞানিক মিশন

ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল কো-অপারেশন কমিটির বাৎসরিক অধিবেশনে তৃতীয়বার যোগ দেবার জন্যে জগদীশচন্দ্র ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ইউরোপ যাত্রা করেন। আমরা দেখেছি, পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক-সমাজে জগদীশচন্দ্রের গবেষণার স্বীকৃতি ও বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রসারণের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে নব্যবিজ্ঞানের চর্চাকে স্থায়ী করবার দিক থেকে পূর্ববর্তী প্রতিটি মিশন কতখানি সার্থক হয়েছে। স্বভাবতঃই তিনি পশ্চিম মহাদেশে ভ্রমণের যে কোন রকম উপলক্ষের সাগ্রহ প্রতীক্ষায় থাকতেন। এবারকার মিশন নাতিদীর্ঘ হলেও কম সাফল্যপূর্ণ নয়।

**ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ অধ্যাপক মোলিশ**

বিশেষ আমন্ত্রণে ভিয়েনা ও মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন বর্তমান ভ্রমণের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর অধ্যাপক মোলিশের এক পত্রের উত্তরে জগদীশচন্দ্র যা লিখেছিলেন, তাতে হৃদ্যতার যে মাধুর্য ফুটে উঠেছে, মনকে তা স্পর্শ না করে পারে না।

"আপনার মত স্বল্পসংখ্যক কয়েকজনের মধ্যে যে প্রসারিত মন ও সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে, শুধু তাই দিয়েই বিজ্ঞানে বৃহৎ প্রগতি সম্ভব। আপনি ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর থাকাকালীন সেখানে বক্তৃতা দিতে পারলে খুবই আনন্দিত হবো। আমার সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল সম্পর্কে সাক্ষাতে আলোচনা হবে।" জগদীশচন্দ্র ও অধ্যাপক মোলিশ উভয়েই তখন বৃদ্ধ। দু'জনের মিলিতভাবে গবেষণা করবার পরিকল্পনা সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র তারুণ্যের উচ্ছ্বাস নিয়ে লিখছেন —"আপনি আমার যন্ত্রগুলির ক্রিয়া-কৌশল চাক্ষুষ দেখবার পর আমরা দু'জন এক সঙ্গে কিছু কিছু গবেষণা করতে পারবো। একাত্তর বছর একটা না জানি কি বয়স—এই কথা আপনি কখনই মনে আনবেন না। আমার নিজেরই বয়স আসছে বছর সত্তর হতে চলেছে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী অনেক বেশী ব্যাপক, তাই আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর বন্ধুত্ব কামনা করি। মানুষের পক্ষে কল্যাণকর কর্মপ্রয়াসে এবং মানুষে মানুষে মৈত্রীবন্ধনে আমি গভীর বিশ্বাসী। তবে আমাদের কর্মমুখর জীবনে হয়তো শীঘ্রই সমাপ্তি আসবে। তাই যা কিছু সম্ভব, তা আমি আগামী দু-বছরের মধ্যে শেষ করতে চাই। আমিও আপনার মত শ্রমসহিষ্ণু, সুতরাং কোন রকম দ্বিধাবোধ না করে আপনার সঙ্কল্পের কথা আমাকে খুলে বলবেন।"

ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণ-বিজ্ঞান সম্পর্কিত গবেষণার একটি বিশ্ববিশ্রুত কেন্দ্র। জগদীশচন্দ্র এখানে দুটি বক্তৃতা দেন (২০শে জুন,

১৯২৮)। সে বিদগ্ধ-সম্মেলনে অভিভাষকের পরিচয় দান প্রসঙ্গে অধ্যাপক মোলিশ বলেন—

"চৌদ্দ বছর আগে আমার গবেষণা প্রতিষ্ঠানে আপনার বক্তৃতা প্রথম শুনেছিলাম—সেদিন ভিয়েনার আরও অনেক প্রাণ-বিজ্ঞানী উপস্থিত ছিলেন। তারপর আপনার গবেষণাধারা বহুদিকে প্রসার লাভ করেছে। আপনার উদ্ভাবিত স্বতঃলিপিকার যন্ত্রে উদ্ভিদ্-জীবনের পূর্ণ রূপ ধরা পড়েছে। আপনাকে বিজ্ঞান-অ্যাকাডেমির সদস্য নির্বাচিত করে আপনার গবেষণা সম্বন্ধে ভিয়েনা তার মূল্যবোধের পরিচয় দিয়েছে।[১] এখানকার মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টি অনেক ভারতীয় উদ্ভিদের রোগনাশক গুণ সম্বন্ধে আপনার গবেষণাকে ভেষজ-বিজ্ঞানের দিক থেকে যথেষ্ট মূল্যবান মনে করে। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির যে ভাবধারা একদিন মানুষের চিন্তা-জগৎকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, তা আজও অক্ষুণ্ণ আছে এবং বর্তমান যুগে আমাদের মানসিক উন্নয়নে ভারতবর্ষের অবদান তার মহান ঐতিহ্যের পক্ষে একান্ত শোভন ও সঙ্গত।"

জগদীশচন্দ্রের গবেষণার অনন্যসাধারণ মৌলিকতা এবং কৃষি ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানে তার সার্থক প্রয়োগের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে অধ্যাপক মোলিশ ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ভারতের গভর্ণর জেনারেলকে এক অভিনন্দন-পত্র প্রেরণ করেন। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার পর অধ্যাপক মোলিশের মনে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে গবেষণা করবার আগ্রহ আরও গভীর হয়। সে ঐকান্তিক ইচ্ছা প্রকাশ করে তিনি জগদীশচন্দ্রকে পত্র লেখেন। জগদীশচন্দ্র সানন্দে এই অকৃত্রিম বিজ্ঞানী-সুহৃদকে স্বীয় গবেষণা-মন্দিরে আহ্বান করেন।

---

১। সাম্প্রতিক সফরে জগদীশচন্দ্র ভিয়েনা অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের সদস্য মনোনীত হন।

**মিউনিকে সম্বর্ধনা**

ভিয়েনা থেকে জগদীশচন্দ্র আসেন মিউনিকে। এখানেও তিনি সাদর সম্বর্ধনা লাভ করেন। তাঁর সম্মানার্থে বিজ্ঞান-ফ্যাকাল্‌টি কর্তৃক এক বিশেষ প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়। ডক্টর গোয়েবল উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ও মিউনিকের বিখ্যাত বটানিক্যাল গার্ডেনের ডিরেক্টর। তিনি অতিথিদের সাদর সম্বর্ধনা জানিয়ে বলেন —"বিজ্ঞান-ফ্যাকাল্‌টির প্রবীণতম সদস্য এবং বর্তমানে একমাত্র উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী হিসেবে আমাকেই ডীন সম্মানিত অতিথিদের স্বাগত সম্ভাষণ জানাবার নির্দেশ দিয়েছেন। অধ্যাপক বসু তাঁর জ্ঞানগর্ভ রচনাবলীর মাধ্যমে আমাদের নিকট সুপরিচিত। গবেষণার মধ্যে একান্তভাবে তন্ময় সেই বিজ্ঞানকর্মীর ব্যক্তিগত সান্নিধ্য লাভে আজ আমরা কৃতার্থ। তিনি ভারতবর্ষের যোগ্যতম প্রতিনিধি। ধর্ম, দর্শন, কাব্য ও শিল্পে ভারতবর্ষের অপরিমেয় অবদানের কথা আমরা জানি। আজ প্রাণ-বিজ্ঞানে ভারতীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে আমি যখন প্রাচ্য মহাদেশে যাই, তখন ভারতবর্ষ ও বিশেষ করে কলকাতার বসু-বিজ্ঞান-মন্দির পরিদর্শনের একটা আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে তখন জার্মান শক্তিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত লোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। ডক্টর বসু তাঁর বিজ্ঞান-মন্দিরে আজ জার্মান প্রকৃতি-বিজ্ঞানীদের আন্তরিক আহ্বান জানাচ্ছেন। তাঁর মত আমরাও বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক দায়িত্বে বিশ্বাস করি। বর্তমানের স্বল্পালোকিত পৃথিবীতে বিজ্ঞানের প্রগতি ও মানুষের কল্যাণের জন্যে নির্বিরোধ কর্মপ্রয়াসের একান্ত প্রয়োজন।"

'নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্ত মিউনিকের প্রখ্যাত জৈবরসায়ন-বিজ্ঞানী অধ্যাপক উইল্‌স্ট্যাটার কর্তৃক জগদীশচন্দ্রকে লিখিত একখানি সাময়িক পত্র—

"মিউনিকে আপনার সাম্প্রতিক উপস্থিতি আমার কাছে নানা

কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগত সংস্পর্শের সুযোগ না পেলেও শুধুমাত্র আপনার মৌলিক গবেষণার সঙ্গে পরিচয় আমাকে নিঃসন্দেহে প্রভাবান্বিত করতো। একক ব্যক্তিত্বে এতখানি ভাবাদর্শ এবং মানুষের কল্যাণ ও বিজ্ঞানের প্রগতির প্রতি গভীর অনুরাগ ও নিষ্ঠার এমন সমাবেশ আমি কখনও দেখি নি। সে দুর্লভ সমাবেশের ফলে যে মহান কর্মী-পুরুষের আবির্ভাব হয়েছে, তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ে আমি আনন্দিত। পরিশেষে, লেডী বসু ও আপনি বিজ্ঞান-মন্দিরে গবেষণা করবার জন্যে আমাকে মিলিতভাবে যে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, তার জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ।"

**মিশরীয় সরকারের আমন্ত্রণ**

মিউনিক থেকে জগদীশচন্দ্র ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল কো-অপারেশন কমিটির অধিবেশনে যোগদানের জন্যে জেনিভায় যান। জুলাই মাসে সেখানকার কর্মসূচী শেষ হয়। জগদীশচন্দ্র 'জেনিভা স্কুল অব ইন্‌টার-ন্যাশন্যাল স্টাডিজ'-এ এক বক্তৃতা দেন—বিষয় ছিল "The plant as a sentient Being"। এবার স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পালা। এই সময় মিশরের কৃষি-মন্ত্রী ইউরোপে ছিলেন। তাঁরই উদ্‌যোগে মিশরীয় সরকার ব্রিটিশ কন্‌সালের মারফৎ জগদীশচন্দ্রকে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পথে মিশর পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানান। ১৩ই সেপ্টেম্বর আলেকজান্দ্রিয়ায় মন্‌তেজিয়া প্রাসাদে মিশরের রাজা ফুয়াদ জগদীশচন্দ্রকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেন। কায়রোর বিদগ্ধ জন-সম্মেলনে[১] জগদীশচন্দ্র ১৭ই সেপ্টেম্বর এক ভাষণ দেন। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কৃষি-মন্ত্রী নাখলা পাশা। জগদীশচন্দ্র বলেন—"নীল ও গঙ্গার উপত্যকায়, দুই সভ্যতার অভ্যুদয় মানুষের ইতিহাসে সবচেয়ে স্মরণীয় অধ্যায়। দুই-হাজার বছর আগে অশোক-যুগে ভারত ও মিশরের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ঘটেছিল।"

---

১। রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি অব ইজিপ্ট

সমবেত জনমণ্ডলীর উচ্ছ্বসিত অভিনন্দনের মধ্যে ভাষণ সমাপ্ত হয়। মিশরীয় সরকারের হৃদ্যতাপূর্ণ আতিথেয়তায় কয়েক দিন অতিবাহিত করবার পর জগদীশচন্দ্র স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করে' ২৮শে সেপ্টেম্বর বোম্বাইয়ে উপস্থিত হন।

**বিজ্ঞান-মন্দির সম্প্রসারণের জন্যে অর্থ-সংস্থানের চেষ্টা**

উদ্ভিদ-জীবন সম্পর্কিত গবেষণা তখন বিভিন্ন ধারায় পরিব্যাপ্ত। এদিকে বহির্ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেক বিজ্ঞান-কর্মী বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে এসে এখানকার গবেষণাধারার সঙ্গে পরিচয় লাভের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এই অবস্থায় বিজ্ঞান-মন্দিরের সর্বাঙ্গীণ সম্প্রসারণ একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সম্প্রতি যে বৈজ্ঞানিক মিশন শেষ হলো, তার প্রথম দিকের কথা। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস—জগদীশচন্দ্র সবে মাত্র ইংল্যাণ্ডে এসে পৌঁচেছেন। তিনি ভারতের হাই-কমিশনারের কাছে বার্ষিক সাড়ে সাত হাজার টাকা পেনশনের জন্যে আবেদন করেন। তিনি বলেন—"বিজ্ঞান-মন্দির সম্প্রসারণের জন্যে আমি উদ্বিগ্ন; সে পরিকল্পনাকে রূপায়িত করবার পক্ষে এই অর্থ অনেকটা সহায়ক হবে।

প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অবসর গ্রহণের পর গবেষণা-কার্যে ব্যস্ত থাকায় এই অবসর-বৃত্তির জন্যে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোনও পত্রালাপ করতে পারি নি। বিজ্ঞান-মন্দিরের কর্মধারার প্রতি সরকার যে রকম আগ্রহ ও সহানুভূতি দেখিয়েছেন তাতে আমি আশা করি, এই আবেদন বিলম্বিত হলেও অযৌক্তিক বা অপ্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হবে না।"

জগদীশচন্দ্র ইতিপূর্বে সরকারের কাছে অর্থ-সাহায্যের আবেদন করেছিলেন। তার কোনও আশানুরূপ প্রত্যুত্তর না পাওয়ায় তিনি এই প্রসঙ্গে একখানি স্মারকলিপি প্রেরণ করেন। স্মারকলিপির সঙ্গে 'লণ্ডন টাইম্‌স্', 'নেচার' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত সপ্রশংস মন্তব্যের আংশিক উদ্‌ধৃতি যোগ করে দেন।

ভিয়েনা ও মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর উচ্ছ্বসিত সম্বর্ধনা, একজন নোবেল-পুরস্কার-প্রাপ্ত বিজ্ঞানীসহ (সম্ভবতঃ মিউনিকের অধ্যাপক উইলস্ট্যাটার) আরও অনেকের বিজ্ঞান-মন্দিরে গবেষণা করবার আগ্রহ প্রকাশ ইত্যাদি কথা জানিয়ে জগদীশচন্দ্র ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড আরউইনকে এক পত্র লেখেন। এই পত্রে আরউইন-দম্পতিকে তাঁদের পরবর্তী শীতকালীন কলকাতা সফর উপলক্ষে বসু-বিজ্ঞান-মন্দির পরিদর্শনের সাদর আমন্ত্রণ জানানো হয়। পত্রোত্তরে লর্ড আরউইন ইউরোপীয় বিজ্ঞানী-সমাজে জগদীশচন্দ্রের সম্মাননায় আনন্দ প্রকাশ করেন। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর অধ্যাপক মোলিশের লেখা চিঠির কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

**স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরে**

মিশর থেকে কলকাতা প্রত্যাবর্তনের পথে জগদীশচন্দ্র কয়েক দিন বোম্বাই নগরীতে অতিবাহিত করেন। বিশেষ আমন্ত্রণে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশন হলে উদ্ভিদ-জীবন সম্পর্কে নবতম গবেষণার বিষয়ে বক্তৃতা দেন। সভাপতিত্ব করেন তৎকালীন উপাচার্য সার চিমনলাল শীতলবাদ। বিশ্ববিদ্যালয় সেনেটের সদস্য, ছাত্রমণ্ডলী ও জনসাধারণের সেই সম্মেলনে জগদীশচন্দ্র তাঁর ভাষণে বলেন—

"যখন কোন দেশ একান্তভাবে পরনির্ভর হয়ে পড়ে, তখন বিশ্ব-প্রগতির ক্ষেত্রে তার আর কোনও ভূমিকা থাকে না। তার পরাশ্রয়ী সভ্যতা ও সংস্কৃতি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। সে তিক্ত সত্য আমি বহু বছর আগে উপলব্ধি করেছি। তারই প্রত্যক্ষ ফল বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা। আমি আশা করি, সে মন্দির একদিন বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক কেন্দ্র হয়ে উঠবে। নালন্দা ও তক্ষশীলার জ্ঞান-কেন্দ্রে প্রাচীন ভারতবর্ষ পৃথিবীর দূর-দূরান্তের জ্ঞান-ভিক্ষুদের স্বাগত জানিয়েছিল। আমি সে ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করবার যে স্বপ্ন দেখেছিলাম, তা আজ সার্থক হয়েছে। প্রাচ্য ও

প্রতীচ্যের মধ্যে মৈত্রীবন্ধনে আমার একক প্রচেষ্টা যদি এতখানি সার্থক হতে পারে, তবে ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যে জনসাধারণ ও সরকারের সম্মিলিত প্রয়াসে কিছুই অসম্ভব নয়। এখন এশিয়ার পুনর্জাগৃতির অধ্যায় চলছে; সে অধ্যায়ে ভারতবর্ষের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলি যখন আত্মনির্ভরতা ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে, তখন ভারতবর্ষ কি অন্ধ হতাশায় নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে থাকবে? বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে দেশের অপরিমিত প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের মধ্যেই আমাদের উন্নতি ও মুক্তির সম্ভাবনা নিহিত।"

**ছাত্রসমাজের প্রতি জগদীশচন্দ্র**

বোম্বাই-এর ছাত্রসমাজ এক পৃথক অনুষ্ঠানে জগদীশচন্দ্রকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। একটি অলঙ্কৃত রৌপ্যাধারে তাঁকে অভিনন্দন-লিপি দেওয়া হয়। কন্‌ভোকেশন হলে অনুষ্ঠিত এই সম্বর্ধনা-সভাতেও সার চিমনলাল শীতলবাদ সভাপতিত্ব করেন। সম্বর্ধনার প্রতিভাষণে জগদীশচন্দ্র বলেন—

"ছাত্রদের মধ্যে আমি অনেক সময় ভীরুতা ও পলায়নী মনোবৃত্তি লক্ষ্য করেছি। অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়, সরকার বা অবস্থার প্রতিকূলতার উপর সব কিছু দোষ চাপিয়ে নিজের অসামর্থ্য ঢেকে রাখতে চায়। সেটা পৌরুষের লক্ষণ নয়। বাধা-বিঘ্নকে সাহসের সঙ্গে অতিক্রম করতে হবে, আশ্রয় করতে হবে ন্যায়কে, যাকে তোমরা পৃথিবীর সামনে অকপটে ঘোষণা করতে পার। শক্তির রূপান্তর আছে, সৃষ্টি বা বিনাশ নেই, তা পরিমিত। সুতরাং যদি শুধু কথার উচ্ছ্বাসে সব শক্তি অপব্যয়িত হয়, তবে কর্মের জন্যে তার কোনও অবশেষ থাকবে না। সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা বিসর্জন দিয়ে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে জাতীয় ঐক্যের প্রতি। আমরা ভারতবর্ষীয়, সেই আমাদের প্রথম ও শেষ পরিচয়। আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির মধ্যে যদি কোন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য থেকে থাকে, তবে তা পরমত-সহিষ্ণুতা,

সংগ্রামশীল মানুষের আত্মার সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক এমনি পবিত্র যে, তাকে রাজনৈতিক প্রচার কার্যের মধ্যে টেনে নেওয়া যায় না। শুধু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাই নয়, বিবেক-স্বাধীনতার জন্যেও আমাদের নিরলস চেষ্টা করতে হবে। উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা যে সভ্যতাকে লাভ করেছি, তা কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন। ভীরুতা বা নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে যেন তা বিলুপ্ত না হয়। যুগ থেকে যুগান্তরে প্রতিধ্বনিত হয়ে আজ আহ্বান এসেছে—যে আহ্বানে পুরুষ ও নারী রুগ্ন-ক্লিষ্ট মানুষের সেবার জন্যে বিরামহীন সংগ্রামের জীবন বরণ করে নেয়। তোমরা সে আহ্বানে নিশ্চয়ই সাড়া দেবে।"

অক্টোবর মাসের গোড়ার দিকে জগদীশচন্দ্র বোম্বাই থেকে কলকাতায় এসে পৌঁছেন। এর মাসখানেক পরেই ( ১৭ই নভেম্বর ) তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দেন [১] এবং উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি. এস-সি. উপাধি দিয়ে সম্মানিত করে।

---

১। "India as a Home of Learning"

## চতুর্দশ অধ্যায়

# সপ্ততিতম জয়ন্তী

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর জগদীশচন্দ্রের বয়স সত্তর পূর্ণ হয়। সে জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপনের পরিকল্পনায় প্রধান উদ্‌যোক্তা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

১লা ডিসেম্বর তারিখে বিজ্ঞান-মন্দিরে জগদীশচন্দ্রের সপ্ততিতম জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে বিশ্বভারতী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, রামমোহন লাইব্রেরী, বৃহত্তর ভারত পরিষদ, কলকাতা, ঢাকা, বোম্বাই, নাগপুর ও পুণা কার্ভে মহিলা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ জগদীশচন্দ্রকে অভিনন্দিত করেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, মহাত্মা গান্ধী, সার মহম্মদ হবিবুল্লা, নেপালের মহারাজা, মহীশূরের দেওয়ান, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের রাজ্যপাল ব্যক্তিগতভাবে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। পাশ্চাত্ত্যের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদগ্ধ প্রতিষ্ঠান, নেচার পত্রিকার সম্পাদক সার রিচার্ড গ্রেগরি, লণ্ডন ইম্‌পিরিয়্যাল কলেজ অব সায়েন্সের অধ্যাপক সার জন ফার্মার, বার্নার্ড-শ, রোমাঁ রোলাঁ, মিশরের কৃষিমন্ত্রী, চীন সরকারের শিক্ষামন্ত্রী প্রমুখ মনীষীদের কাছ থেকে অভিনন্দনপত্র আসে। চীনের নানকিং ন্যাশন্যাল রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট থেকে যে অভিনন্দনপত্র আসে, তার মর্মার্থ—"আপনি বিজ্ঞানকে আধ্যাত্মিক সত্তায় উন্নীত করুন, এই জন্য আপনার কাছে তারই প্রত্যাশী। সমগ্র এশিয়া আপনার গৌরবের অংশভাগী।"

আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও অসুস্থতার জন্যে রবীন্দ্রনাথ সে দিন জয়ন্তী উৎসবে যোগ দিতে পারেন নি। জগদীশচন্দ্রকে তিনি আগেকার

শিষ্যবৃন্দসহ জগদীশচন্দ্র (১লা ডিসেম্বর, ১৯২৮)

এক চিঠিতে এই অসুস্থতার আভাস দিয়েছিলেন।[১] জয়ন্তী উৎসবে যোগ দেবার অসামর্থ্য জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে লিখেছিলেন (১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫)—"আমার মনের কথা একটি কবিতায় লিখে পাঠিয়েছি, আশা করি তোমার হাতে পৌঁচেছে—তোমার সেদিনকার অভিনন্দন-সভায় এই আমার অর্ঘ্য। আমার অন্তরের কথা তুমি জানো—কিন্তু সকলকে জানিয়ে রেখে যেতে চাই। আমার সৌভাগ্য, তোমাকে বন্ধুরূপে পেয়েছি, সেই গৌরবের কথাটিকে স্থায়ী রূপ দিয়ে আমার ছন্দে প্রতিষ্ঠিত করেছি—ভাবীকালের চিত্তে তোমার স্মৃতির সঙ্গে আমার স্মৃতি জড়িত হয়ে থাকবে এই আমার আনন্দ। তোমার কর্মে তোমার সহযোগিতা করি এমন শক্তি আমার নেই, কিন্তু বন্ধুর প্রীতি সংসার পথের পাথেয়, অন্তর থেকে তাই তোমাকে নিবেদন করতে পেরেছি এই কথা মনে রেখো।"

ডক্টর কালিদাস নাগ উৎসব-প্রাঙ্গণে জগদীশচন্দ্রের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত রবীন্দ্রনাথের কবিতালিপি[২] পাঠ করেন।

বৃহত্তর ভারত পরিষদের পক্ষ থেকে অভিনন্দনলিপি পাঠ করেন আচার্য যদুনাথ সরকার—"আমাদের পরিষদ ভারতবর্ষের অতীত কৃতিত্ব ও কীর্তির চর্চা করে। তার গৌরব করবার অধিকার তখনই যৌক্তিক, যখন আপনার মত একজন প্রতিভাশালী ভারত সন্তান দেখান যে, ভারতবর্ষের প্রাচীন সত্যদ্রষ্টাদের ঐতিহ্য-ধারা একেবারে লুপ্ত হয় নি।" প্রাক্তন ছাত্রগণের পক্ষ থেকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানান রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

---

১। "চলা ফেরা আমার পক্ষে কঠিন হয়েছে—চুপ করে বসেই আমাকে কাজ চালাতে হয়।···তোমার ৭০ বছরের অভিনন্দন সভায় নিশ্চয়ই আমি যোগ দিতে যাব। তখন শীতের সময় শরীরে এখনকার চেয়ে বল পাব বলে বিশ্বাস করি।" (২৪শে অক্টোবর, ১৯২৮)

২। "বনবাণী" কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় কবিতা 'জগদীশচন্দ্র' ("যেদিন ধরণী ছিল ব্যথাহীন বাণীহীন মরু" ইত্যাদি); রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চদশ খণ্ড দ্রষ্টব্য।

রোমাঁ রোলাঁ যে ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ পত্র লিখেছিলেন, তার সার মর্ম উদ্‌ধৃতিযোগ্য—

"আপনার সপ্ততিতম জন্ম-জয়ন্তী উদ্‌যাপনের জন্যে যাঁরা সোৎসাহ উদ্‌যোগ করছেন, তাঁদের সঙ্গে আমি নিজেকে যুক্ত করতে চাই। আমার নিজের এবং ফরাসী দেশস্থিত আপনার সুহৃদবর্গের পক্ষ থেকে আপনাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

"আমার চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি আপনার বৈজ্ঞানিক প্রতিভা যথার্থ উপলব্ধি করবেন। আমি অভিনন্দন জানাই সেই সত্যদ্রষ্টা তপস্বীকে, যিনি তাঁর কবি-দৃষ্টি দিয়ে বৃক্ষ বল্কল ও পাষাণের অন্তরালে সংগোপিত প্রাণকণিকার সন্ধান পেয়েছেন। মৌন বৃক্ষ ও প্রস্তরের রহস্যের চাবিকাঠিটি আপনার হাতে। আপনিই শুনিয়েছেন তাদের মর্মকথা—সেই চিরন্তন প্রাণপ্রবাহ, যা মহৎ থেকে সামান্যতম সকল বস্তুর মধ্য দিয়ে বয়ে চলে; চিরন্তন জীবনের ছন্দে বেজে ওঠে কখনও আনন্দ কখনও বিষাদ। আমি আপনার মধ্যে দেখেছি এক অনাবিষ্কৃত মহাদেশের সফল অভিযাত্রীকে।

"হে যাদুকর, আমি আপনাকে নমস্কার জানাই। বিজ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠ ভাষা আমি জানি না, নিজেকে প্রকাশ করতে গিয়ে রূপকের আশ্রয় নিলাম—আমাকে ক্ষমা করবেন।"

ভিয়েনার প্রখ্যাত উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী অধ্যাপক মোলিশ তখন বিজ্ঞান-মন্দিরে সম্মানিত অতিথি হিসেবে অবস্থান করছিলেন। এই জয়ন্তী অনুষ্ঠানে তিনি অন্তরঙ্গ সুহৃদ জগদীশচন্দ্রকে অভিনন্দন জ্ঞাপনের শেষে বলেন—"পাশ্চাত্ত্যের প্রতিনিধিরূপে আমি আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমার সৌভাগ্য, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে মানসিক সহযোগিতার বন্ধন সুদৃঢ় করবার জন্যে পশ্চিম জগৎ থেকে আমিই প্রথম এই বিজ্ঞান-মন্দিরে উপস্থিত হয়েছি।" জ্ঞান-জগতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আত্মিক মিলনের প্রতীক স্বরূপ জগদীশচন্দ্র ও মোলিশ একসঙ্গে যমজ নারিকেল বৃক্ষ রোপণ করেন। অধ্যাপক

মোলিশ বলেন—"আজ যে বীজ ছড়িয়ে দিলাম তার ফল হয়তো আমরা ভোগ করতে পারবো না, তবু আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের আশা-আকাঙ্খা অনাগত ভবিষ্যতে ফলবতী হয়ে উঠবে।"

এই উৎসব যখন অনুষ্ঠিত হয়, তখন প্রখ্যাত জার্মান পদার্থ-বিজ্ঞানী অধ্যাপক সোমারফিল্ড্ প্রবাসে ছিলেন। তিনি জগদীশচন্দ্রকে লেখেন—"আমার স্ত্রীর পত্রে জানলাম, আপনার সপ্ততিতম জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়ে গেছে। আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। রবীন্দ্রনাথ যেমন ভারতীয় ললিত কলার প্রবীণতম প্রতিনিধি, প্রসার্যমান ভারতীয় বিজ্ঞানে আপনার তেমনি পরিচয়। আপনিই ভারতবর্ষে বহু শাখা সমন্বিত আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্‌বোধন করেছেন এবং তার অনুশীলনে নবীনতর ভারতীয়গণকে দীক্ষিত করেছেন। খুবই আনন্দের কথা, বর্তমানে ভারতবর্ষে যাঁরা পদার্থবিদ্ হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছেন, তাঁদের অধিকাংশই আপনার শিষ্য।"

অভিনন্দনের প্রতিভাষণে জগদীশচন্দ্র সেদিন যা বলেছিলেন, তার মর্মার্থ: "গত চল্লিশ বছর ধরে যে সংগ্রাম করে চলেছি, জ্ঞানের সীমা প্রসারিত করে বিশ্বসমাজে ভারতবর্ষকে প্রতিষ্ঠিত করাই তার লক্ষ্য। সভ্যতার যে সামগ্রিক অবলুপ্তি আজ আসন্ন, তাকে রোধ করবার একমাত্র উপায় মানসিক জগতে সার্বদেশিক একাত্মবোধ জাগিয়ে তোলা। এই প্রাচ্যের বাণী। চীন যে বিজ্ঞানের আধ্যাত্মিক উন্নয়নের কথা বলেছে, তা এই বাণীরই নবতর অভিব্যক্তি। সব কিছুর মধ্যে প্রাণের ঐক্যের মত মানুষের মহতী আশা আকাঙ্খার ঐক্য সম্পাদন করতে হবে। তাহলেই সভ্যতার নিরবচ্ছিন্নতা অক্ষুণ্ণ থাকবে।

"আমার সমুদয় কর্মব্রতের মধ্যে আমি কখনো সম্পূর্ণ একাকী ছিলাম না। আমরা উভয়েই তখন অখ্যাত; সে বাধা ও সংশয়-পীড়িত জীবনে চিরবন্ধু রবীন্দ্রনাথ আমার মধ্যে উৎসাহের আবেগ ও কল্পনার উচ্ছ্বাসে অনুরণন জাগিয়ে তুলেছিলেন।

"আমার সম্মুখে অনেক প্রাক্তন ছাত্রকে দেখছি, যারা জীবনের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে দায়িত্বসম্পন্ন পদে অধিষ্ঠিত। তাদের কৃতিত্ব আমাকে গৌরবান্বিত করেছে। আরো অনেকে রয়েছে, যারা পৌরুষের সঙ্গে জীবনের দুর্বহ ভার গ্রহণ করেছে এবং যাদের পবিত্র ও নিঃস্বার্থ জীবন অনেকের দুঃখময় জীবনে আনন্দের রশ্মিপাত করেছে।"

ইউরোপ থেকে ফিরে এসে জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞান-মন্দিরে উদ্ভিদ-জীবন সম্পর্কে যে নতুন গবেষণা করেন, তার ফলাফল "Growth and Tropic Movement of Plants" নামক গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়। প্রকাশের পূর্বে এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অধ্যাপক ভাইন্‌সের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের পত্রালাপ হয়। বিজ্ঞান-মন্দিরের সম্প্রসারণের জন্যে সরকার সবেমাত্র অতিরিক্ত অর্থ-সাহায্য দানের প্রস্তাব করেছেন। বৈজ্ঞানিক মিশনে জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতার বিস্ময়কর সাফল্য ও তাঁর গবেষণা-কার্যের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি সম্পর্কে ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে ভারত সরকার যে পত্র পেয়েছেন, এই অর্থ-সাহায্যের প্রতিশ্রুতি সম্ভবতঃ তারই পরিণতি। ভাইন্‌স্‌কে লিখিত পত্রে এই বিষয়েরও উল্লেখ ছিল। বিজ্ঞান-মন্দিরের সম্প্রসারণের জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে জগদীশচন্দ্র বিগত কয়েক বছর ধরে নানাভাবে অর্থ-সংস্থানের চেষ্টা করেছেন। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

**ইউরোপে দশম বৈজ্ঞানিক মিশন**

এমন সময় ইউরোপ পরিদর্শনের বাঞ্ছিত সুযোগ এসে উপস্থিত। জেনিভায় ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল কো-অপারেশন কমিটির বাৎসরিক অধিবেশনে যোগ দিতে হবে। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি জগদীশচন্দ্র এই উপলক্ষে লণ্ডনে পৌঁছেন। দারুণ কর্মব্যস্ততার মধ্যে এখানে কিছুদিন অতিবাহিত হয়। তৎকালীন ভারতসচিব ওয়েজউড বেন জগদীশচন্দ্রকে ইণ্ডিয়া অফিসে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ করেন। ৯ই জুলাই তারিখে আয়োজিত এই সভায় পার্লামেন্টের সদস্য ও ইংল্যাণ্ডের

বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকেরা উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল "উদ্ভিদের নির্বাক জীবনের অভিব্যক্তি"। উদ্ভিদ-দেহে প্রাণ-ধর্মের ক্ষীণতম অভিব্যক্তিগুলিকে নানারকম পরীক্ষার সাহায্যে তিনি সমবেত জনমণ্ডলীর দৃষ্টির সম্মুখে তুলে ধরেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও শিল্পে তাঁর গবেষণার যে সার্থক প্রয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে, সে সম্পর্কে আলোচনা হয়। প্রসঙ্গতঃ তিনি ভারতবর্ষের দারুণ আর্থিক দুর্গতির কথা উল্লেখ করে বলেন, তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রসমূহ এই দেশের অপরিমিত প্রাকৃতিক সম্পদকে মানুষের ভোগ্য সামগ্রীতে রূপান্তরিত করবার পক্ষে সহায়ক হবে। ভারতবর্ষ ও ইংল্যাণ্ডের যৌথ প্রয়াসে অনেক বৃহৎ শিল্প সংগঠনের কাজ সম্ভব হতে পারে।

বক্তৃতাশেষে ওয়েজউড বেন উচ্ছ্বসিত ভাষায় জগদীশচন্দ্রের মনীষা ও বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠার জন্যে তাঁর মহান আত্মনিবেদনকে অভিনন্দিত করেন। তিনি জগদীশচন্দ্রকে প্রতিশ্রুতি দেন, বিজ্ঞান-মন্দিরের সমৃদ্ধি সাধনের জন্যে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। 'অবজারভার', 'স্পেক্টেটর', 'ম্যান্‌চেস্টার গার্ডিয়ান' প্রভৃতি পত্রিকায় ইণ্ডিয়া অফিসে আয়োজিত বক্তৃতা-সভার সপ্রশংস আলোচনা প্রকাশিত হয়। 'লণ্ডন টাইম্‌স্' পত্রিকার বিজ্ঞান-সাংবাদিক ছিলেন রক্ষণশীল মনোভাব-সম্পন্ন। তিনি বরাবর জগদীশচন্দ্রের গবেষণা সম্বন্ধে প্রতিকূল সমালোচনা করে এসেছেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে পত্রিকার সম্পাদক জিওফ্রে ডসন্ বসু-বিজ্ঞান-মন্দির পরিদর্শন করবার পর এই মনোভাবের পরিবর্তন হয়। ইণ্ডিয়া অফিসের বক্তৃতার পর ২০শে জুলাই 'লণ্ডন টাইম্‌স্'-এর শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিশেষ ক্রোড়পত্রে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের গবেষণা সম্পর্কে যে আলোচনা প্রকাশিত হয়, তাতে দৃষ্টিভঙ্গীর এই রূপান্তর স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়।

"গত সপ্তাহে সার জগদীশচন্দ্র বসু ইণ্ডিয়া অফিসে এক উপভোগ্য ভাষণ দিয়েছেন। সেই ভাষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বর্তমানে ভারতবর্ষে যে গণ-অশান্তি দেখা দিয়েছে, তার জন্যে দারুণ

অর্থনৈতিক সঙ্কট মূলতঃ দায়ী। অধ্যাপক বসু বলেছেন, বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের দ্বারাই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। "রয়্যাল কমিশন অন ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচার" একই অভিমত প্রকাশ করেছেন। সম্প্রতি লর্ড আরউইন সিমলায় কৃষি-গবেষণা পরিষদের (Agricultural Research Council) উদ্‌বোধন করেছেন। উদ্ভিদ-জীবন সম্পর্কে অধ্যাপক বসু ও তাঁর সহকর্মিগণ যে সব মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছেন, আমরা আশা করি, এই কৃষি-গবেষণা পরিষদের মাধ্যমে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার সার্থক প্রয়োগ সম্ভব হবে।

ভিয়েনা বিশ্ববিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেক্টর এবং বর্তমানে প্ল্যাণ্ট ফিজিওলজিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক মোলিশ প্রায় এক বছর বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে অবস্থান করবার পর সম্প্রতি ফিরে এসেছেন। প্রাণী ও উদ্ভিদ-দেহের উপর বিভিন্ন ওষুধের ক্রিয়া সমান—অধ্যাপক বসুর নানাবিধ পরীক্ষায় তা প্রমাণিত হয়েছে। অধ্যাপক মোলিশের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে ভিয়েনা ফ্যাকাল্‌টি অব মেডিসিনের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকেরা সাফল্যের সঙ্গে সে সব পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করেছেন।

### দক্ষিণ আফ্রিকার বিজ্ঞান-সভা কর্তৃক আমন্ত্রণ

পরবর্তী সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যগণের দক্ষিণ আফ্রিকা পরিদর্শনের কথা। এই প্রস্তাবিত বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে যোগ দেবার জন্যে "সাউথ আফ্রিকা অ্যাসোসিয়েশন ফর দি অ্যাডভান্‌স্‌মেণ্ট অব সায়েন্স" জগদীশচন্দ্রকে আমন্ত্রণ করেন। আমন্ত্রণের প্রত্যুত্তরে জগদীশচন্দ্র ৩রা জুলাই ইংল্যাণ্ড থেকে উক্ত অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদককে এক পত্র লেখেন। "আপনাদের আমন্ত্রণ-পত্র পাবার আগেই আমি ইউরোপের একাধিক বিজ্ঞান-কেন্দ্র পরিদর্শন করবো বলে কথা দিয়ে ফেলেছিলাম—সে কথা পূর্বেই

আপনাদের জানিয়েছি। তবু আমার আশা ছিল, নির্ধারিত কর্মসূচী আংশিক বাতিল করে দিয়ে আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারবো। কিন্তু লণ্ডনে পৌঁছে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান কেন্দ্র বারলিংটন হাউসে খোঁজ নিয়ে জানলাম, ওখানে আমাকে দুটি বক্তৃতা দিতে হবে এবং তার সবকিছু স্থির হয়ে গেছে। এই অবস্থায় আমার পক্ষে আপনাদের আমন্ত্রণ সম্পর্কে কোনও নিশ্চিত স্বীকারোক্তি করা সম্ভব নয়। তবে ইউরোপে নির্ধারিত কর্মসূচী শেষ হয়ে গেলে ৭ই সেপ্টেম্বরের পর আমি কেপ্ টাউনের উদ্দেশ্যে রওনা হতে পারি, অবশ্য আমার দক্ষিণ আফ্রিকা পরিদর্শনের ব্যাপারে যদি আপনারা একান্তই আগ্রহান্বিত হয়ে থাকেন। অবিলম্বে আমার বিজ্ঞান-মন্দিরে ফিরে যাওয়া প্রয়োজন বলে আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় বেশী দিন থাকতে পারবো না। আপনাদের বিজ্ঞান-সংস্থার সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আগ্রহের প্রতীকস্বরূপ আমার সর্বশেষ প্রকাশিত একখানি গ্রন্থ পাঠালাম।” শেষ পর্যন্ত জগদীশচন্দ্রের পক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণ আর সম্ভব হয়ে ওঠে নি।

জুলাই মাসের মাঝামাঝি জগদীশচন্দ্র লণ্ডন পরিত্যাগ করে জেনিভায় আসেন। কয়েক দিনের মধ্যেই ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল কো-অপারেশন কমিটির অধিবেশন শেষ হয়। বিজ্ঞান-জগতে তাঁর নতুন চিন্তাধারা সবকিছু সংশয় ও বিরোধ অতিক্রম করে ধীরে ধীরে তখন পূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করেছে। প্রকাশিত গ্রন্থাবলীও ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। দীর্ঘদিনের অক্লান্ত সাধনার এই সার্থকতায় জগদীশচন্দ্র গভীর মানসিক শান্তি লাভ করেছেন। তিনি অধ্যাপক নাগকে এই বিষয়ে লিখেছেন ( ভিয়েনা, ৩১শে জুলাই, ১৯২৯ )—“লংম্যান্‌স্ কোম্পানি জানিয়েছে, আমার গ্রন্থগুলি, বিশেষ করে “Motor Mechanism”-এর অসম্ভব চাহিদা। গথিয়ার ভিলারস্ (Gauthier Villars) আমার ‘Plant Autographs’ গ্রন্থের ফরাসী সংস্করণ প্রকাশ করছে। প্যারিস থেকে আগত একজন

চিকিৎসা-বিদ্যার ছাত্রের সঙ্গে দেখা হলো। তার কাছে শোনলাম, সরবোঁ ও কলেজ দ্য ফ্রান্স-এ জীববিজ্ঞানের বক্তৃতাসমূহে আমার গবেষণা ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে। আগামী মাসে আমার গ্রন্থের আর একটি জার্মান সংস্করণ প্রকাশিত হবে। 'নেচার' পত্রিকার সম্পাদক একদিন অভিযোগ করলেন, আমার গবেষণা ও গ্রন্থসমূহের সমালোচনা করবার মত যোগ্য লোক পাওয়া নাকি কঠিন হয়ে পড়েছে।"

অত্যধিক পরিশ্রমে এই সময় জগদীশচন্দ্র অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা পরিদর্শনের সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হয়। কয়েক সপ্তাহ সম্পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণের পর সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি তিনি স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। বিজ্ঞান-মন্দিরে ফিরে এসে তিনি আবার উদ্ভিদ-জীবনের বিচিত্র রহস্য অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হন।

**ফিন্‌ল্যাণ্ডের বিজ্ঞান-সমিতি কর্তৃক সম্মাননা**

এই সময় জগদীশচন্দ্রকে ফিন্‌ল্যাণ্ডের বিজ্ঞান-সমিতির সদস্যপদ দিয়ে সম্মানিত করা হয়। এই প্রসঙ্গে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে ফিন্‌ল্যাণ্ডের প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী হেলসিংকি বিশ্ববিদ্যালয়ের Emeritus Professor ফ্রেডারিক এল্‌ফ্‌ভিং একখানি চিঠি লেখেন।[১]

---

১।

SOCIETES SCIENTIARAM FENNICA
HELSINGFORS
November 23, 1929.

SIR JAGDIS CH. BOSE
Emeritus Professor, Calcutta
Dear Sir,

I have the great pleasure of sending you the diploma as Honorary Member of our Society.........I was the first to prove that in transpiration the water is moving in the interior of

## ইউরোপে সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক মিশন

ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল কো-অপারেশন কমিটির পরবর্তী বাৎসরিক অধিবেশন আসন্ন। সেই উপলক্ষে জগদীশচন্দ্র ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের মে-জুন মাসে ইউরোপ যাত্রা করেন। পাশ্চাত্ত্য দেশে তাঁর এই সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক মিশন সার্থকতার দিক থেকে কম উল্লেখযোগ্য নয়।

জুলাই মাসের মাঝামাঝি জেনিভায় ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল কো-অপারেশন কমিটির ত্রয়োদশ অধিবেশন। সেই সঙ্গে এই সংস্থা ও জগদীশচন্দ্রের মধ্যে সদস্য হিসেবে যে সম্পর্ক, তার নির্দিষ্ট কাল উত্তীর্ণ হয়। পূর্বে এই সংস্থার সভাপতি ছিলেন বিখ্যাত গণিতবিদ্ অধ্যাপক লোরেন্‌ৎস্। তাঁর মৃত্যুর পর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীক-সাহিত্যের তৎকালীন অধ্যাপক গিলবার্ট মারে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। মনস্বিনী মহিলা বিজ্ঞানী মাদাম কুরী অন্যতম সহকারী সভাপতি। কমিটির পরবর্তী অধিবেশনে অধ্যাপক গিলবার্ট মারে জগদীশচন্দ্রের সক্রিয় সহযোগিতার কথা স্মরণ প্রসঙ্গে তাঁকে নিম্নলিখিত মর্মে এক পত্র লেখেন—"সাংস্কৃতিক যোগাযোগের এই আন্তর্জাতিক সংস্থা ও আপনার সহকর্মিগণের পক্ষ থেকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজকের প্রাতঃকালীন অধিবেশনে সংস্থার বিভিন্ন

---

the vessels, not in the wall. I considered that this propulsion of sap could be mechanically explained, but your experiments have completely converted me.

Your views of the fundamental unity of life reactions in plants and animals and also of the agreement between the Living and Non-Living will certainly have an immense influence on the evolution of Biology. I am glad to have lived to see the commencement of this new era and hope that you will give us more sublime thoughts and marvellous apparatus.

Yours sincerely
Fredr. Elfving

কর্মধারায় আপনার উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। আপনার স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবান পরামর্শে সংগঠন এবং বিজ্ঞান ও গ্রন্থপঞ্জী সঙ্কলন বিভাগের কাজ অনেকটা সহজসাধ্য হয়েছে। আমার সহকর্মিগণ তার জন্যে আপনাকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছেন। বস্তুতঃ আমরা উপলব্ধি করেছি, প্রাক্তন সদস্যগণের সহানুভূতির উপরই কমিটির সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে।”

অধ্যাপক গিলবার্ট মারের এই পত্রের উত্তরে জগদীশচন্দ্র আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে লেখেন—“প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে পারস্পরিক মূল্যবোধ ও হিতৈষণা বিশ্বশান্তি ও সভ্যতার ক্রমোন্নতির পক্ষে কতখানি প্রয়োজন, তা আমি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছি। বর্তমানে যে সঙ্কট একমাত্র ভারতবর্ষে চরম হয়ে উঠেছে, সমগ্র বিশ্বের পক্ষে তা উদ্‌বেগজনক। লীগ অব নেশন্‌স্ তার আদর্শ অনুসরণের পথে অবিচলিত থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করতে পারবে বলে আমি আশা করি।”

## পঞ্চদশ অধ্যায়

# শেষের কয়েক বছর

"জীবনের যখন পূর্ণশক্তি, তখন কোলাহলের মধ্যে তোমার নির্দেশ স্পষ্ট করিয়া শুনিতে পারিতাম না। এখন পারিতেছি, কিন্তু সব শক্তি নির্জীব হইয়া আসিতেছে। একদিন তোমার হুকুমে মাঝখানের যবনিকা ছিন্ন হইবে, মৃত্তিকা দিয়া যাহা গড়িয়াছিলে তাহা ধূলি হইয়া পড়িয়া রহিবে। কি লইয়া তখন সে তোমার নিকট উপস্থিত হইবে? অল্পই তাহার সুকৃতি, অসংখ্য তাহার দুষ্কৃতি। সাফাই করিবার কথা যখন কিছুই নাই তখন তোমার পদপ্রান্তে লুন্ঠিত সে কেবল বলিবে—আসামী হাজির!"

নতুন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রবর্তন, পুরাতন মোহের সঙ্গে তার সংঘাত, বিরোধ ও বিদ্বেষের মধ্যে তার প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যে অবিরাম সংগ্রাম—এমনি করে জীবনের বৃহত্তর অধ্যায় অতিক্রান্ত হয়েছে। সে কর্মমুখরিত অধ্যায়ের শেষে জগদীশচন্দ্র অখণ্ড বিশ্রামসুখ উপভোগ করতে পারতেন। যদি তিনি ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে উন্মুখ হতেন, তবে জীবনের এই প্রান্তিক অধ্যায়ে তাঁকে গবেষণা-মন্দির থেকে দূরে কলরব-মুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণে বিজ্ঞান-নির্লিপ্ত, আত্মপ্রসন্ন দেখতাম। মানব-কল্যাণের একটি বিকল্প পথ হিসেবেই একদিন তিনি বিজ্ঞানকে জীবনের অঙ্গীভূত করেছিলেন এবং ভারতবর্ষ যাতে বিশ্ব-বিজ্ঞানকে অক্ষয় অবদানে সমৃদ্ধ করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে উদ্‌বোধন করেছিলেন বিজ্ঞান-মন্দিরের। সেই বিজ্ঞান-মন্দিরের গবেষণাধারা এখন ব্যাপক ও বহুমুখী। বিজ্ঞানের বহুধাবিচ্ছিন্ন চিন্তাপ্রবাহের মধ্যে একটা সংযোগ সাধনই এই গবেষণা-কার্যের লক্ষ্য এবং সে প্রয়াসের সার্থকতাই হবে বিশ্বের বৈজ্ঞানিক প্রগতিতে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ অবদান। সে আদর্শের প্রেরণাতেই

স্থবির ঋষিকল্প বিজ্ঞানী তখন বিজ্ঞান-মন্দিরের কর্মধারার সঙ্গে একাত্ম। তিনি নিজে উদ্ভিদ-জীবন সম্পর্কে নিত্য নতুন তথ্যান্বেষণের পরিকল্পনা করছেন এবং সেই সঙ্গে অনুপ্রাণিত করছেন তরুণ শিষ্যমণ্ডলীকে, যাঁরা ভবিষ্যতে বিজ্ঞান-মন্দিরের ঐতিহ্য ও আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখবেন। তাছাড়া কর্মীদের স্বাধীন গবেষণা-কার্যের মাঝে মাঝে জটিল গ্রন্থি উন্মোচন করে তিনি তাঁদের সাহায্য করছেন। এই সর্বাঙ্গীণ আত্মনিয়োগের মধ্যেই জগদীশচন্দ্রের জীবনের মহত্তম সার্থকতা।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ জগদীশচন্দ্রকে নাগরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। টাউন হলে সমাজের সর্বস্তরের জনগণের এই সম্মেলনে তৎকালীন পৌরপ্রধান সুভাষচন্দ্র বসু যে ভাষণ দেন, তার মর্মার্থ—"পৌর প্রতিষ্ঠানের অল্‌ডারম্যান ও কাউন্সিলারদের পক্ষ থেকে আমি আপনাকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকরূপে আপনি তরুণ বয়সে ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নব্যবিজ্ঞানের ভাবধারাকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করেছিলেন। মানুষের অজ্ঞাত বৈজ্ঞানিক সত্যের অন্তর্দর্শনে একদিন আপনার প্রজ্ঞা ও কল্পনা উজ্জীবিত হয়েছিল। এই মহানগরীর এক নিভৃত গবেষণাগারে আপনার একক সাধনায় কত যুগান্তকারী আবিষ্কারের সূত্রপাত হয়েছে, যার ফলে সমগ্র বিশ্বের বিমুগ্ধ দৃষ্টি পড়েছে তার উপর। প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যে আপনার সার্থক বিজ্ঞান-সাধনা এই দেশের নবীন ছাত্রসমাজকে অনুপ্রাণিত করেছে।

"বিজ্ঞান-জগতে আপনার মহান অবদানের কথা পুনরাবৃত্তি করা নিষ্প্রয়োজন। বিদ্যুৎ-তরঙ্গ নিয়ে আপনার গবেষণা বর্তমান বেতার-বার্তার পূর্বসূচনা। অজৈব পদার্থের মধ্যে প্রাণের অস্তিত্ব আবিষ্কার আপনার পরবর্তী গবেষণার ধারা নির্দেশ করেছে। প্রাচীন ভারতের ঋষিগণ জীবনের বৈচিত্র্যের মধ্যে যে ঐক্যের সন্ধান

পেয়েছিলেন, আপনার তথ্যানুসন্ধান তাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে।

"যে বিজ্ঞান-মন্দির আপনার নাম বহন করছে, সেখানে জীবনের পরিণত অধ্যায়ে আপনি গবেষণায় ব্যাপৃত রয়েছেন, তা আত্ম-নিবেদনের প্রতীক। এই আত্মনিবেদনের বাসনাই আপনাকে মহত্তম কর্মে উদ্‌বোধিত করেছে। আজ সে বিজ্ঞান-মন্দির একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞানের বিশ্বজনীন তীর্থ। দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের মহান আচার্য হিসেবে এবং বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত উচ্চ ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত আপনার ভাষণ ও প্রণোদন এই প্রাচীন দেশের পুনরুজ্জীবন ত্বরান্বিত করেছে। আপাতদৃষ্টিতে যা নিস্পন্দ, নিষ্ক্রিয় মনে হয়েছিল, আপনার প্রতিভার ঐন্দ্রজালিক স্পর্শ তাকে সজীব করে তুলেছে, আমাদের দেশের ইতিহাসে নিয়ে এসেছে একটা নবজাগৃতির আবেগ। প্রার্থনা করি, আপনি দীর্ঘায়ু হয়ে আপনার একাগ্র তপশ্চর্যার ক্ষেত্র এই মহানগরীকে, আমাদের স্বদেশভূমিকে আরও গৌরবান্বিত করুন।"

প্রতিভাষণে জগদীশচন্দ্র বলেন—"এই মহানগরীতে আমার কর্ম ও সংগ্রামের চল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। অনেকের মনে এমনি একটা ভ্রান্ত সংস্কার বদ্ধমূল হয়েছিল যে, ভারতীয় মন যুক্তিসিদ্ধ বিজ্ঞান-অনুশীলনের উপযুক্ত নয়। আমাদের মানসবৃত্তিকে পঙ্গু করে দেওয়া সেই সংস্কারের প্রভাবকে আমি ধৈর্যের সঙ্গে দূর করবার চেষ্টা করেছি। জীবন ও তার বিচিত্র অভিব্যক্তিকে ঘিরে যে রহস্য রয়েছে, এই মহানগরীর পথপার্শ্বের অযত্নবর্ধিত জংলা গাছপালাই অজৈব পদার্থ থেকে একদিন তার দিকে আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছিল। এই নাগরিক পরিপার্শ্বই আমাকে দীর্ঘদিন লালন করেছে—পুষ্পিত করে তুলেছে আমার জীবনকে।"

## রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম বর্ষপূর্তি উৎসব

এই সময় কবির জীবনের সত্তর বছর পূর্ণ হয়। সে উপলক্ষে সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ থেকে কলকাতা মহানগরীতে কবিকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্যে যে উদ্‌বোধন সভার আয়োজন হয় (২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮), জগদীশচন্দ্র ছিলেন তার প্রধান আহ্বায়ক। তিনি জয়ন্তী-উৎসব পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন। উৎসবের অনুষঙ্গ হিসেবে যে 'Golden Book of Tagore' প্রকাশিত হয়, জগদীশচন্দ্র ছিলেন তার অন্যতম উদ্‌যোক্তা। কবির সঙ্গে দীর্ঘদিনের আত্মিক সাহচর্য স্মরণ প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্রের একটি রচনা এই গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। 'জয়ন্তী-উৎসর্গ' থেকে তার আংশিক উদ্‌ধৃতি—"জীবনের বহু বিচিত্র বিকাশ ও ধারার পরিচয় লাভের পথে একদা আমি যখন তিলে তিলে অগ্রসর হইতেছিলাম, সেই ক্লান্তিহীন প্রয়াসে বৎসরের পর বৎসর তিনি আমাকে প্রতিদিনের সখ্য ও সাহচর্য্য দান করিয়াছেন।" ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত এই জয়ন্তী উৎসবে জগদীশচন্দ্র উপস্থিত থাকতে পারেন নি। তিনি গিরিডি থেকে রবীন্দ্রনাথকে শুভেচ্ছা-লিপি পাঠিয়েছিলেন।

## শ্রীসয়াজীরাও গায়কোয়ার প্রাইজ অ্যান্‌ড্‌ অ্যান্যুইটি

সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পে বিশিষ্ট প্রতিভার স্বীকৃতি হিসেবে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে "শ্রীসয়াজীরাও গায়কোয়ার প্রাইজ অ্যান্‌ড্‌ অ্যান্যুইটি" নামে এক বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়। এই বৃত্তির পরিমাণ এককালীন হাজার টাকা এবং সেই সঙ্গে প্রতি বছর বারো শ' টাকা। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ তারিখে জগদীশচন্দ্রকে এই বৃত্তিদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বৃত্তিলাভের অনুষঙ্গ হিসেবে কয়েকটি ভাষণ দেবার জন্যে জগদীশচন্দ্রকে বরোদায় আমন্ত্রণ করা হয়। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি ভাষণ দেন—সভাপতিত্ব করেন মহামান্য গায়কোয়ার। দেশীয় যুবকগণের শিক্ষা, রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ

সমৃদ্ধির জন্যে দূরদর্শী মহারাজার অক্লান্ত চেষ্টা, স্বীয় গবেষণার আনুপূর্বিক ইতিহাস, বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের আদর্শ ও কর্মধারার কথা তিনি আলোচনা করেন।. সেই বছরেই বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয় জগদীশচন্দ্রকে ডক্টর অব সায়েন্স উপাধি দিয়ে সম্মানিত করে। পরের বছর মহামান্য গায়কোয়ারের সুবর্ণ-জয়ন্তী। এই উপলক্ষে স্মারক গ্রন্থের জন্যে জগদীশচন্দ্র একখানি লিপি পাঠাতে অনুরুদ্ধ হন। এই লিপিতে তিনি গায়কোয়ারের দূরদর্শীতা এবং দেশের সর্বাঙ্গীণ সংস্কার ও উন্নয়নের ব্যাপারে তাঁর অমিত উৎসাহের কথা উল্লেখ করেন। তাছাড়া জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে জগদীশচন্দ্র একটি ভাষণ দেন। সেই বছর জুন মাসে তিনি নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বক্তৃতা করেন। এর বছর দুয়েক পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই বিজ্ঞানতপস্বীকে ডক্টর অব সায়েন্স উপাধি দিয়ে সম্মানিত করে।

### প্রেসিডেন্সি কলেজে সম্বর্ধনা

জগদীশচন্দ্র ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা আরম্ভ করেছিলেন। অবসর গ্রহণের পরও Emeritus Professor হিসেবে এই কলেজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন ছিল। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এই সংযোগের অর্ধশতাব্দীকাল পূর্ণ হয়। সে উপলক্ষে প্রেসিডেন্সি কলেজ-প্রাঙ্গণে অধ্যাপকমণ্ডলী, বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র এবং বিশিষ্ট নাগরিকগণের এক সভায় জগদীশচন্দ্রকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বাংলার তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় আজিজুল হক সভাপতির ভাষণে বলেন—"বহু শতাব্দী পূর্বে বাঙ্গালী দীপঙ্কর বহির্ভারতে ভারতের মর্মবাণী প্রচার করেছিলেন। আজ দীর্ঘকাল পরে আর একজন বাঙ্গালী বিজ্ঞানের নবমন্ত্র সমগ্র পৃথিবীতে বিঘোষিত করলেন।"

**বিদেশী বিজ্ঞানিবৃন্দ**

জগদীশচন্দ্রের জীবনের শেষ অধ্যায়ে পাশ্চাত্ত্যের কতিপয় বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান-সাংবাদিক বসু-বিজ্ঞান-মন্দির পরিদর্শনে এসেছিলেন। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টর ম্যাগ্‌নাস হার্শফেল্‌ড্‌ সোভিয়েট সরকারের আমন্ত্রণে রাশিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা-কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। পেট্রোগ্র্যাডে উদ্ভিদ-বিজ্ঞান গবেষণাগারের পরিচালক ডক্টর হার্শফেল্‌ড্‌কে বলেন, প্রাণী ও উদ্ভিদের জৈব-প্রক্রিয়ার ঐক্য সম্পর্কে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে যে গবেষণা চলছে, তা বিজ্ঞানের এই বিশেষ শাখায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে এবং পেট্রোগ্র্যাড গবেষণাগারের একটি বিভাগে জগদীশচন্দ্রের একাধিক পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করা সম্ভব হয়েছে। এরপর ডক্টর হার্শফেল্‌ড্‌ বসু-বিজ্ঞান-মন্দির পরিদর্শনের বিশেষ আগ্রহ নিয়ে কলকাতায় আসেন। প্রায় একই সময়ে আসেন নিউ ইয়র্কের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ব্রুকলিন ইনস্টিটিউট অব আর্টস্‌ অ্যাণ্ড সায়েন্সের উদ্ভিদ-বিজ্ঞান বিভাগের অধিনায়ক ডক্টর জর্জ ওয়ার্ড। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে ইংল্যাণ্ডের 'নেচার' পত্রিকার সম্পাদক সার রিচার্ড গ্রেগরি এবং পরের বছর রুশ শারীরবিজ্ঞানী অধ্যাপক ভরোনফ বিজ্ঞান-মন্দিরের গবেষণা ধারার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করেন। উদ্ভিদের জীবনরহস্য উদ্‌ঘাটনকে অধ্যাপক ভরোনফ জীববিজ্ঞানের একটি বিস্ময়কর আবিষ্কার বলে অভিনন্দিত করেন।

**সরকারী অর্থ-সাহায্য হ্রাস**

এদিকে অপ্রত্যাশিতভাবে সরকারী অর্থ-সাহায্য হ্রাস পাওয়ায় বিজ্ঞান-মন্দিরের পরিচালন ব্যাপারে জগদীশচন্দ্র বিব্রত হয়ে পড়েন। কর্তৃপক্ষ তখন দারুণ অর্থসঙ্কট কাটিয়ে ওঠবার জন্যে যথাসম্ভব ব্যয়-সঙ্কোচের কথা গভীরভাবে চিন্তা করে দেখছিলেন। পাবলিক অ্যাকাউন্টস্‌ কমিটি বিজ্ঞান-মন্দির সম্বন্ধে নিম্নরূপ মন্তব্য করেন—

মায়াপুরী (দার্জিলিং)

"সরকার যখন সর্বত্র গবেষণা-বৃত্তি বন্ধ করে দিচ্ছেন, এমন কি—পুসার একান্ত প্রয়োজনীয় কৃষি-গবেষণাগারের ব্যয়নির্বাহ করাও সামর্থ্যের অতীত, তখন বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের মত গবেষণা-কেন্দ্রের উচিত সরকারের ব্যয়সঙ্কোচনের নীতি নির্বিবাদে মেনে নেওয়া।" পাবলিক অ্যাকাউন্টস্ কমিটির এই মন্তব্য অনুসারে এবং ভারতসচিবের সম্মতিক্রমে কর্তৃপক্ষ জগদীশচন্দ্রকে জানান যে, অতঃপর বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে সরকারী অর্থ-সাহায্যের পরিমাণ সাময়িকভাবে বার্ষিক ৫৩ হাজার টাকা করা হবে (১৯৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দের জন্যে)। ভবিষ্যতে আর্থিক অবস্থার উন্নতি হলে সরকার এই বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করে দেখবেন। জগদীশচন্দ্র যথেষ্ট বিচক্ষণতা ও নৈপুণ্যের সঙ্গে এই অপ্রত্যাশিত অর্থসঙ্কট কাটিয়ে ওঠেন এবং বিজ্ঞান-মন্দিরের পরিকল্পিত গবেষণাধারা সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি বিজ্ঞান-মন্দিরের আর্থিক সঙ্গতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গভীর মানসিক উদ্‌বেগ ভোগ করেছেন। কারণ, তাঁর জীবদ্দশায় সরকারের পক্ষ থেকে অর্থ-সাহায্য বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি আর বাস্তবে রূপায়িত হয় নি।

জরার অপ্রতিরোধ্য আক্রমণে কর্মচঞ্চল জীবনের উচ্ছ্বাস ঈষৎ মন্দীভূত। মহানগরীর অবরোধ ও প্রিয় বিজ্ঞান-মন্দিরের ব্যস্ততা-মুখরিত পরিবেশ থেকে দূরে দার্জিলিং-এ গ্রীষ্মকালীন অবকাশে স্থবির বিজ্ঞানাচার্য এখন কিছুটা দৈহিক আরাম ও মানসিক মুক্তির আস্বাদ পান। এখানে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের শাখা 'মায়াপুরী'র শান্ত, নির্জন তপোবন-পরিবেশে নির্বাক উদ্ভিদের সঙ্গে এই ঋষিকল্প বিজ্ঞানীর একাত্মবোধ নিবিড়তর হয়।

মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে দীর্ঘদিনের রোগক্লান্তির মধ্যে রক্তচাপের নতুন উপসর্গ দেখা দেয়। শরীরের এরূপ অবস্থায় দার্জিলিং-এর শৈলাবাস আর নির্বিঘ্ন নয়। তাই রুগ্ন জগদীশচন্দ্র গিরিডিতে জীবনের শেষ কয়েক বছর শীতকালীন অবকাশ যাপন করতেন। সঙ্গে

থাকতেন পত্নী আর নিকটতম আত্মীয়-স্বজন। কর্মে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ততা এই বার্ধক্যের স্বাভাবিক পরিণতি। তবু জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞান-মন্দির ও শিষ্যমণ্ডলীর সঙ্গে যে সক্রিয় যোগাযোগ রক্ষা করতে পেরেছিলেন, সে শুধু বিশিষ্ট সুহৃদ ডাক্তার সার নীলরতন সরকারের কঠিন বিধিনির্দেশ এবং আচার্যপত্নীর সতর্ক দৃষ্টি ও আন্তরিক সেবা-যত্নের জন্যে। গিরিডি বা দার্জিলিং-এ সাংবৎসরিক অবকাশ-যাপন ছাড়াও কর্মক্লান্ত বিজ্ঞানী সপ্তাহান্তে ফলতার গঙ্গাতীরবর্তী বাড়ীতে বিশ্রাম গ্রহণ করতেন। উলুবেড়িয়ার নিকট শিজবেড়িয়ার ডাকবাংলো সরকার জগদীশচন্দ্রকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেখানেও তাঁর সন্ধানী মন অলস হয়ে থাকতো না। নদীর ধারে যে সব গাছপালা জন্মে, এখানে তিনি সে সম্বন্ধে গবেষণা করতেন। স্থানীয় লোকের মধ্যে জনশ্রুতি প্রচলিত হয়েছিল যে, গভীর রাত্রিতে নাকি নদীতীরের উদ্ভিদের সঙ্গে বিজ্ঞানীর বাণীবিনিময় হতো।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর, রোগক্লান্ত জগদীশচন্দ্র যাত্রা করলেন গিড়িডির উদ্দেশ্যে। সঙ্গে রয়েছেন পত্নী অবলা বসু। কোন অদৃশ্য অধিদেবতা জীবন নাট্যের শেষ দৃশ্যের আয়োজন পূর্ণ করে চলেছেন। বিজ্ঞান-মন্দির থেকে প্রকাশিত Transactions-এর সম্পাদক ছিলেন জগদীশচন্দ্র। প্রকাশের পূর্বে তিনি অশেষ ধৈর্যের সঙ্গে পত্রিকার সবকিছু পরিমার্জনা করে দিতেন। তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, এই নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল না। পত্রিকার শেষ লিপি সংশোধিত হয়ে চলে গেছে তিন দিন আগে। ২৩শে নভেম্বর, সকাল সাড়ে আটটা। সপ্তাহ পরে বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস, আর আচার্যদেবের অশীতিতম জয়ন্তী উৎসব। যোগ্য আড়ম্বরের সঙ্গে সে প্রতীক্ষিত পুণ্যদিবস উদ্‌যাপনের পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে আচার্য পত্নী ও বিজ্ঞান-মন্দিরের তত্ত্বাবধায়কের মধ্যে। এই কথোপকথনের মধ্যে সকলের দৃষ্টির অন্তরালে আচার্য জগদীশচন্দ্র স্নানাগারে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। এই মর্মান্তিক

সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো দেশের সর্বত্র। গিরিডিবাসীদের শেষ দর্শনের পর মৃতদেহ কলকাতায় নিয়ে আসা হলো। অগণিত নাগরিকের নীরব শোকযাত্রা মহানগরীর রাজপথ পরিক্রমণ করবার পর শেষকৃত্য সমাপিত হলো।

দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, আমাদের দৃষ্টির সম্মুখ থেকে সে সৌম্যদর্শন বিজ্ঞানী অন্তর্হিত হয়েছেন। মৃত্যুর স্পর্শে বর্তমান শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সত্যসন্ধানী আজ নীরব, নিস্পন্দ। বিজ্ঞান-চিন্তার ক্ষেত্রে ইউরোপের জাগ্রত-জগতের সঙ্গে আমাদের অন্তরের যোগ সাধন করে তিনি এক নতুন শক্তির উদ্‌বোধন করেছিলেন। সেই শক্তির উদ্‌বোধনই বর্তমান ভারতবর্ষে সার্থক বিজ্ঞান-চর্চার মূল উৎস। তাই ভারতবর্ষের পুনর্জাগৃতি ও পৃথিবীর মানসিক ক্রমবিকাশের ইতিহাসে জগদীশচন্দ্র চিরঞ্জীব—ভারতবাসীর অন্তরে তাঁর শ্রদ্ধার আসন অবিচলিত।

## ষোড়শ অধ্যায়

# সাহিত্যানুরাগ

একাধারে বিভিন্নমুখী প্রতিভার বিকাশ খুব বেশী দেখা যায় না। জগদীশচন্দ্রের মধ্যে কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রতিভার পাশাপাশি সাহিত্য-প্রতিভাও বিকশিত হয়েছিল। কিন্তু তিনি তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার বেশী কিছু নিদর্শন রেখে যাবার অবকাশ পান নি। রবীন্দ্রনাথের নিম্নোধৃত পত্র থেকেই একথা পরিস্ফুট হবে।

বন্ধু,

তোমার 'অব্যক্ত'র অনেক লেখাই আমার পূর্বপরিচিত এবং এগুলি পড়িয়া অনেক বারই ভাবিয়াছি যে, যদিও বিজ্ঞান বাণীকেই তুমি তোমার সুয়োরাণী করিয়াছ তবু সাহিত্য সরস্বতী সে পদের দাবী করিতে পারিত—কেবল তোমার অনবধানেই সে অনাদৃত হইয়া আছে। ইতি ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৮।

তোমার রবি

জগদীশচন্দ্র ছিলেন আজীবন একনিষ্ঠ বিজ্ঞানব্রতী। দৃষ্টির সীমাকে ছাড়িয়ে আলোকের অনুসরণ করা, শ্রুতির শক্তি যেখানে সুরের শেষ সীমায় পৌঁছয়, সেখান থেকেও কম্পমান বাণী আহরণ করা তার ধর্ম। কবিও তাঁর হৃদয়ের দৃষ্টি-প্রদীপে এক অরূপকে দেখতে পান, তাকেই রূপের মধ্যে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেন। অন্যের দেখা যেখানে শেষ হয়ে যায়, সেখানেও তাঁর দৃষ্টি রুদ্ধ হয় না। সাধারণ মানুষের উপলব্ধির অতীত লোকে এই মানসিক যাত্রার দিক থেকে কবি ও বিজ্ঞানী সধর্মী, যেটুকু পার্থক্য সে তাঁদের যাত্রাপথ, পাথেয় আর উপলব্ধির প্রকাশ-ভঙ্গীতে। কবি ও বিজ্ঞানীর ব্যবধানকে

জগদীশচন্দ্র খুব বড় করে দেখেন নি। সমর্থনকল্পে তাঁর রচনা থেকেই অংশবিশেষ উদ্‌ধৃত করছি[১] : "বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েরই অনুভূতি অনির্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। প্রভেদ এই, কবি পথের কথা ভাবেন না; বৈজ্ঞানিক পথটাকে উপেক্ষা করেন না। কবিকে সর্বদা আত্মহারা হইতে হয়, আত্মসম্বরণ করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য। বৈজ্ঞানিককে যে পথ অনুসরণ করিতে হয় তাহা একান্ত বন্ধুর এবং পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের কঠোর পথে তাঁহাকে সর্বদা আত্ম-সম্বরণ করিয়া চলিতে হয়। কিন্তু এমন যে কঠিন নিশ্চিতের পথ, এই পথ দিয়াও বৈজ্ঞানিক সেই অপরিসীম রহস্যের অভিমুখেই চলিয়াছেন। হঠাৎ চক্ষুর আবরণ অপসারিত হইয়া এক অচিন্তনীয় রাজ্যের দৃশ্য যখন বৈজ্ঞানিককে অভিভূত করে, তখন মুহূর্তের জন্য তিনিও আপনার স্বাভাবিক আত্মসম্বরণ করিতে বিস্মৃত হন।" এই ক্ষণিক আত্মবিস্মরণের মুহূর্তেই বিজ্ঞানীর সংযত চিন্তাকে ছাপিয়ে কল্পনার উচ্ছ্বাস দেখা দেয়, বিজ্ঞানের জটিল তত্ত্বের বর্ণনা হয়ে ওঠে অনিন্দ্যসুন্দর শিল্পসৃষ্টি। প্রকাশের অতীত যে রহস্যলোক, জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানী হিসেবে তার গভীরে গিয়েছেন, নির্বাক উদ্ভিদকে নানা প্রশ্ন করে তার নিঃশব্দ অন্তঃপুরের কথা জেনেছেন, অরূপ রশ্মির প্রকৃতি সন্ধান করেছেন। তারপর তিনি অদৃশ্য ও নিঃশব্দ রাজ্যের নানা তথ্য আমাদের প্রতীতিগম্য যে ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, তা একান্তভাবে কবির—সাহিত্যিকের।

বাংলা সাহিত্যে জগদীশচন্দ্রের পরিমিত অবদানকে মুখ্যতঃ তাঁর বিজ্ঞান-সাধনার অনুষঙ্গ মনে করা যেতে পারে। অবশ্য ভ্রমণ ও ঐতিহাসিক কাহিনী কয়েকটি প্রবন্ধের উপজীব্য। প্রকৃতপক্ষে, সঞ্জীবনী পত্রিকায় প্রকাশিত যে প্রবন্ধের মধ্যে জগদীশচন্দ্রের সাহিত্য-

---

১। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর ময়মনসিংহ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ। 'বিজ্ঞানে সাহিত্য : কবিতা ও বিজ্ঞান', 'অব্যক্ত' দ্রষ্টব্য।

অনুশীলনের সূত্রপাত, তা ইংল্যাণ্ডের ফসেট-পরিবারের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা সম্পর্কে লেখা। তারপর জীবনের বৃহত্তর অংশ অতিবাহিত হয়েছে বিজ্ঞান-অনুশীলনে। সে সংঘাতমুখর সুদীর্ঘ অধ্যায়ের ইতিহাস থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, সাহিত্যক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্রের প্রবেশ কেন ঐকান্তিক হবার অবকাশ পায় নি। শুধু বিজ্ঞান-অনুশীলনে ব্যস্ততাই সাহিত্য-চর্চার পক্ষে প্রতিকূল ছিল, তা নয়। জগদীশচন্দ্র যখন ইংরেজী ভাষায় তত্ত্বসমৃদ্ধ গ্রন্থসমূহ রচনা করেছেন, তখন প্রকাশ-ভঙ্গীতে কিছুমাত্র জড়তা আসে নি। কিন্তু বাংলা লেখার ব্যাপারে তিনি একটা অমূলক কুণ্ঠায় আড়ষ্ট হতেন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, "আমি অনেক সময় মনে করিয়াছি যে, বাংলা কোন মাসিক পত্রে আমার এই নূতন কার্য সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিব, কিন্তু কথা খুঁজিয়া পাই না বলিয়া সে ইচ্ছা মনেই রহিয়াছে।" তবু কেন তিনি সাহিত্য-অনুশীলনে প্রয়াসী হয়েছিলেন, 'অব্যক্ত' গ্রন্থের 'কথারম্ভে' তিনি তার কারণ উল্লেখ করেছেন—"ভিতর ও বাহিরের উত্তেজনায় জীব কখনও কলরব কখনও আর্তনাদ করিয়া থাকে। মানুষ মাতৃক্রোড়ে যে ভাষা শিক্ষা করে, সে ভাষাতেই সে আপনার সুখদুঃখ জ্ঞাপন করে।" জগদীশচন্দ্র সাহিত্য-সৃষ্টির খাতিরেই সাহিত্যের অনুশীলন করেন নি। বরং একথা বলাই সমীচীন যে, তাঁর ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের চর্চা মাতৃভাষার প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগের প্রকাশ মাত্র।

অব্যক্ত জগতের রহস্য-সন্ধানী জগদীশচন্দ্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ থেকে অতীন্দ্রিয় ভাবজগতে পরিক্রমা করেছেন—কখনও দৃশ্য আলোকের বর্ণোচ্ছ্বাস থেকে অদৃশ্য বিদ্যুৎ-তরঙ্গে, কখনও জীব-জগতের প্রাণচাঞ্চল্য থেকে শ্যামল উদ্ভিদের অতি সংযত, মৌন জীবননাট্যে। সেই পরিক্রমার পথে তিনি যুগপৎ বিজ্ঞানী, কবি ও দার্শনিক। এই ত্রিবিধ সত্তার সমন্বয়ে তাঁর অন্তরতম সত্তা গড়ে উঠেছিল। বিশ্বের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের উপলব্ধি তাঁর জীবন-

ব্যাপী সাধনার ফল। জীবজগৎ ও জড়জগৎ, প্রাণী ও প্রকৃতির মধ্যে তিনি যে একই প্রাণচেতন উৎসের সন্ধান পেয়েছেন, তা শুধু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মাধ্যমে নয়, তার পিছনে আছে কবিহৃদয়ের অনুভূতি, আর দার্শনিক উপলব্ধি। তাই জগদীশচন্দ্রের প্রবন্ধসমূহে বিজ্ঞান, কাব্য ও দর্শনের ত্রিধারা সঙ্গম ঘটেছে এবং সেগুলি সাহিত্য-রসোত্তীর্ণ। এই প্রসঙ্গে 'দাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে' শীর্ষক প্রবন্ধের উল্লেখ করা যেতে পারে। হিন্দু পুরাণে বর্ণিত একটি রূপকাশ্রয়ী কাহিনীর অন্তরালে ভূগোল-বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত সত্যকে উপলক্ষ করেই এই প্রবন্ধের অবতারণা। বিজ্ঞানের আলোচনায় এমন সাহিত্য-সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে উপজীব্য করে জগদীশচন্দ্র আরও প্রবন্ধ রচনা করেছেন—'আকাশ-স্পন্দন ও আকাশ-সম্ভব জগৎ', 'নির্বাক জীবন', 'আহত উদ্ভিদ' ইত্যাদি। অধিকাংশ প্রবন্ধেই গতানুগতিক বিজ্ঞান-আলোচনার প্রধান লক্ষণ বস্তুনিষ্ঠাকে অতিক্রম করে লেখকের কল্পনা-প্রবণতা, ভাববিলাসিতা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে'র কাব্য-সৌন্দর্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ পাঠক পরিচিত। মহাদেবের জটা থেকে গঙ্গার উৎপত্তি সম্বন্ধে আবাল্য সংস্কারের মর্ম উপলব্ধি করবার জন্যে লেখক একবার গঙ্গোত্রীর উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন। গঙ্গার প্রবাহ অনুসরণের পথে পড়েছে হিমালয়ের অরণ্য, উপত্যকা, জলপ্রপাত আর তুষার-প্রান্তর। তার সৃষ্টির সৌন্দর্য দেখে নিসর্গমরমী জগদীশচন্দ্র মাঝে মাঝে ক্ষণিকের জন্যে সৃষ্টিতত্ত্বে উদাসীন হয়ে পড়েছেন। এই উদাসীনতার মুহূর্তগুলিই অলোকসুন্দর শিল্পকর্ম হয়ে উঠেছে। তুষার-প্রান্তরের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—

"বহু বন ও গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া অবশেষে তুষার-প্রান্তরে উপনীত হইলাম। নদীর ধবল সূত্রটি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া এই পর্যন্ত আসিতেছিল, কল্লোলিনীর মৃদু গীত এত দিন কর্ণে

ধ্বনিত হইতেছিল, সহসা যেন কোন ঐন্দ্রজালিকের মন্ত্রপ্রভাবে সে গীত নীরব হইল, নদীর তরল নীর অকস্মাৎ কঠিন নিস্তব্ধ তুষারে পরিণত হইল। ক্রমে দেখিলাম স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড ঊর্মিমালা প্রস্তরীভূত হইয়া রহিয়াছে, যেন ক্রীড়াশীল চঞ্চল তরঙ্গগুলিকে কে 'তিষ্ঠ' বলিয়া অচল করিয়া রাখিয়াছে। কোন মহাশিল্পী যেন সমগ্র বিশ্বের স্ফটিকখনি নিঃশেষ করিয়া এই বিশাল ক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের মূর্তি রচনা করিয়া দিয়াছেন।"

লেখকের বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে পুরাণে বর্ণিত মহাদেবের জটা আর নন্দাদেবীর শৃঙ্গ-আশ্রিত জলকণার ভাস্বর পরিমণ্ডল অভিন্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। নদীর উৎপত্তি, গতিপথ ও সাগর-সঙ্গম আবার সমুদ্রজল থেকে মেঘের সৃষ্টি, পর্বতশিখরে তার তুষারে রূপান্তর— এই ভৌগোলিক সত্যের ব্যাখ্যা উপলক্ষ মাত্র। "যে যায় সে তো আর ফিরে না; তবে কি সে অনন্তকালের জন্য লুপ্ত হয়? যে যায় সে কোথায় যায়? তখন নদীর কলধ্বনির মধ্যে শুনিতে পাইলাম, 'মহাদেবের পদতলে'।"—সৃষ্টিচক্রের এই দুর্জ্ঞেয় লীলা সম্বন্ধে লেখকের জিজ্ঞাসার পরিতৃপ্তিই প্রবন্ধের মুখ্য বিষয়।

রবীন্দ্রনাথ কবি, আর জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানী; কিন্তু উভয়েই দ্রষ্টা, প্রকৃতির প্রতি উভয়ের মমত্ববোধ গভীর, আন্তরিক। জগদীশচন্দ্রের এই নিসর্গমরমী চেতনা[১] তাঁর গবেষণাধারার মধ্যে একটা অন্তর্লীন কাব্য-সৌন্দর্য উদ্‌ভাসিত করেছে। 'চিরসহিষ্ণু উদ্ভিদ-জগৎ নিশ্চলভাবে আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান। অতি সংযত,

---

১। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কিলপ্যাট্রিক ভারতবর্ষ পরিদর্শনের পর নিউইয়র্ক ইন্টারন্যাশন্যাল হোমে ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শান্তিনিকেতন আশ্রমে রবীন্দ্রনাথের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি জগদীশচন্দ্রের প্রকৃতি-সন্ধানের কথা উল্লেখ করে বলেন—" The Hindu has a feeling for nature which we donot have in this country. Everything that is alive is spiritually alive to an

মৌন ও অক্রন্দিত জীবনেরও এক মর্মভেদী ইতিহাস আছে।' জগদীশচন্দ্র গভীর দরদ নিয়ে উদ্ভিদের সে নির্বাক জীবনে বাঙ্‌মূর্তির সন্ধান করেছেন। মরমী বিজ্ঞানী মুমূর্ষু উদ্ভিদের যে ছবি এঁকেছেন, তা মানবিক বেদনায় স্নিগ্ধ। "সেই আঘাত, মৃত্যুর আঘাত। কিন্তু সেই অন্তিম মুহূর্তে গাছের স্থির স্নিগ্ধ মূর্তি ম্লান হয় না। হেলিয়া পড়া, কিংবা শুষ্ক হইয়া যাওয়া অনেক পরের অবস্থা। মৃত্যুর রুদ্র আহ্বান যখন আসিয়া পৌঁছে, তখন গাছ তাহার শেষ উত্তর কেমন করিয়া দেয়? মানুষের মৃত্যুকালে যেমন একটা দারুণ আক্ষেপ সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়া বহিয়া যায়, তেমনি দেখিতে পাই অন্তিম মুহূর্তে বৃক্ষদেহের মধ্য দিয়াও একটা বিপুল কুঞ্চনের আক্ষেপ প্রকাশ পায়। এই সময়ে একটি বিদ্যুৎ-প্রবাহ মুহূর্তের জন্য মুমূর্ষু বৃক্ষগাত্রে তীব্রবেগে ধাবিত হয়। লিপিযন্ত্রে এই সময় হঠাৎ জীবনের লেখার গতি পরিবর্তিত হয়—ঊর্ধ্বগামী রেখা নিম্নদিকে ছুটিয়া গিয়া স্তব্ধ হইয়া যায়। এই সাড়াই বৃক্ষের অন্তিম সাড়া।"[১]

বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের গবেষণার মূলকথা 'অদৃশ্য আলোক' এবং আরও কয়েকটি প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়। তাছাড়া তিনি কিশোরদের উপযোগী একাধিক প্রবন্ধ রচনা করেন। 'গাছের কথা', 'উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু', 'মন্ত্রের সাধন' শীর্ষক প্রবন্ধগুলি অত্যন্ত সহজবোধ্য ভাষায় লিখিত। পাঠকের বিজ্ঞান সম্পর্কিত কৌতূহল পরিতৃপ্ত করবার জন্যে জগদীশচন্দ্র অনেক সময় সরস গল্প ও উপমার অবতারণা করেছেন। বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যে এই রকম প্রাঞ্জল ও ব্যাঞ্জনাসমৃদ্ধ রচনার যথেষ্ট অভাব।

---

Indian. I shall never forget going to that great laboratory in Calcutta and seeing how Dr. J. C. Bose was studying the plants and that near approach to nervous behaviour in plants."

১। নির্বাক জীবন: মৃত্যুর সাড়া—'অব্যক্ত'

জগদীশচন্দ্রের রচনায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপেরও অভাব নেই। এই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এসেছে তাঁর সহজাত হাস্যরসবোধ থেকে। ঝড়-বৃষ্টি সম্পর্কে আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাসের ব্যর্থতা নিয়ে লেখা একখানি রসরচনা 'পলাতক তুফান'।[১] সিমলা হাওয়া-অফিসের ঘোষণা—বঙ্গোপসাগরে শীঘ্রই ঝড় হইবার সম্ভাবনা। ডায়মণ্ডহারবার বন্দরে আসন্ন দুর্যোগের জন্যে সতর্কতা গ্রহণের ব্যস্ততা, কলকাতার ভীত-সন্ত্রস্ত নাগরিকগণের বিনিদ্র প্রতীক্ষা। শেষ পর্যন্ত বহু বিজ্ঞাপিত ঝড়ের চিহ্ন দেখা গেল না। তুফান কেন 'পলায়ন করিল' এই ঘটনার 'প্রকৃত তত্ত্ব' লেখক বর্ণনা করেছেন। 'বৈজ্ঞানিক কাগজে ঢেউয়ের উপর তৈলের প্রভাব সম্প্রতি পড়িয়াছিলাম। তৈল যে চঞ্চল জলরাশিকে মসৃণ করে, এই বিষয়ে অনেক ঘটনা মনে হইল।' প্রশান্ত সমুদ্রের ন্যায় লেখকের বিরলকেশ মসৃণ মস্তকে দু'এক স্থানে কেশগুচ্ছ ছিল। ভূগোল-তত্ত্বের নবীনা ছাত্রী তাঁর অষ্টমবর্ষীয়া কন্যার ভাষায় সেগুলি দ্বীপ। সমুদ্রের নোনা জলে যাতে এই দ্বীপও নিশ্চিহ্ন না হয়, সে জন্যে সমুদ্রযাত্রী লেখকের ব্যাগে বুদ্ধিমতী কন্যা 'কুন্তল কেশরী' নামে এক স্বপ্নলব্ধ অবধৌতিক তেল দিয়েছিল। এই 'কুন্তল কেশরী'র কয়েক ফোঁটার স্পর্শে সেদিন মুহূর্ত মধ্যে সমুদ্র প্রশান্ত মূর্তি ধারণ করেছিল, আর হাওয়া-অফিসের পূর্বাভাসকে ব্যর্থ করে দিয়ে ঝড় অদৃশ্য হয়েছিল।

এই রসরচনার একস্থানে পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্বের সঙ্গে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের সম্পর্ক আলোচনা করতে গিয়ে জগদীশচন্দ্র ভারতবর্ষে নারীজাতির ব্যক্তিস্বাধীনতার অভাবের উপর কটাক্ষ

---

১। এইচ্ বসু, পারফিউমার ; দেলখোস হাউস্ কলিকাতা কর্তৃক প্রবর্তিত এবং অধুনালুপ্ত কুন্তলীন প্রতিযোগিতার প্রথম বছরে (১৩০৩ সাল) পুরস্কার প্রাপ্ত রসরচনা 'নিরুদ্দেশের কাহিনী' ঈষৎ রূপান্তরিত হয়ে 'পলাতক তুফান' নামে 'অব্যক্ত' গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে।

করেছেন—"আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুসারে পদার্থের উপর পৃথিবীর আকর্ষণ বেশী কিংবা কম। যাহা গুরু তাহার উপরেই টান বেশী এবং সেই পরিমাণে আবদ্ধ। আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্বন্ধে যে বৈজ্ঞানিক সত্য বর্ণিত হইল তাহা যে পৃথিবীর সর্বস্থানে প্রযুজ্য এই সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, কারণ ইণ্ডিয়া নামক দেশে যদিও পুরুষজাতি গুরু, তথাপি তাহারা উন্মুক্ত, আর লঘু স্ত্রীজাতিই সে দেশে আবদ্ধ!" জগদীশচন্দ্রের শ্লেষ থেকে থিয়োসফিক্যাল সোসাইটিও রেহাই পায় নি—"পদার্থের মৃত্যুর পর স্বতন্ত্র কথা। মানুষ মরিয়া যখন ভূত হয় তখন তাহার উপর পৃথিবীর আর কোন কর্তৃত্ব থাকে না। কেহ কেহ বলেন মরিয়াও নিষ্কৃতি নাই, কারণ ভূতদিগকেও থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির আজ্ঞানুসারে চলাফেরা করিতে হয়। পদার্থও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়া থাকে—পদার্থ সম্বন্ধে পঞ্চত্ব কথা প্রয়োগ করা ভুল, কারণ রেডিয়ামের গুতো খাইয়া পদার্থ ত্রিত্ব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ আল্‌ফা, বিটা ও গামা এই তিন ভূতে পরিণত হয়। এইরূপে পদার্থের অস্তিত্ব যখন লোপ হয়, তখন অপদার্থ শূন্যে মিলিয়া যায়।"

'হৃদয় জানা' কথাটির কবিতাসুলভ আলঙ্কারিক অর্থ সম্পর্কে জগদীশচন্দ্রের একটি সকৌতুক উক্তি—"শারীর-তত্ত্ববিদেরা মানুষের হৃদয় জানিতে যাইয়া ভেক ও কচ্ছপের হৃদয় লইয়া খেলা করেন। হৃদয় জানা কথাটি শারীরিক অর্থে ব্যবহার করিতেছি, কবিতার অর্থে নহে।" গাছের বৃদ্ধি সম্পর্কে পরীক্ষা করে জগদীশচন্দ্র দেখেছেন, সব রকম আঘাতেই বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি একটি সরস মন্তব্য করেছেন—"হে বেত্রপানি স্কুলমাস্টার, তোমার কানমলা খাইয়া কেহ কেহ যে হাইকোর্টের জজ পর্য্যন্ত হইয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ছেলেরা তোমার হাতে বেত খাইয়া যে হঠাৎ লম্বায় বাড়িয়া উঠিবে এই সম্বন্ধে গুরুতর সন্দেহ।"

জগদীশচন্দ্র প্রথম দিকে তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রসমূহের সংস্কৃত নাম দিয়েছিলেন। বিদেশী সমাজে এই নামকরণ শুধু উপহসিত হয় নি,

'কুঞ্চনমান' একদিন 'কাঞ্চনম্যানে' বিকৃত হয়েছিল। "হিরণ্যকশিপুকে দিয়া বরং হরিনাম উচ্চারণ করান যাইতে পারে, কিন্তু ইংরেজকে বাঙ্গালা কিংবা সংস্কৃত বলান একেবারে অসম্ভব। এই জন্যই আমাদের হরিকে হ্যারী হইতে হয়। এই সকল দেখিয়া কলের 'বুদ্ধিমান' নামকরণের ইচ্ছা একেবারে চলিয়া গিয়াছে। 'বুদ্ধিমান', তাহা হইলে 'বার্‌ডোয়ান্‌' হইত।" এই আশঙ্কায় জগদীশচন্দ্র সেদিন বিদেশী সমাজে স্বদেশীপ্রচার থেকে বিরত হয়েছিলেন। বিজ্ঞানের প্রাণময় সাধনায় নিমগ্ন মানুষটির মধ্যে যে রসপ্রীতি প্রচ্ছন্ন ছিল, এসব লেখার মধ্যে তা প্রতিভাত হয়েছে।

জগদীশচন্দ্র যখন পাশ্চাত্ত্যের বিজ্ঞানী-সমাজে স্বীয় মতবাদের স্বীকৃতির জন্যে উৎকণ্ঠিত, তখন বাংলা সাহিত্য-চর্চার অবকাশ বিশেষ পান নি। ইংরেজী ভাষায় তিনি যে সব গবেষণা-গ্রন্থ রচনা করেছেন, বিদগ্ধ সমাজে সেগুলির সাহিত্যিক মূল্য অভিনন্দিত হয়েছে। বিজ্ঞান-চর্চার ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক ছিলেন। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের নতুন রচনার জন্যে তিনি প্রবাসে উন্মুখ হয়ে থাকতেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন থেকে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন—"তোমার নূতন লেখা পড়িবার জন্য ব্যস্ত আছি। বঙ্গদর্শন পাই না। মাঝে মাঝে তোমার গল্প পুনঃ পুনঃ পড়ি আর ২।১ খানা কবিতার পুস্তক আছে তাহা পড়ি। কিন্তু যেগুলি সঙ্গে নাই তাহা পড়িবার জন্য ইচ্ছা হয়।" বঙ্গদর্শন সম্পর্কে জগদীশচন্দ্রের এই আগ্রহের কারণ আছে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পুনঃপ্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রবাসী জগদীশচন্দ্রের কাছে নবপর্যায়ের 'বঙ্গদর্শন' পাঠাবার চেষ্টা করতেন। বাংলা সাহিত্যের পক্ষে 'বঙ্গদর্শনের' পুনঃপ্রকাশ যে একটি শুভসূচনা, তা উপলব্ধি করে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লেখেন—"তুমি পুনরায় সম্পাদকের ভার লইয়া তোমার সময় নষ্ট করিবে মনে করিয়া প্রথম

প্রথম দুঃখিত হইয়াছিলাম। তারপর দুই সংখ্যা বঙ্গদর্শন পাইয়া অতিশয় সুখী হইয়াছি। আর সমস্ত লেখাতে একটি নূতন ভাব দেখিয়া অতিশয় আশান্বিত হইয়াছি। তোমার আকাঙ্ক্ষা যেন ভারতবর্ষময় ব্যাপ্ত হয়।"

প্রবাসী জগদীশচন্দ্রের সাহিত্য-পিপাসা পরিতৃপ্ত করবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে একবার কন্যা মাধুরীলতাকে দিয়ে কপি করা একখানি কবিতার খাতা পাঠিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের রচনায় জগদীশচন্দ্র কিরূপ আবিষ্ট হয়েছিলেন, বিজ্ঞানীর নিম্নোধৃত পত্রে তার পরিচয় পাওয়া যায়। "এতকাল কেবল কর্মসংবাদ দিয়াছি। একদিনও মন খুলিয়া চিঠি লিখিতে সময় পাই নাই। আজ আর সব কথা ভুলিয়া তোমার গৃহে অতিথি হইলাম। এক এক সময় মনে হয় দূর হউক দুঃখের কথা—মানুষের হৃদয় বলিয়া ত একটা জিনিষ আছে। সন্ধ্যার পর তোমার ঘরে যেন বসিয়াছি। তুমি তোমার লেখা পড়িয়া শুনাইতেছ। আমি তোমার লেখাগুলি পড়িতেছিলাম; তোমার স্বর যেন শুনিতে পাইতেছি। তুমি যে কালিদাসের সময়ের কথা বলিয়াছ, মনে হয় যেন পূর্বজন্মের কথা শুনিতেছি। সে সব দিনের কথা স্মরণ করিয়া মন কেমন পুলকে বিহ্বল হয়। এরূপ মধুর স্মৃতি, এরূপ উজ্জ্বল প্রেম, এরূপ সুখ, এরূপ কল্যাণ অন্য কোন জাতিতে কি কখনও ছিল? তোমার আর একটি কথা আমার নিকট বড়ই ভাল লাগিয়াছে—সে কথা কল্যাণী—তুমি ঠিকই বলিয়াছ এই কথার অর্থ অন্য ভাষায় প্রকাশ পায় না।" প্রবাস থেকে জগদীশচন্দ্র বিভিন্ন পত্রে রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন—"তোমার 'চোখের বালি' বৈশাখ পর্যন্ত দেখিয়াছি। বেশ লাগিয়াছে, সবই সুন্দর হইয়াছে।" "সব সময় 'প্রবাসী' পাই না। তোমার লেখা যাহা বাহির হয় পাঠাইবে।" 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকা তিনি নিয়মিত পাঠ করতেন। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের উপন্যাসসমূহের তিনি একজন

বিমুগ্ধ পাঠক ছিলেন। এই প্রসঙ্গে কথাশিল্পীর সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ হয়।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক 'মুকুল' পত্রিকা প্রকাশনের ব্যাপারে প্রধান উৎসাহী ছিলেন জগদীশচন্দ্র ও শিবনাথ শাস্ত্রী। এই পত্রিকায় জগদীশচন্দ্র কিশোরদের জন্যে সহজবোধ্য ভাষায় নানারকম প্রবন্ধ লেখেন।

বিভিন্ন সময়ে 'মুকুল', 'দাসী', 'প্রবাসী', 'সাহিত্য', 'ভারতবর্ষ' ইত্যাদি সাময়িকপত্রে প্রকাশিত জগদীশচন্দ্রের বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধ, রসরচনা এবং বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন, সাহিত্য পরিষদ, বিক্রমপুর সম্মিলনী, বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের উদ্‌বোধন প্রভৃতি উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণসমূহ সঙ্কলিত করে ১৩২৮ সালে 'অব্যক্ত' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। জগদীশচন্দ্র আন্তরিক প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ নিম্ন-মুদ্রিত পত্রসহ রবীন্দ্রনাথকে একখানি 'অব্যক্ত' পাঠিয়েছিলেন (৩রা অগ্রহায়ণ ১৩২৮)—"সুখে দুঃখে কত বৎসরের স্মৃতি তোমার সহিত জড়িত। অনেক সময় সে সব কথা মনে পড়ে। আজ জোনাকির আলো রবির প্রখর আলোর নিকট পাঠাইলাম।" এই পত্র ও গ্রন্থের প্রাপ্তি স্বীকার করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন (২৪শে নভেম্বর, ১৯২১)—"তোমার 'অব্যক্ত'র অনেক লেখাই আমার পূর্ব-পরিচিত এবং এগুলি পড়িয়া বার বার ভাবিয়াছি যে যদিও বিজ্ঞানরাণীকেই তুমি তোমার সুয়োরাণী করিয়াছ তবু সাহিত্য সরস্বতী সে পদের দাবী করিতে পারিত; কেবল তোমার অনবধানেই সে অনাদৃত হইয়া আছে।"

জগদীশচন্দ্র যতটুকু সাহিত্যের অনুশীলন করেছেন, এই 'অব্যক্ত' গ্রন্থে সঙ্কলিত প্রবন্ধসমষ্টিই তার সংক্ষিপ্ত অথচ উজ্জ্বল পরিচয়।[১]

---

১। জগদীশচন্দ্র ও অবলা বসুর কিছু প্রবন্ধ শকুন্তলা দেবী কর্তৃক 'প্রবন্ধাবলী' গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে।

বস্তুতঃ সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল অনেক বেশী গভীর। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের মধ্যে এই সাহিত্যিক প্রবৃত্তিই ছিল রবীন্দ্র-সৌহৃদ্যের অন্যতম উপকরণ। সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"বিজ্ঞান ও রসসাহিত্যের প্রকোষ্ঠ সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন মহলে, কিন্তু তাদের মধ্যে যাওয়া-আসার দেনা-পাওনার পথ আছে। জগদীশ ছিলেন সেই পথের পথিক। সেই জন্য বিজ্ঞানী ও কবির মিলনের উপকরণ দুই মহল থেকেই জুটত। আমার অনুশীলনের মধ্যে বিজ্ঞানের অংশ বেশী ছিল না, কিন্তু ছিল তা আমার প্রবৃত্তির মধ্যে। সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর ছিল অনুরূপ অবস্থা। সেই জন্যে আমাদের বন্ধুত্বের কক্ষে হাওয়া চলত দুই দিকের দুই খোলা জানলা দিয়ে।"[১]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের মধ্যে সাহিত্যিক সম্ভাবনা কতখানি ছিল, সে সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তিনি Sacrifice and other plays (1917)-এর অন্তর্গত Sannyasi or Ascetic ('প্রকৃতির প্রতিশোধ' এর অনুবাদ), কথা (১৩০৬) ও খেয়া (১৩১৩) জগদীশচন্দ্রকে উৎসর্গ করে তাঁর সাহিত্যমানসকে অভিনন্দিত করেছিলেন। বিজ্ঞান-সাধনার মত জগদীশচন্দ্র যদি সাহিত্য-সাধনায় আত্মনিয়োগ করতেন, তবে তিনি বাংলা সাহিত্যকে অপরিমিত ও অনবদ্য সৃষ্টিতে সমৃদ্ধ করে তুলতে

---

১। তুলনীয়: "এই যে প্রকৃতির রহস্যনিকেতন, ইহার নানা মহল, ইহার দ্বার অসংখ্য। প্রকৃতি-বিজ্ঞানবিৎ, রাসায়নিক, জীবতত্ত্ববিৎ ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া এক এক মহলে প্রবেশ করিয়াছেন। মনে করিয়াছেন সেই সেই মহলই বুঝি তাঁহার বিশেষ স্থান, অন্য মহলে বুঝি তাঁহার গতিবিধি নাই। তাই কিন্তু এই বিভাগকে দেখাই যে বৈজ্ঞানিকের দেখা, একথা আমি স্বীকার করি না। কক্ষে কক্ষে সুবিধার জন্য যত দেয়াল তোলাই যাক্ না, সকল মহলেরই এক অধিষ্ঠাতা।"—বিজ্ঞানে সাহিত্য, কবিতা ও বিজ্ঞান—অব্যক্ত

পারতেন—তাঁর মধ্যে সেই কবি মন, সেই দার্শনিক উপলব্ধি, সেই প্রসাদগুণের কিছুমাত্র অভাব ছিল না। তাই জগদীশচন্দ্রের মননলোকে সাহিত্য-সরস্বতী যে সুয়োরাণীর আসন দাবী করতে পারতো, রবীন্দ্রনাথের পূর্বোধৃত পত্রের এই কথায় কিছুমাত্র অতিশয়োক্তি ছিল না।

## সপ্তদশ অধ্যায়

# স্বদেশ-চিন্তা

জগদীশচন্দ্রের জীবনব্যাপী সাধনার মূলে ছিল নিবিড় দেশপ্রীতি। ভারতবর্ষকে আবার তার অতীত গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করবার একটা আন্তরিক নিষ্ঠা তাঁর লেখা ও ভাষণে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি কখনও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নি, কোনও সার্বজনীন উদ্‌যোগের সঙ্গে তাঁর তেমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না; এজন্যে তাঁর দেশপ্রীতির কথা সাধারণ মানুষের কাছে সুস্পষ্ট নয়। জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানের অনুশীলন জীবিকা হিসেবে নয়, জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ব্রত বলছি এজন্যে যে, জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনা ভারতের মুক্তি-সন্ধান ব্রতের একটি বিকল্প রূপ। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের এক-একটি ধারায় রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষীরা অবিস্মরণীয়। ভারতের পুনর্জাগৃতির বিচিত্র ধারার সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনার একটা মূলগত ঐক্য রয়েছে। নিম্নোধৃত পত্র থেকে জগদীশচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গীর আভাস পাওয়া যাবে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্মৃতিরক্ষার উদ্‌যোগ সম্পর্কে তিনি সার হরিসিং গৌরকে লিখেছেন—"দেশবন্ধুর স্মৃতিরক্ষার জন্যে অচিরেই একটা সর্বভারতীয় উদ্‌যোগ আরম্ভ হবে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। স্বদেশের সেবায় যাঁরা আত্মবিসর্জন দিতে পারেন, চিত্তরঞ্জনের মত সেই সব মহনীয় ব্যক্তির অভাবে কোনও বৃহৎ কর্ম সম্পাদিত হওয়া সম্ভব নয়। তাঁর সম্মানার্থে যদি একটি যোগ্য স্মারক স্থাপন করা হয়, তবে দেশবাসীর মানসলোকে তাঁর আত্মোৎসর্গের কাহিনী চিরজাগ্রত থাকবে। আমি প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনের

জন্যে সর্বতোমুখী কর্মধারার একজন উৎসাহী সমর্থক। আমি নিজে আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে সে কর্মধারার অঙ্গীভূত একটিমাত্র পথ অনুসরণ করে চলেছি, সে হলো জ্ঞান-বিস্তারের পথ। আমি দীর্ঘদিন ধরে যে বিষয়ে চিন্তা ও অনুশীলন করেছি, তার বাইরে অন্য কোন ভূমিকায় জনসাধারণের সামনে আত্মপ্রকাশ করবো না—এই আমার ব্যক্তিগত মনোভাব। আমি বিশ্বাস করি—শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন, শুধু রাজনৈতিক আন্দোলন অথবা শুধু সমাজ সংস্কার নয়, সব কিছুর মিলিত পথে আসবে ভারতের মুক্তি। এর এক-একটি পথকে সুগম ও সার্থক করে তোলবার জন্যে আমাদের যাবতীয় প্রয়াসকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে এবং সেই সঙ্গে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে সবদিকে।”

রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্রের সৌহৃদ্যের মধ্য দিয়ে কবি ও বিজ্ঞানীর যে অপূর্ব যোগাযোগ ঘটেছিল, তার অনুকূল উপকরণের বিষয় নির্ধারণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—“তাঁর ( জগদীশচন্দ্রের ) কাছে আর একটা ছিল আমার মিলনের অবকাশ—সেখানে ছিল তাঁর অতি নিবিড় দেশপ্রীতি।” প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই দেশপ্রীতি শুধু রবীন্দ্রনাথ নয়, স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, গোখেল ও মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের সৌহৃদ্যের বন্ধন গড়ে তুলেছিল।

জগদীশচন্দ্রের জাতীয় মর্যাদাবোধের পরিচয় পাওয়া যায় সেদিন, যেদিন প্রেসিডেন্সি কলেজের এই তরুণ অধ্যাপক অধ্যাপনার জন্যে অর্থ গ্রহণে অস্বীকৃত হয়ে সরকারী বৈষম্যনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন অভিনব সত্যাগ্রহ করে। জগদীশচন্দ্র যে বিজ্ঞান-অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, সে কেবল জ্ঞানতৃষ্ণা চরিতার্থ করা বা ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই নয়—ভারতবর্ষ একদিন বিজ্ঞানীদের তীর্থস্থানে পরিণত হবে, এই আশাই ছিল তাঁর বিজ্ঞান-চিন্তার অন্যতম প্রেরণা। তাঁর বিজ্ঞান-অনুশীলনের সূচনা-পর্বের দিকে তাকিয়ে দেখি, অর্থসঙ্গতি নেই, বিজ্ঞান-সচেতন পরিবেশ

নেই, যেখানে প্রত্যাশাপূর্ণ শ্রদ্ধা ও মূল্যবোধ তাঁকে উৎসাহিত করতে পারে। এমন সময় আধুনিক বিজ্ঞানের অভ্যুদয়-ক্ষেত্র প্রতীচ্যভূমি থেকে এল সাদর আহ্বান—ইংল্যাণ্ডের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ গ্রহণের প্রস্তাব—গবেষণায় পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিশ্রুতি। কিন্তু জগদীশচন্দ্র সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন—"আমার হৃদয়ের মূল ভারতবর্ষে। যদি সেখানে থাকিয়া কিছু করিতে পারি, তাহা হইলেই জীবন ধন্য হইবে।" জগদীশচন্দ্রের জীবনে বিজ্ঞান-সাধনার স্পৃহা ও দেশপ্রীতি যে অঙ্গাঙ্গীভাবে বিরাজিত ছিল, তাঁর পরিমিত বাংলা রচনা ও রবীন্দ্রনাথকে লিখিত পত্রগুচ্ছের মধ্যে আমরা তার সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখতে পাই—

"তুমি ত এতদিন নির্জনে সাধনা করিয়াছ, বলিতে পার কি, কি করিলে সুখদুঃখের অতীত হওয়া যায়? একদিন ভারতে সুদিন আসিবেই, কিন্তু একথা সর্বদা মনে থাকে না। ইহা যে সত্য, একথা আমার মনে মুদ্রিত করিয়া দাও। একটা আশা না থাকিলে আমার শক্তি চলিয়া যায়।" ভারত-ভাগ্যই যে তাঁর সবকিছু সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার উৎস—এই কথায় আর সংশয়ের অবকাশ নেই। তিনি তাঁর অনুধ্যানের মাতৃমূর্তিকে ভারতমাতার চিত্রে রূপায়িত করে অভ্যর্থনা-কক্ষে স্থাপন করেছিলেন। স্বদেশীয় বন্ধুবর্গের উৎসাহ-বাণীতে তিনি যেন সেই ভারতমাতার কণ্ঠধ্বনি শুনে নতুন আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতেন। রবীন্দ্রনাথকে লিখিত একাধিক পত্রে আছে—"তোমাদের উৎসাহ-বাণীতে মাতৃস্বর শুনিলাম। তোমাদের পশ্চাতে আমি এক দীনা চীরবসন পরিহিতা মূর্তি সর্বদা দেখিতে পাই। তোমাদের সহিত আমি তাঁহার অঞ্চলে আশ্রয় লই। সাধারণতঃ লোকের যে সব বন্ধন থাকে, তাহা হইতে আমি মুক্ত। কিন্তু আমি সেই অঞ্চল-ডোর ছেদন করিতে পারি না।"

"তোমার স্বরে আমি মাতৃস্বর শুনিতে পাই—সেই মাতৃদেবী ব্যতীত আমার আর কি উপাস্য আছে?" "গাছ মাটী হইতে রস

শোষণ করিয়া বাড়িতে থাকে, উত্তাপ ও আলো পাইয়া পুষ্পিত হয়। আমার মাতৃভূমির রসে আমি জীবিত, আমার স্বজাতির প্রেমালোকে আমি প্রস্ফুটিত।" দেশমাতৃকার চিন্তায় জগদীশচন্দ্র এত গভীরভাবে আবিষ্ট হয়েছিলেন যে, তাঁর জীবনে একদিন 'আশ্চর্য unscientific ঘটনা' ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথকে তিনি লণ্ডন থেকে লিখছেন—"হঠাৎ এক ছায়াময়ী মূর্তি দেখিলাম, বিধবার বেশধারিণী, কেবল একপার্শ্বের মুখ দেখিতে পাইলাম। সেই অতি শীর্ণ অতি দুঃখিনীর ছায়া বলিল 'বরণ করিতে আসিয়াছি', তারপর মুহূর্তের মধ্যে সব মিলাইয়া গেল।"

ভারতবর্ষ আধুনিক সভ্যতার যুগে ব্রাত্য হলেও তার যে একটা গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য আছে, জগদীশচন্দ্র সে সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। সেই অতীত ইতিহাসের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার ফলেই তাঁর মনে দৃঢ় বিশ্বাস জেগেছিল—'আমরা একদিন আলোর সন্ধান' পাবই। তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন—"আমার সর্বাপেক্ষা ক্ষোভ এই যে, আমাদের প্রকৃত গৌরব ভুলিয়া মিথ্যা আড়ম্বর লইয়া ভুলিয়া আছি। এখন এসব দেশ ( পাশ্চাত্ত্য দেশ ) ভাল করিয়া দেখিয়াছি, এখন অনেক বুঝিতে পারি। অন্য কোন্ দেশে সভ্যতা এতদূর নিম্নস্তর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে? অন্য কোন্ জাতি অনার্যকে আর্য করিতে পারিয়াছে? অন্য কোথায় নিম্নস্তর পর্যন্ত পুণ্য এরূপ প্রসারিত হইয়াছে?"

ভারতের অতীত গরিমার প্রতি অন্ধ শ্রদ্ধা পোষণ করেই যে জগদীশচন্দ্র আত্মতৃপ্তি লাভ করতেন, তা নয়। তিনি মনে করতেন, প্রকৃত দেশপ্রেমের মধ্যে কোনও ভাববিলাসের অবকাশ থাকবে না, দেশের ঐতিহ্য সম্বন্ধে কোন অত্যুক্তি থাকবে না। আমাদের কর্মই হবে জাতীয় ঐতিহ্যের পরিচায়ক। জগদীশচন্দ্রের অবিচলিত বিশ্বাস ছিল—ভারতীয়দের কর্মপ্রয়াসেই ভারতের মহিমোজ্জ্বল অতীত পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠবে। তিনি বলতেন—"সেই সব ( অতীত ) কথা স্মরণ করিতে আমাদের কি অধিকার? আমরা জানি না,

আমরা কোন ফলের আশা করি না, তবু যেন আমাদের কার্য করিবার শক্তি নির্মূল না হয়।”

রবীন্দ্রনাথ তখন সবেমাত্র প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে শান্তিনিকেতনে নির্জনে অধ্যাপনার ব্যবস্থা করেছেন—সেখানে ভারতবর্ষের নির্মল শুচি আদর্শে মানুষ-গড়া তাঁর সঙ্কল্প। রবীন্দ্রনাথের এই শুভ উদ্‌যোগের সংবাদে উৎসাহিত হয়ে জগদীশচন্দ্র লিখছেন—“আমরা একদিন আলোর সন্ধান পাইবই; সেই আশায় তোমাকে দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়াছি। দুই অভ্যন্তরের শত্রু হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে, প্রথম মিথ্যা অভিমানী স্বজাতি-বৎসল আর স্বার্থে সন্তুষ্ট স্বজাতি-বিদ্রোহী। আমার মনে হয় এখন বিনয়ী বিশ্বাসী ধৈর্যশীল স্বজাতি-প্রেমিকের সংখ্যা দিন দিন বর্ধিত হইতেছে। তুমি ইহাদিগকে আকৃষ্ট করিও এবং একসূত্রে গ্রথিত করিও। তুমি যে নূতন বিদ্যাশ্রম খুলিয়াছ তাহাতে সুখী হইলাম। বৎসরে ২।৪টি যুবকও যদি এইভাবে প্রণোদিত হয় তাহা হইলে আমরা বিনষ্ট হইব না।” স্বদেশের কল্যাণের জন্যে জগদীশচন্দ্র সর্বাঙ্গীণ আত্মবিসর্জনের সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিলেন। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের ছাত্রগণকে যেন সেই ত্যাগের আদর্শে গড়ে তোলা হয়—এই ইচ্ছা প্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথকে তিনি লিখছেন—“যে মৃত্তিকাতে আমাদের শরীর গঠিত হইয়াছে, সেই ভূমির জন্যই আমাদের দেহমন যেন পর্যবসিত হয়। ইহা ব্যতীত ত আর আমাদের করিবার নাই। তোমাদের আশ্রমের কুমারগণ যেন আমাদের চিরন্তন এই নিরাসক্তি লইয়া জীবনে প্রবেশ করিতে পারে। সংসারে যাইয়া যেন এই ভাব লইয়া সমস্ত প্রাণমন দিয়া নিয়োজিত কার্য করিতে পারে। তারপর জীবনের সন্ধ্যায় পুনরায় আশ্রমে ফিরিয়া আসিবে।

“তুমি যাহার সূত্রপাত করিয়াছ তাহাই আমাদের প্রধান কল্যাণ। আমাদের সাম্রাজ্য বাহিরে নয়, অন্তরে। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ—ইহার অর্থ বুঝিতে অনেক সময় লাগে। ভারতের কল্যাণ আমাদের হাতে,

আমাদের জীবন দিয়া আমাদের আশা, আমাদের সুখ-দুঃখ আমরাই বহন করিব। যাহা প্রকৃত, যাহা কল্যাণকর তাহাই যেন আমাদের চিরসহচর হয়। অন্তরে কিংবা বাহিরে প্রতারণা দ্বারা আমরা কখনও প্রকৃত ইষ্ট লাভ করিব না।"

জগদীশচন্দ্রের এই আশা, নিরাসক্ত কর্মের উৎসাহ ও সহস্র অকাজের মধ্যে চিরন্তনের প্রতি উন্মুখতা রবীন্দ্রনাথকে অনুপ্রাণিত করতো। তিনি লিখেছেন—"এক এক সময় সাংসারিক নানা ঝঞ্ঝাটে হৃদয় অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে, কাজ করবার শক্তি শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন তোমার সঙ্গে আলাপ করে এলে কর্তব্যের গৌরব পুনর্বার নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে পারি। সংসারের সমস্ত জটিল বাধা তুচ্ছ করবার মত বল মনের মধ্যে সঞ্চয় করি।"

পৌরাণিক কাহিনী-নির্ভর কবিতা রচনায় জগদীশচন্দ্র একদিন রবীন্দ্রনাথকে উদ্‌বুদ্ধ করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের সুবিখ্যাত স্বদেশী গান 'বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ' রচনায় জগদীশচন্দ্রের যে প্রেরণা ছিল, তাঁর স্বদেশ-চেতনার আলোচনা-প্রসঙ্গে একথা উল্লেখ করা অবান্তর হবে না। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে গয়াতে দ্বিজেন্দ্রলাল ও জগদীশচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়েছিল। সেখানে দ্বিজেন্দ্রলালের কণ্ঠে তাঁর স্বরচিত উদ্দীপনী গান শুনে তিনি যে তৃপ্তি লাভ করেছিলেন, সেকথা স্মরণ করে জগদীশচন্দ্র লিখেছেন—"সেদিনের কথা ভুলিব না। নিপুণ শিল্পীর হস্তে আমাদের মাতৃভাষার কি যে অসীম ক্ষমতা, সেদিন তা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। যে ভাষার করুণ ধ্বনি মানবের অক্ষমতা, প্রেমের অতৃপ্ত বাসনা ও নৈরাশ্যের শোক গাহিয়াছিল, সেই ভাষারই অন্য রাগিণীতে অদৃষ্টের প্রতিকূল আচরণে উপেক্ষা, মানবের শৌর্য ও মরণের আলিঙ্গন-ভিক্ষা ভৈরব নিনাদে ধ্বনিত হইল।

"ধরণী এক্ষণে দুর্বলের ভারবহনে প্রপীড়িতা, রুদ্র সংহারমূর্তি ধারণ করিয়াছেন। বর্তমান যুগে বীর্য অপেক্ষা ভারতের উচ্চতর ধর্ম

নাই। কে মরণসিন্ধু মন্থন করিয়া অমরত্ব লাভ করিবে? ধর্মযুদ্ধের এই আহ্বান দ্বিজেন্দ্রলাল বজ্রধ্বনিতে ঘোষণা করিতেছেন।”[১]

জগদীশচন্দ্র এক সময়ে আলোচনা প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালকে বলেছিলেন, “আপনি রাণাপ্রতাপ, দুর্গাদাস প্রভৃতির অনুপম চরিত-গাথা বঙ্গবাসীকে শুনাইতেছেন বটে; কিন্তু তাঁহারা বাঙ্গালীর সম্পূর্ণ নিজস্ব সম্পত্তি বা একেবারেই আপন ঘরের জন নহেন। এখন এমন আদর্শ বাঙ্গালীকে দেখাইতে হইবে যাহাতে এই মুমূর্ষু জাতটা আত্মশক্তিতে আস্থাবান হইয়া আত্মোন্নতির জন্য আগ্রহান্বিত হয়। আমাদের এই বাঙ্গালাদেশের আবহাওয়ায় জন্মিয়া আমাদের ভিতর দিয়াই বাড়িয়া উঠিয়া সমগ্র জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিয়াছেন, যদি সম্ভব হয়, যদি পারেন ত একবার সেই আদর্শ বাঙ্গালী জাতিকে দেখাইয়া আবার তাহাদিগকে জীয়াইয়া মাতাইয়া তুলুন।” এই আলোচনার দুদিন পরে কবি এক পত্রে লিখেছেন—“গত পরশু স্বদেশপ্রাণ মনীষী জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় আমাকে স্বদেশী সঙ্গীত রচনা সম্পর্কে একটা বিবেচ্য পরামর্শ দিয়ে গেলেন।” দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনীকার লিখেছেন—“বলা বাহুল্য, মাতৃভূমির সুসন্তান দেশভক্ত জগদীশচন্দ্রের এই অমূল্য উপদেশ কবির অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে গিয়া তখনই এক অভূতপূর্ব আন্দোলন উপস্থিত করিল এবং তাহারই ফলে দ্বিজেন্দ্রলাল সেই দেশাত্মবোধক মহান সঙ্গীত ‘আমার দেশ’ রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে ও বাঙ্গালী জাতিকে সমৃদ্ধ ও উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন।”

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের কথা। ‘বন্দে মাতরম’ জাতীয় সঙ্গীত হতে পারে কিনা, এই বিষয়ে সুভাষচন্দ্র বসুর পত্রের উত্তরে জগদীশচন্দ্র লিখেছিলেন—“যাহার কল্যাণে আমরা পরিপুষ্ট ও পরিবর্ধিত হইয়া আসিতেছি, সেই জন্মভূমি ও জননীর মধ্যে সন্তান কি ভেদ কল্পনা

---

১। দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনীকার দেবকুমার রায়চৌধুরীকে লিখিত পত্র।

করিতে পারে? জননী জন্মভূমির নামের ধ্বনি হৃদয় হইতে স্বতঃই উৎসারিত হইয়াছে এবং উহা আপনা-আপনি সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহার কারণ, ঐ ধ্বনি ভারতের অন্তর্নিহিত প্রাণকে স্পর্শ করিয়াছে।"

জগদীশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-মন্দির তাঁর স্বদেশ কল্যাণ চিন্তার একটি সংহত রূপ। বহু শতাব্দী পূর্বে ভারতবর্ষ জ্ঞানের এক সার্বভৌমিক কেন্দ্র ছিল, তখন নালন্দা এবং তক্ষশিলায় বহির্ভারত থেকেও অনেক শিক্ষার্থী আসতো। 'মানব-চিন্তা প্রসূত স্বর্গীয় অগ্নি মৃত্যুর আঘাতেও নির্বাপিত হয় না।' তাই ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করবার সুদৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে জগদীশচন্দ্র জীবনের যাবতীয় সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষিত করে বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই মন্দির প্রতিষ্ঠার পিছনে স্বদেশপ্রেমের কি উদ্দীপনা, ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কি উজ্জ্বল কল্পনা ছিল, নিম্নোক্ত নিরুক্তিগুলি থেকে তা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হবে।

"যদি ভারতকে সঞ্জীবিত রাখিতে চাও তবে তাহার মানসিক ক্ষমতাকে অপ্রতিহত রাখিতে হইবে। ভারতের সমকক্ষ প্রতিযোগী বহু প্রাচীন জাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দেহের মৃত্যুই আমাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ নহে। ধ্বংসশীল শরীর মৃত্তিকায় মিশিয়া গেলেও জাতীয় আশা ও চিন্তা ধ্বংস হয় না। মানসিক শক্তির ধ্বংসই প্রকৃত মৃত্যু, তাহা একেবারে আশাহীন এবং চিরন্তন।

"তখনই আমরা জীবিত ছিলাম যখন আমাদের চিন্তা ও জ্ঞান-শক্তি ভারতের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া দেশ-বিদেশে ব্যাপ্ত হইত। বিদেশ হইতে জ্ঞান আহরণ করিতেও আমাদিগকে হীনতা স্বীকার করিতে হইত না। এখন সেদিন চলিয়া গিয়াছে, এখন কেবল আমরা পরমুখাপেক্ষী। জগতে ভিক্ষুকের স্থান নাই। কতকাল এই অপমান সহ্য করিব? তুমি কি চিরকাল ঋণীই থাকিবে? তোমার কি

কখনও দিবার শক্তি হইবে না? ভাবিয়া দেখ এক সময়ে দেশ-দেশান্তর হইতে জগতের বহু জাতি তোমার নিকট শিষ্যভাবে আসিত। তক্ষশীলা, কাঞ্চী ও নালন্দার স্মৃতি কি ভুলিয়া গিয়াছ? বিক্রমপুর শিক্ষার এক পীঠস্থান ছিল তাহা কি স্মরণ নাই? অজ্ঞ হিন্দু রমণী কেবল বিশ্বাসের বলেই বহু দেবমন্দির স্থাপন করিয়াছেন। জ্ঞান-মন্দির স্থাপন কি এতই অসম্ভব?

মুষ্টিমেয় ভিক্ষার ফলে ভারতের বহু স্থানে বিশাল বৌদ্ধ-বিহার স্থাপিত হইয়াছে। অজ্ঞানই যে ভেদ সৃষ্টির মূল এবং তোমাতে আমাতে যে কোন পার্থক্য নাই, ইহা কেবল ভারতই সাধনা দ্বারা লাভ করিয়াছে। আমাদের এই বিশাল একত্বের ভাব কি জ্ঞান ও সেবার দ্বারা জগৎকে পুনঃপ্লাবিত করিবে না?"[১]

আলোচনার প্রথম দিকে উল্লিখিত জগদীশচন্দ্রের একটি উক্তি পুনর্বার স্মরণ করছি—"এক একটি পথকে সুগম্য ও সার্থক করে তোলবার জন্য আমাদের সমস্ত প্রয়াসকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে এবং সেই সঙ্গে দৃষ্টি সজাগ রাখতে হবে সব দিকে। দেশের সর্ববিধ কল্যাণকর উদ্‌যোগের প্রতি এই সদাজাগ্রত দৃষ্টি ও সহানুভূতি জগদীশচন্দ্রের ছিল বলেই তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেশের নানা দুর্দশা ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, পরিকল্পনা করেছেন 'অখণ্ড বঙ্গভবন' স্থাপনার, অংশগ্রহণ করেছেন ইউরোপে ভারতীয় দর্শন প্রচারের উদ্‌যোগে এবং শান্তিনিকেতনকে কেন্দ্র করে চীন-জাপানের সঙ্গে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপনের কল্পনায়। বিদেশে বিজ্ঞান-প্রচারের ব্যস্ততার মধ্যেও ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী স্ট্যানলি বল্‌ডুইনের সঙ্গে তিনি ভারতবর্ষের শোচনীয় আর্থিক দুর্গতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

ভারতবর্ষের বৈষয়িক পরাধীনতার আশঙ্কা করে জগদীশচন্দ্র লণ্ডন

---

১। বিক্রমপুর সম্মিলনীতে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ (১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ)

থেকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—"আমি সম্মুখে বড় বিভীষিকা দেখিতেছি। আমেরিকানরা এদেশে আসিয়া সমস্ত বাণিজ্য, manufacture ইত্যাদি কাড়িয়া লইতেছে। এদেশের তাড়িত লোকের ধাক্কা আমাদের উপরে পড়িবে। যদি একে একে সমস্ত জীবনধারণের উপায় পরহস্তগত হয় তাহা হইলে নির্লোপ হইবার বেশী দেরী নাই। কি করিয়া পরমুখাপেক্ষী না হইয়া লোকে স্বাধীন উপায় অবলম্বন করিতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখিও।" ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্র ইউরোপ ও আমেরিকা প্রবাসের পর জাপান হয়ে ভারতে প্রত্যাগমন করেন। শিল্প ও বাণিজ্যে জাপানের দ্রুত অগ্রগতির দিকে তাঁর দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। দেশে ফিরে আসবার পর রায়মোহন লাইব্রেরীতে জগদীশচন্দ্রকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে জাপান যে ভারতের আশঙ্কার কারণ, এই সম্বর্ধনা সভায় তিনি তার উল্লেখ করেন।[১] এই বছরেই বিক্রমপুর সম্মিলনীতে তাঁর অভিভাষণে[২] দেশের শিল্পোদ্ধার সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেন।

বাংলাদেশের কৃষিকার্যের পক্ষে একটা বড় অন্তরায় কচুরিপানা। এই কচুরীপানা প্রতিরোধের জন্যে জগদীশচন্দ্র তাঁর জ্ঞান প্রয়োগ করেছিলেন।[৩] কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতির অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন—"ব্যাধিজীর্ণ জাতীয় জীবনকে পুনরুদ্দীপ্ত আমাদেরই করতে হবে—বিদেশী আমলাতান্ত্রিক সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে চলবে না।" বিজ্ঞান-মন্দিরের কর্মীদের জন্যে তিনি নিয়মিত শরীর-চর্চার ব্যবস্থা করেছিলেন। অনুশীলন সমিতির পুলিনবিহারী দাসের উপর পরিচালনার ভার ছিল। বিহারের খনি

১। প্রবাসী—ভাদ্র, ১৩২২

২। বোধন, শিল্পোদ্ধার ; অব্যক্ত

৩। "কচুরিপানা", প্রবাসী—আশ্বিন, ১৩২৯

অঞ্চলে শ্রমিক-কল্যাণের জন্যে জগদীশচন্দ্র অর্থদান করেন এবং এই কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের উপর।[১] এক সময় তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে জগদীশচন্দ্রের ছাত্র ছিলেন।

## শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্র

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় জগদীশচন্দ্রের বিশ্ববিশ্রুত কৃতিত্বের তুলনায় শিক্ষা-ব্যবস্থায় তাঁর সংস্কারমূলক চিন্তাধারার সঙ্গে আমাদের পরিচয় অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক হিসেবে তিনি পদার্থ-বিজ্ঞানে নতুন শিক্ষাধারার প্রবর্তন করেছিলেন। পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর একটা স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। তরুণ বয়সে ফাদার লাফোঁর অধ্যাপনা-রীতির সঙ্গে তাঁর যে পরিচয় হয়েছিল, এই আগ্রহ তারই প্রত্যক্ষ ফল।

ইউরোপে প্রথম বৈজ্ঞানিক মিশন উপলক্ষে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে জগদীশচন্দ্র 'রয়্যাল সোসাইটি অব আর্টস্'-এ এক ভাষণ দেন। ভাষণের বিষয়বস্তু ছিল "The promotion of advanced study of Physics in India"[২]। পদার্থ-বিজ্ঞানে

---

১। Before he died Sir J. C. donated a large amount for prohibition work in the mining areas of Bihar and asked me to use the income from the interest of that amount. The prohibition work continued under my supervision till my imprisonment in 1942. Lady Bose continued to remit the interest money regularly. On my arrest, I returned the balance to her and the trustees. I had to do this because the prohibition work came to a standstill and the bank accounts in my name had been frozen by the Government. Autobiography—Rajendra Prosad, p. 229.

২। Journal of the Society of Arts, Volume—45, p. 263 (1896—97).

অনুসৃত পাঠ্যতালিকা ও শিক্ষাধারার ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্পর্কে তিনি যে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, উল্লিখিত বক্তৃতার নিম্নে প্রদত্ত আংশিক উদ্‌ধৃতিতে তার আভাস পাওয়া যাবে। তিনি বলেছিলেন—পাঠ্যতালিকাকে আরও সহজ করে পুঁথিগত তথ্য আবৃত্তির বদলে পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণকে অধ্যাপনার মাধ্যম করতে হবে। প্র্যাক্‌টিক্যাল পরীক্ষা ও লেবরেটরির কাজের উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া, বাইরের পরীক্ষক নিয়োগ, গবেষণা-কার্যের উপর ডিগ্রী ও গবেষণা-বৃত্তি প্রবর্তনের সপক্ষে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণার সার্থক প্রয়োগের উপর দেশের সমৃদ্ধি নির্ভর করে। এই উদ্দেশ্যে জাতীয় গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের পরীক্ষাগারগুলির সংস্কার সাধন, সরকারী বিজ্ঞান-পরিকল্পনার কাজে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ স্নাতকগণকে নিয়োগের উপযোগিতার কথাও তিনি এই ভাষণে বলেছিলেন।* বহু বছর পরে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞান-কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্যে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় জগদীশচন্দ্রের এই চিন্তাধারাকে বহুলাংশে বাস্তবে রূপায়িত করেছিলেন।

আমাদের দেশের শিক্ষার আদর্শকে দুরূহতর ও পরীক্ষা কঠিনতর করবার সার্থকতা সম্পর্কে জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একবার আলোচনা হয়। রবীন্দ্রনাথ তখন 'ভাণ্ডার' পত্রিকার সম্পাদক। উক্ত পত্রিকার 'প্রশ্নোত্তর' বিভাগে প্রকাশিত এই আলোচনা প্রসঙ্গতঃ অনুধাবনযোগ্য। জগদীশচন্দ্র উত্তরে যা বলেছিলেন, এখানে তা আংশিকভাবে উদ্‌ধৃত করা হলো।

"আমাদের দেশে শিক্ষিতদের মধ্যেও বিজ্ঞান-চর্চা তেমন করিয়া ছড়াইয়া পড়ে নাই। দেশী ভাষায় সাহিত্যের যেমন উন্নতি হইয়াছে,

* দ্রষ্টব্য—আলোচ্য ভাষণের পুনর্মুদ্রণ, Science and Culture, Volume-24, pp. 54-58 (1958).

বিজ্ঞানের তেমন হয় নাই ; ইহা তাহার একটি প্রমাণ। এমন স্থলে এদেশের ইউনিভার্সিটিকে এই দেশের অবস্থা ও অভাব বিশেষভাবে বিচার করিয়া কাজ করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্য দেশের অনুকরণ করিতে গেলে সে দেশের লোক যে ফল পাইতেছে তাহাও পাইব না, আমরা যে ফল আশা করিতে পারিতাম তাহা হইতেও বঞ্চিত হইব।

"প্রথম পরিচয়ের স্বাদ বিস্তার করিবার জন্য শিক্ষার প্রণালীকে সরল করা চাই।···বিজ্ঞানের কূটতত্ত্ব ও কঠিন সমস্যা লইয়া নাড়াচাড়া করিলেই যে উদ্ভাবনী শক্তি বাড়ে তাহা নহে। প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয়, ভাল করিয়া দেখিতে শেখাই বিজ্ঞান-সাধনার মুখ্য সম্বল। বিজ্ঞান-পাণ্ডিত্যে যাঁহারা যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহারা যে বিদ্যালয়ে অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা দিয়া বড় হইয়াছেন তাহা নহে। আমাদের দেশে আমরা যদি যথার্থ বিজ্ঞানবীরদের অভ্যুদয় দেখিতে চাই, তবে শিক্ষার আদর্শ আরও দুরূহ ও পরীক্ষা কঠিন করিলেই সে ফল পাইব না। তাহার জন্য দেশে বিজ্ঞানের সাধারণ ধারণা ব্যাপ্ত হওয়া চাই এবং ছাত্রেরা যাহাতে পুঁথিগত বিদ্যার শুষ্ক কাঠিন্যের মধ্যে বদ্ধ না থাকিয়া প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য বিজ্ঞান-দৃষ্টি চালনার চর্চা করিতে পারে, তাহার উপায় করিতে হইবে।"[১]

### ভারত-পথিক জগদীশচন্দ্র

কৃত্তিবাসী রামায়ণ আর কাশীরাম দাসের মহাভারত পড়ে জগদীশচন্দ্র তাঁর শিশু-কল্পনায় বিশাল ভারতের উজ্জ্বল ইতিহাসের একটা অনতিস্পষ্ট ছবি এঁকেছিলেন। তারপর ধীরে ধীরে ভারতের সমগ্র ইতিহাসের স্রোতধারায় অবগাহন করে সে ছবিকে তিনি আরও পূর্ণ করেন। কিন্তু ভারতের অখণ্ড ভাবমূর্তি উপলব্ধির জন্যে প্রয়োজন,

১। ভাণ্ডার—জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, ১৩১২ বঙ্গাব্দ

বাস্তব ভারতবর্ষের সান্নিধ্যলাভ। জগদীশচন্দ্র লিখেছেন—"সৌভাগ্যক্রমে আমাদের জাতীয় জীবনে পুরাতন কাল হইতে যে এক ছাপ পড়িয়াছে তাহা কখনও মুছিয়া যাইবে না। তাহা হইতে আমরা প্রকৃত ও অপ্রকৃতের ভেদ বুঝিতে পারিব। সহস্র অকাজের মধ্যেও আমাদের মন চিরন্তনের দিকে উন্মুখ থাকিবে। সেই চিরন্তন সত্য ভারতের প্রতি গহন ও গিরিগহ্বর হইতে আমাদিগকে আহ্বান করিতেছে।" সে আহ্বানেই ভারতের নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করে স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে লীলায়িত সৃষ্টি ও প্রকৃতির মুক্ত সৌন্দর্য দর্শন করে জগদীশচন্দ্র এদেশের মাটি, মানুষ আর সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত রস সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলেন।

জগদীশচন্দ্রের ভারত-পরিক্রমার সঠিক সন, তারিখ নির্দেশ করা সম্ভব নয়। তবে অবলা বসুর সঙ্গে পরিণয়ের পর থেকেই এর সুরু। সাংবৎসরিক অবকাশ উপলক্ষে তিনি সস্ত্রীক ভ্রমণে বেরিয়ে পড়তেন। এই সময়কার ভ্রমণ-লিপির মধ্যে রয়েছে—সাঁচি স্তূপ, নর্মদা ও তাপ্তীর সঙ্গমস্থলে মান্ধাতার মন্দির, মহাভারতের কাহিনীর সঙ্গে জড়িত পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, রাজপুত নগরী চিতোর, আজমীরে পুষ্করতীর্থ, অম্বর ও আধুনিক জয়পুর।

অজন্তা ও ইলোরার গুহামন্দিরে জগদীশচন্দ্র দু-বার গিয়েছিলেন। 'যুক্তকর' প্রবন্ধের রচনাকাল থেকে মনে হয়, প্রথম অজন্তা ভ্রমণের সময়, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী। অনেক পথক্লেশ স্বীকার করে কেন তিনি অজন্তায় গিয়েছিলেন, উক্ত প্রবন্ধের সূচনাতে জগদীশচন্দ্র সে কথা বলেছেন—"পুরাতন লইয়াই বর্তমান গঠিত, অতীতের ইতিহাস না জানিলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অজ্ঞেয়ই রহিবে। পুরাতন ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইলে সেকালে সর্বসাধারণের দৈনন্দিন জীবন কিরূপে অতিবাহিত হইত তাহা জানা আবশ্যক। লোকপরম্পরায় শুনিয়াছিলাম, দেড় হাজার বৎসর পূর্বের জীবন্ত চিত্র এখনও অজন্তা গুহামন্দিরে দেখিতে পাওয়া যায়।" অতীতের ইতিহাস সম্বন্ধে

এই জিজ্ঞাসা শুধু অজন্তা নয়, সামগ্রিকভাবে জগদীশচন্দ্রের ভারত-পরিক্রমার অন্যতম উৎস। তিনি দ্বিতীয়বার অজন্তায় যান ভগিনী নিবেদিতা, লেডী হেরিংহ্যাম ও তাঁর শিল্পীদলের সঙ্গে। তাঁরা গিয়েছিলেন গুহাচিত্রের প্রতিলিপি অঙ্কনের উদ্দেশ্যে।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্র ভূস্বর্গ কাশ্মীর ভ্রমণ করেন। এখানকার মহারাজা ছিলেন তাঁর অন্যতম সুহৃদ। তাঁর অতিথি হিসেবে জগদীশচন্দ্র দ্বিতীয়বার কাশ্মীরে গিয়েছিলেন। বসুদম্পতি বিভিন্ন সময়ে বাঁকিপুরে পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষ, অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির, বোম্বাই-এ কার্লি, কেনহেরি ও এলিফ্যাণ্টার গুহামন্দির পরিদর্শন করেন। মন্দিরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের প্রতি জগদীশচন্দ্রের একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল বলে মনে হয়। উড়িষ্যায় পুরী, ভুবনেশ্বর, কোনার্ক বা উদয়গিরি, খণ্ডগিরি প্রভৃতি দেখেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, দক্ষিণ ভারতে মাদুরা, তাঞ্জোর, রামেশ্বরম, শ্রীরঙ্গম প্রভৃতি মন্দিরও তিনি দেখেছিলেন। এসব মন্দিরে এমন ভাস্কর্যও রয়েছে, যার বহিরঙ্গের ক্লিন্নতা রুচিকে আঘাত করে এবং পূজাপদ্ধতিতেও এমন সব কুসংস্কারাত্মক রীতি পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, যা শিক্ষিত মনের পক্ষে পীড়াদায়ক। কিন্তু জগদীশচন্দ্র ছিলেন সেই শুদ্ধদৃষ্টির মানুষ, যিনি সব মালিন্যের অন্তরালে সত্য, শিব ও সুন্দরকে দেখতে পেতেন।

বুদ্ধদেব যেখানে বোধি লাভ করেছিলেন, বুদ্ধগয়ার সেই মহাতীর্থ এবং রাজগীর প্রভৃতি বুদ্ধের করুণা ও শান্তসমাহিত মূর্তির স্মৃতিপুণ্য আরও অনেক স্থান তিনি পরিভ্রমণ করেন। অশোকের পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রা কর্তৃক সিংহলে বুদ্ধের বাণী প্রচারিত হয়েছিল। জগদীশচন্দ্র ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপান থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পথে সিংহলের বৌদ্ধ-তীর্থগুলি পরিদর্শন করেন।

নগাধিরাজ হিমালয় জগদীশচন্দ্রকে নিবিড়ভাবে আকর্ষণ করেছে। বসুদম্পতি একবার লক্ষ্ণৌ হয়ে নৈনিতাল গিয়েছিলেন। সেখান থেকে পিণ্ডারি হিমবাহ দেখতে গিয়ে জগদীশচন্দ্র ও তাঁর পথপ্রদর্শক

অল্পের জন্যে মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা পান। কিন্তু এই বিপদের মধ্যেও তিনি রোমাঞ্চই অনুভব করেছিলেন; তাই পরের বছর অবলা বসু ও জনকয়েক বন্ধুকে নিয়ে তিনি আলমোড়া হয়ে আবার হিমবাহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। জগদীশচন্দ্র একাধিকবার কুমায়ুন অঞ্চল পরিভ্রমণে গিয়েছিলেন। এখানে তিনি মায়াবতীর রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের সান্নিধ্যে থাকতেন।

সর্ববিধ তীর্থের মধ্যে ভারতের উত্তরপ্রান্তস্থিত দুরধিগম্য কেদারবদরী বোধহয় জগদীশচন্দ্রের ভারত-পরিক্রমায় সবচেয়ে স্মরণীয়। গঙ্গা যেখানে হিমালয় থেকে সমভূমিতে নেমে এসেছে, সেই হরিদ্বার থেকে এই যাত্রা স্থুরু হয়। সঙ্গী ছিলেন অবলা বসু ও ভগিনী নিবেদিতা। রেলপথের সীমান্ত ছেড়ে তিন সপ্তাহ পরে তাঁরা কেদারবদরীতে পৌছেন। দুর্গম পথ অতিক্রম করেছেন কখনও পদব্রজে, কখনও বা অশ্বতরের পৃষ্ঠারোহণে। শুধু দিগন্তবিস্তৃত হিমালয়ের বিশাল রূপ বা কেদারবদরীর তীর্থমাহাত্ম্য নয়, যুগে যুগে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত যাত্রীদের যে বিচিত্র স্রোত এক মানব-তীর্থ রচনা করে, পথের ক্লান্তি বিস্মৃত হয়ে প্রকৃতির ধ্যান-গাম্ভীর্যকে ছাড়িয়ে যাদের কণ্ঠে 'বদরী বিশাললাল কী জয়' ধ্বনিত হয়ে উঠে, তাদের মধ্যে ভারতের সনাতন ধর্মীয় ঐক্যবোধ প্রত্যক্ষ করবার আগ্রহে।

জগদীশচন্দ্র তাঁর ভারত-পরিক্রমায় ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করেছেন। কোথাও দেখেছেন প্রকৃতির সৌন্দর্য, কোথাও মন্দিরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য। তক্ষশীলা ও নালন্দাকে দেখেছেন, প্রাচীন ভারতের জ্ঞানচর্চার পবিত্র অঙ্গনরূপে, তার মধ্যে পেয়েছেন নিজের বিজ্ঞান-মন্দির স্থাপনের অনুপ্রেরণা; দেখেছেন অখণ্ড ভারত-রাজ্যের স্বপ্নদর্শী শিবাজীর মহারাষ্ট্র প্রদেশ, গুরু গোবিন্দ সিং ও গোপালকৃষ্ণ গোখেলের জন্মভূমি। যেখানে হয়তো এমন কিছুই মাহাত্ম্য বা বৈশিষ্ট্য নেই—আছে শুধু সাধারণ মানুষের

বৈচিত্র্যহীন অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, সেখান থেকেও জগদীশচন্দ্র দৃষ্টি ফেরান নি। প্রাচীন ভারতীয় কিম্বদন্তীমূলক কাহিনীতে বা ফরিদপুরের গ্রাম্য পরিবেশে তিনি শুচিসরল মনুষ্যত্বের যে ছবি শৈশবে দেখেছিলেন, বিশাল ভারতের গণজীবনে তাকে তিনি আরও জীবন্ত-ভাবে, প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেন। এই ছবি জগদীশচন্দ্রকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল, এই গণজীবনের গোমুখী থেকেই তিনি ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যধারাকে নিঃসৃত হতে দেখেছিলেন।

শ্রীরঙ্গমের মন্দিরের গর্ভগৃহে দেবমূর্তি দর্শনের জন্যে জগদীশচন্দ্রকে আহ্বান করা হলে তিনি মন্দিরের পুরোহিতদের জানান—তিনি সংস্কারপন্থী, অর্থাৎ সনাতনী হিন্দু নন। উত্তরে পুরোহিতেরা বলেছিলেন—"আপনি তো সাধু, আপনার জন্যে সর্বত্র দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে।" সকল ধর্মমতের সঙ্কীর্ণতার বন্ধনমুক্ত এই মানবপ্রেমিক ত্যাগী পুরুষকে পুরোহিতেরা ঠিকই চিনেছিলেন। জগদীশচন্দ্রের তীর্থ ছিল ভারতবর্ষ, তিনি একাত্ম হয়েছিলেন এই দেশের মানুষ আর প্রকৃতির সঙ্গে। সর্বতীর্থের পুণ্যসলিলে অবগাহন করে তিনি ভূমানন্দ লাভ করেছিলেন, উপলব্ধি করেছিলেন ভারতের অখণ্ড ভাবমূর্তিকে—এর মধ্যেই জগদীশচন্দ্রের ভারত-পরিব্রজ্যার সার্থক পরিসমাপ্তি।

# নির্ঘণ্ট

## অ



## আ



## ই



## উ



## এ



## ও

ক



গ



চ



জ

ট



ড



দ



ন



প

## ল



## শ

## শুদ্ধিপত্র

| পৃঃ | লাইন (পংক্তি) | আছে | পড়তে হবে |
|---|---|---|---|
| ৯৫ | ১৪ | কারভেলথ | কারভেথ |
| ১২০ | ২১ | কলেজ | সোসাইটি |
| ১৪৬ | ২৪ | রয়্যাল ইনষ্টিটিশন | রয়্যাল সোসাইটি অব মেডিসিন |
| ১৫৪ | ১০ | ফেব্রুয়ারী ... ইনস্টিটিউশনে | মার্চ সোসাইটি অব মেডিসিনে |
| ১৬২ | ৪ | নয় | হয় |
| ১৬৭ | ১০ | 1914 | 1924 |
| ১৮৬ | ১৬ | কিংসয় | কিংস্ওয়ে |
| ২০১ | ৫ | সোমারফিল্ড | সোমারফেল্ড |
| ২০২ | ১৯ | ইউরোপে দশম বৈজ্ঞানিক মিশন | ইউরোপে দশম ও সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক মিশন |
| ২০৭ | ১ | ইউরোপে সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক মিশন | |
| ২০৭ | ২ | ১৯৩০ | ১৯২৯ |
| ২১৬ | ১৫ | গিড়িডি | গিরিডি |
| ২৪১ | ১২ | ১৮৯৬ | ১৮৯৭ |